তিনটি উপন্যাস
অন্নদাশঙ্কর রায়

তিনটি উপন্যাস

তিনটি উপন্যাস

অন্নদাশঙ্কর রায়

পা রু ল

সূচি

আগুন নিয়ে খেলা

১
শেষের দিন

সমুদ্র, কিন্তু হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ। আর খালের মতো সংকীর্ণ। দু-দিকে স্লেটপাথরের উপর ঘেরাও-করা পোড়ো জমি। দু-দিকের জমি যেখানে এক হয়েছে সেখানে একটি অতি প্রাচীন দুর্গ, নর্ম্যান যুগের হবে! দুর্গের পাশ দিয়ে গ্রামের লোকে ঘোড়ায়-টানা কার্ট নিয়ে সমুদ্রের কূলে আসে, কার্টে বালি বোঝাই করে ফিরে যায়। তাদের বাদ দিলে জনমানব নেই। শুধু জলপক্ষীরা বিহার করছে।

পেগি উচ্ছ্বাস দমন করবার চেষ্টা করে বলল, 'মনের মতো। না, তার বেশি। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে এত নির্জন জায়গা কখনো সম্ভব?'

সেই দেশবৎসলাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হল যে এটা দক্ষিণ ওয়েলস—ইংল্যাণ্ড নয়।

পেগি একটুও অপ্রতিভ হল না। বলল, 'একই কথা। কিন্তু দেখো দেখো, এর উপরে জল এল কেমন করে? সমুদ্রের ঢেউয়ের অবশেষ?'

প্রকৃতি-মিলিত স্লেটপাথরের বাঁধ, তারই উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল পেগি আর সোম। পা দুলিয়ে দিয়েও।

সোম বলল, 'না গো, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সবটা জল গড়িয়ে পড়বার পথ পায়নি।'

'বটে? আমি ভাবতেই পারিনি। তুমি কেমন করে পারলে?'

'এ আর শক্ত কী! এত উঁচুতে কখনো ঢেউ উঠতে পারে—এক, ঝড়ের সময় ছাড়া? আর বৃষ্টির জল ছোটো ছোটো গর্ত থেকে কোন পথ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে শুনি?'

'তুমি বাস্তবিক চতুর।'

'তোমার মুখে এই প্রথম প্রশংসার বাণী শুনলুম, পেগি।'

'ওটা তোমার স্মরণশক্তির ভুল, সোম।'

'আমার স্মরণশক্তির দোষ থাকলে ইংল্যাণ্ড অবধি আসা হয়ে উঠত না এ জন্মে। মেধাবী ছাত্র বলে সাধ্যাতীতকেও সাধন করতে পারলুম।'

'ইস, কী অহংকার!'

'মেয়েমানুষে খোঁচা দিলে পুরুষের অহংকার কেশর ফোলায়।'

'ও মা, কী বিপদ! সিংহের মুখে পড়েছি।'

সোম হেসে বলল, 'সিংহটি ভালো। তার মুখের কাছে নির্ভয়ে মুখ আনতে পারো।'

'না, মশাই, অত দুঃসাহসী হয়ে কাজ নেই আমার।'

'আমার আছে। আমার ক্ষুধা পেয়েছে!'

(কৃত্রিম ভয়ের ভঙ্গি করে) 'আমাকে খাবে নাকি!'

'যদি খাই, কে ঠেকাবে?'

'চেঁচাব।'

'কার্টওয়ালারা কখন চলে গেছে। চেঁচানি শুনে সুন্দর পাখিগুলোই শুধু উড়ে পালাবে।'

'সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়ব।'

'ডাঙার বাঘ জলের কুমিরও হতে পারে।'

(খিল খিল করে হেসে) 'তা হলে কী করব বলো না, 'ডারলিং, আকাশে উড়ে যাব?'

'বলো, 'হার মানলুম'। ছেড়ে দেব।'

'কখনো না।'

'কোনটা 'কখনো না'? হার মানাটা, না, ছাড়া পাওয়াটা?'

‘দুটোই।’

‘জানি। মেয়েদের স্বভাব ওই।’

পেগি ওকথায় কান না দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘দেখেছ! O Gee!' (আবিষ্কারের আহ্লাদে)। ছোটো ছোটো গুহা কতকগুলো!

সোম তখন তার ক্ষুধার কথাই ভাবছিল। বলল, ‘আরেকটু বড়ো গুহা হলে আমরা বাসা বাঁধতুম।’

‘সিংহ আর হরিণ?’

‘সিংহ আর সিংহী।’

‘তবু এতক্ষণে একটা শ্রদ্ধার বাণী শোনালে।’

‘ওটা তোমার স্মরণশক্তির ভুল, পেগ।’

‘উঃ, কী ভয়ানক স্মরণশক্তি তোমার!’

‘এই নিয়ে তুমি দু-বার আমাকে প্রশংসা করলে।’

‘পাঁচ দিনে দু-বারই অনেক। নইলে পুরুষমানুষেও বড্ড বাড় বাড়ে।’

‘আর মেয়েদের?’

‘মেয়েরা তো দু-বেলা প্রশংসা লুটছে। ওটা ওদের খোরাক। যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ সহজভাবে নেয়; না জুটলেই ফ্যাসাদ।’

‘দাঁড়াও, আমি তোমার খোরাক বন্ধ করে দিচ্ছি।’

‘দোহাই, সোম, যতক্ষণ লণ্ডনে ফিরে না গেছি ততক্ষণ ভাতে মেরো না।’ (কপট ভয়ের সুরে)।

সোম বলল, ‘লণ্ডনে ফিরতে তোমার ইচ্ছে করে, পেগ?’

‘এমন জায়গা ফেলে’? কিন্তু কী করব, তোমার মতো প্রচুর ছুটি কিংবা রুটি তো আমার নেই। খেটে খেতে হয়।’

‘বিয়ে কর না কেন?’

‘কাকে? তোমাকে?’

‘আমাকে।’

‘ঠাট্টা করছ?’

‘সিরিয়াসলি বলছি।’

‘পাগল!’

‘পাগল নই, সিরিয়াস।’

‘অন্য কথা পাড়ো।’

‘তুমি জান না আমি কীরকম জেদি। আমার দেশে বলে ‘বাঙালের গোঁ।’

‘জান, তোমার সঙ্গে আমার পাঁচ দিনের আলাপ?’

‘এক দিনের আলাপকেও কেউ কেউ এক যুগের মনে করে।’

‘আবার এক যুগের আলাপকেও এক দিনে ভুলে যায়।’

‘আমি তেমন নই।’

‘এখনও তার প্রমাণ পাবার দেরি আছে।’

‘বোকা মেয়ে। বর পাচ্ছিলে, ঘর পাচ্ছিলে, খাটুনির থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিলে—একটা তুচ্ছ কারণে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে।’

‘একজনের কাছে যা তুচ্ছ অন্য জনের কাছে তা উচ্চ।’

‘তুমি মরো। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে দিলে। ভেবেছিলুম লণ্ডনে যখন ফিরব তখন বউ নিয়ে ফিরব। তখন দু-জনে মিলে একটি ছোটো ফ্ল্যাট নেব, তুমি রাঁধবে আমি খাব, তুমি ঘরকন্না করবে আমি কলেজ করব।

টাকার ভাবনা? আমি যা স্কলারশিপ পাই তাতে দু-জনের শাক-ভাত খেয়ে চলে যাবে!'

'প্রথমত আমি শাক-ভাত খেতে চাইনে, দ্বিতীয়ত যা খাই তা নিজের পয়সায় খেতে ভালোবাসি।'

'আমার হৃদয় যদি তোমার হয়, পেগ, আমার পয়সা কী অপরাধ করল?'

'না, না, ওটা আমাদের একেলে মেয়েদের প্রিন্সিপল। স্বামীর টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে যেমন ঘেন্না করে স্বামীর টাকা দিয়ে নিজের অভাব মেটাতেও ঠিক তেমনি।

'তোমরা একেলে মেয়েরা মরো। পৃথিবীতে সত্য যুগ ফিরে আসুক।'

(খিল খিল করে হেসে) 'আমরা ম'লে তোমাদের বংশে বাতি জ্বলবে না গো।' (একটু ভেবে) 'না, তোমরা সেকেলে কুমারীদের বিয়ে করবে।'

'ধেৎ!'

'কেন, অসাধারণ কী করবে? আমি জানি আজকালকার অনেক যুবক মা-কাকিমার সমবয়সিদের বিয়ে করে শান্তি পায়। সেই সঙ্গে কিছু টাকাও।'

সোম বলল, 'কটা বেজেছে সে খেয়াল আছে? না, আজ তোমার খাবার ইচ্ছে নেই?'

পেগি বলল, 'এখান থেকে আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও, গ্রামে হোটেল নিশ্চয়ই আছে, আজকের মতো ঘর নাও।'

'আর তুমি এই আকাশতলায় হাওয়ায় ভেসে-আসতে-থাকা ফেনা খেয়ে থাকবে?'

'কেন, তুমি খাবার বয়ে দিয়ে যেতে পারবে না?'

'আর শোবার? বিছানাও বয়ে দিয়ে যেতে হবে।'

'উঃ, কী ভয়ানক তার্কিক!'

অগত্যা সোম বাসার আশায় একা চলল। গ্রামের খানিকটা সমুদ্রের কূলে যাবার সময় অতিক্রম করেছিল। গ্রামের ভিতর দিয়েই তো পথ। স্টেশন থেকে দুর্গ পর্যন্ত তার বিস্তার।

'গুডমর্নিং, স্যার।'

'মর্নিং। তুমি এই গ্রামের ফলওয়ালা?'

'আজ্ঞে না, আমি পেমব্রোকের লোক। রোজ এগ্রামে মোটরে করে ফল বেচতে আসি।'

তার ভাঙা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালবাহী মোটরখানার উপর আপেল, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি সাজানো। সোম ভাবল, ভাব করবার সহজ উপায় পেগির জন্যে কিছু আপেল কেনা। আপেল খেতে ভালোবাসে বলেই বুঝি তার গাল দু-টিতে আপেলের রং।

'বেশ, বেশ, চমৎকার গাড়িখানা। ফলের বাজার কেমন?'

'ভয়ংকর মন্দা যাচ্ছে, স্যার। লোকে টিনে বন্ধ ফল কিনছে, বলছে টাটকা ফলের চাইতে খারাপ কীসে? টাটকা ফল তো দু-তিন সপ্তাহের পুরোনো। জাহাজে করে স্পেন থেকে, জ্যামাইকা থেকে আমদানি। নামেই টাটকা।'

সোম সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'আরে, লোকের কি ছাই বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ঠাকুমা-ঠাকুর্দাদের সেই সত্যযুগ আর নেই।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার। তেমন সস্তার যুগ আর ফিরবে না। দোকানদারগুলো যেন ডাকাত হয়েছে। শুনলে বিশ্বাস করবেন না স্যার, একটা আপেলের দাম নিয়েছে তিন তিনটে পেনি।'

'আমি তোমাকে তার বেশি দিতে রাজি আছি যে—কী তোমার নাম?'

'বিল। বিল টমসন।'

'বেশ নাম। দাও দেখি আমাকে ভালো দেখে চারটে আপেল।' (তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে) 'আমার গার্লের জন্যে কিনা।'

বিল কার্পণ্য করল না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাছা বাছা চারটে আপেল দিয়ে বলল, 'আর কিছু চাই, স্যার?'

'দাও, গোটা ছয়েক কমলা লেবু। আমার প্রিয় ফল!'

'হবেই তো, হবেই তো। আপনি যে স্পেনদেশের লোক সে কি আমি জানিনে? হ্যাঁ, দেশ বটে স্পেন।' (কমলা লেবু দিতে দিতে) 'গেছলুম স্পেনের গা ঘেঁষে জিব্রালটার দিয়ে—মহাযুদ্ধের সময়। তখন আপনি খোকাবয়সি।' (দিয়ে) 'কিন্তু এখন তো আর খোকা নন। এখন আপনার গার্ল হয়েছে। আহা গার্ল!' (সুর নামিয়ে) 'অভয় দেন তো একটা কথা বলি। স্পেনের গার্লের মতো গার্ল আর হয় না' (জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করতে লাগল, যেন 'গার্ল' মানে 'রসগোল্লা' বা 'চকোলেট'!) 'আর আমাদের ওয়েলসের মেয়ে। রাম, রাম! গায়ে যেন গরম রক্ত নেই, বরফ জল। কী বলে ওই যে ওই তারগুলোকে!'

'টেলিগ্রাফের তার।'

'না, স্যার, ওর ভিতরে আগুনের স্রোতের মতো যা বইছে—কী বলে ওকে?'

'ইলেকট্রিসিটি।'

'ইলেকট্রিসিটি। স্পেনের গার্লের ছোঁয়া লাগলে তিড়িং করে উঠতে হয়।' (প্রদর্শন।) 'আহা, সে দিনকাল গেছে, স্যার! যুদ্ধটুদ্ধও আর বাধে না।'

সোম বলল, 'আচ্ছা বলতে পার, বিল, কাছে কোনো হোটেল পাওয়া যায়?'

'হোটেল? এ গ্রামে হোটেল কবে হল? একটা inn আছে বটে। কী নাম—মনে পড়েছে, 'The Elephant'! আপনাকে নড়তে হবে না স্যার, আমি নিজেই গিয়ে খবর দিচ্ছি।' এই বলে সে সোমের জিম্মায় তার ফল (ও মাছ) ফেলে রেখে অত্যন্ত কাজের লোকের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রামের পথটিও জনমানবশূন্য। ছোটো ছোটো মেয়েরা গল্প করতে করতে চলেছে। সোমকে দেখে তাদের কলরব মৃদু হয়ে গেল। তারা কৌতূহলী হয়ে একবার ফিরে তাকায়, একবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। সোমের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কী তাদের হাবেভাবে সংকোচ আর মনে মনে ফুর্তি। দুটি ছোটো ছেলে কী নিয়ে ঝগড়া করছিল, সোমকে দূরে পায়চারি করতে দেখে একেবারে বিস্ময়সূচক চিহ্ন।

বিল-এর সঙ্গে একটি ব্রাউন সুট-পরা ছোকরা এসে bow করে দাঁড়াল। সোম বলল, 'এই যে, তোমাদের ওখানে ঘর খালি আছে?'

'আজ্ঞে, সবে হোটেল খুলছি। একটা হোটেলের বড়ো অভাব ছিল এ গ্রামে। কিন্তু এখনও সব ক-টা ঘর সাজিয়ে তোলা হয়নি। সাজানো ঘর একটিমাত্র আছে।'

একটিমাত্র আছে! দু-তিন দিন আগে হলে পেগি ভারি আপত্তি করত। হলই বা দুই স্বতন্ত্র বিছানা। তবু পুরুষ মানুষের সঙ্গে এক ঘরে শোয়া? মা গো!

কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই-বিছানাওয়ালা ঘরে তাকে শুতে হয়েছে কাল পরশু। তার ফলে তার কিছু পয়সাও বেঁচেছে। ধর্ম যে যায়নি তার সাক্ষী স্বয়ং ধর্ম।

সোম বলল, 'উত্তম। তুমি দু-জনের আহারের আয়োজন করো। আমরা সন্ধ্যা করে আসব।'

কে যেন বলেছেন উচ্চ ভাবনা ভাবতে ভাবতে মানুষ উচ্চ হয়। সেই কথাটিকে জপমন্ত্র করেই বুঝি হোটেলওয়ালা একখানি খুদে বাড়ি সম্বল করে হোটেলের নাম রেখেছে, 'Lion Hotel.' অথবা প্রতিবেশী 'Elephant'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতাবশত।

একটি রক্তমসি-অঙ্কিত সিংহকে পিছনের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উদবাহু হয়ে থাকতে দেখে সোম বলল, 'চিনতে পেরেছ?'

পেগি বলল, 'পেরেছি। এইটেই Lion Hotel?'

'না, গো। এই সেই সিংহের বিবর, যে সিংহ আজ ক্ষুধা বোধ করছিল।'

'কী ভয়ানক চক্রান্ত! নিরীহ প্রাণী আমি, আমাকে আহার করবে বলে এ কোন অপরূপ হোটেলে এনে তুললে?'

ম্যানেজার বল মালিক বল সেই ব্রাউন রঙের সুট-পরা অল্পবয়স্ক যুবকটি দরজা খুলে দিল। এবং হ্যাট ও ওভারকোট খুলে নিল। তার সঙ্গে ছিল সেই ঝগড়াটে ছেলেদের থেকে একটা। এখন সে অত্যন্ত লক্ষ্মী ছেলেটি—বাপকে ভদ্রতা করতে সাহায্য করছে। তার মা-র উঁকি মারতে দেরি হল না এবং স্বামীর ডাক শুনে সে নেমে এল পেগির হুকুমের অপেক্ষা করতে।

মিস্টার ও মিসেস হিল। বাচ্চাটির নাম, বব।

'আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেব?'

'না, আমরা লাউঞ্জ-এ বসব। লাউঞ্জ আশা করি আছে?'

'আছে। কিন্তু তৈরি নেই, স্যার। আপাতত খাবার ঘরটাতে যদি বসেন।'

'কী বল পেগি?'

'তাই করি চলো।'

গদিওয়ালা চেয়ারের অভাবে বসে আরাম হচ্ছিল না। সোম বলল, 'পেগ, এ হোটেলে এনে তোমাকে কষ্ট দিলুম। আর কোথাও যাবে?'

'খেপেছ? আমরা কি এই ভেবে বেরোইনি যে যত অসুবিধেই ঘটুক কিছুতেই খিটখিট করব না?'

'হিসেব যদি কর, অসুবিধে কি কম ঘটেছে এই পাঁচ দিনে? ভগবান! কবে লণ্ডনে ফিরে যাব, আরাম করে বাঁচব।'

'কে তোমাকে ধরে রাখছে, সোম? আজই চলো না?'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তুমি একটি ছোটো মিথ্যুক।'

'অমন কথা বললে নিজ মূর্তি ধারণ করব, সোম।'

'ছিঃ। এই নিয়ে রাগ করে?'

'না, তুমি যা-তা বলে ঠাট্টা করতে পারবে না আমাকে। মিথ্যুকের বাড়া গাল নেই।'

'তুমিও আমাকে যা-তা বলো না? শোধবোধ হয়ে যাক।'

পেগির চোখে জল চক চক করছিল। সে তার উপর হাসির কিরণ ফুটিয়ে সোমের আরও কাছে সরে এসে বলল, 'আচ্ছা, আমার উপর আর তোমার শ্রদ্ধা নেই?'

'দুষ্টু পেগ!'

'না, না, সত্যি বলো। তোমার কাছে আমি খুব সুলভ হয়ে গেছি, না?'

'কীসে তোমাকে এমন কথা ভাবাল?'

'আমি ছেলেমানুষ নই।'

'কিন্তু ছেলেমানুষের মতো আবোল-তাবোল বকছ যে?'

'ডারলিং সোম, সত্যি করো বলো তোমার চোখে আমি কতখানি নেমে গেছি।'

'বলব?'

'বলো।'

'বলো।'

'বলব?'

'বলো।'

'আমার উপর তোমার একান্ত নির্ভরতা আর আমার প্রতি তোমার একান্ত বিশ্বাসপরায়ণতা আমাকে তোমার চির-কেনা করেছে, পেগ ডারলিং।'

পেগি এইবার সশব্দ হাসি হেসে বলল, 'ওসব নাটুকে কথা একেলে ছেলেদের মুখে মিথ্যে শোনায়, সোম। হয়তো তোমাদের ওরিয়েন্টাল মেয়েরা শুনে সত্য ভাবতে পারে।'

'তবে তুমি কী শুনলে সন্তুষ্ট হবে, পেগ?'

'এই দেখো, তুমি নিজ মুখেই স্বীকার করলে যে আমাকে সন্তুষ্ট করতে তুমি ব্যগ্র, সত্য কথা বলতে ব্যগ্র নও!'

'তোমার আজ হয়েছে কী, পেগ? এত বিরূপ কেন? সোজা কথারও বাঁকা অর্থ করছ যে।'

'তাতে তোমার ভারি তো আসে যায়!'

সোম সন্ধি করবার উপায় দেখল সকাল সকাল খেতে বসা। হিলকে ডেকে বলল, 'আমরা তৈরি। অপর পক্ষ তৈরি কি না।'

হিল রসিকতাটা আঁচতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'অপর পক্ষ কে, স্যার?'

'আমরা খাদক, আমরা তৈরি। অপর পক্ষ খাদ্য, অপর পক্ষ তৈরি কি না?'

'ওঃ হো হো—মাপ করবেন ম্যাডাম।' সে হাসি চেপে বেরিয়ে গেল।

পেগি হাসতে হাসতে বলল, 'কত রঙ্গ জান।'

সোম ভেবেছিল ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হলে পেগির চিত্তশান্তি হবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি।

পেগি আরম্ভ করল, 'তুমি আমার ইস্টারের ছুটিটা মাটি করলে। তোমাকে সঙ্গী করা আমার ভুল হয়েছে।'

সোম যথার্থ আহত হয়ে বলল, 'তবে আমাকে যে দন্ড দেবে আমি সেই দন্ড নিতে প্রস্তুত আছি, পেগ।'

'প্রাণদন্ড?'

'দিলে নেব তাও।'

'আবার সেই নাটুকে মিথ্যে। আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে এই ভন্ডামি। সোজা বলো 'না ওইটি পারব না।' আমি খুশি হয়ে তোমাকে চুম্বন-দন্ড দেব।'

'কিন্তু ও যে আমার হৃদয়ের পক্ষে সত্য।'

'তবু তোমার জিজীবিষার পক্ষে অসত্য। ভরা যৌবনে কেউ মরতে চাইলেও তার প্রকৃতি তাকে মরতে দিতে চায় না।'

'এই যে এত যুবক যুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিতে ছুটে গেল।'

'ওটা একটা দারুণ অত্যুক্তি। পরের প্রাণ লুট করতেও গেছিল ওরা। শুধু মরতে নয়, মারতেও।'

'তবু মরতেও তো?'

'মারবার কথা মনে আনলে মরবার কথা তলিয়ে যায়। অন্তত দুই ঘুলিয়ে যায়। তোমাকে যে প্রাণদন্ড দিতে যাচ্ছিলুম সে যেন কোর্ট-মার্শালের হুকুমে দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বুকের মধ্যিখানে গুলি খাওয়া।'

সোম হেসে বলল, 'দিতে যাচ্ছিলে? দিলে না তবে? আঃ, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।'

'Live and let live-এর চেয়ে বড়ো ধর্মমত কী হতে পারে? তবু প্রতিদিন মানুষ এই তত্ত্বকে পদদলিত করছে।'

সোম কপট আক্ষেপের সুরে বলে, 'সত্যি। মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, পেগি। বিশ লাখ বছর পরে পৃথিবী যদি বরফ হয়ে যায় আর এই মানুষ জাতটা যদি fossil হয়ে যায় তবে আমার ভাবনা যায়।'

পেগি কৌতুকবোধ করে বলল, 'কত রঙ্গ জান! তোমার মতো লোকের রঙ্গমঞ্চে যাওয়া উচিত।'

'তুমি যাও তো আমি যাই।'

'তুমি আমার কী জান? রঙ্গমঞ্চে আমি দু-বছর কাটিয়েছি।'

'ছেড়ে দিলে কেন?'

'তোমারি মতো মানুষের জ্বালায়। তিন-শো পঁয়ষট্টি দিন তিন-শো পঁয়ষট্টি জন গায়ে পড়ে বলে, ''আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে বিয়ে করো।'' শোনো একবার কথা। ভালোবেসেছেন তো মাথা কিনেছেন। সেই আহ্লাদে বিয়ে করে গলায় দড়ি দিই!'

'এতক্ষণে জানলুম তোমার হৃৎপিন্ডটা নেই, কারুর কারুর যেমন ফুসফুস থাকে না।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। তুমি তো আমাকে বিয়ে করবার আবদার ধরেছ। কাল যদি ডাক্তার দেখে বলে, ''এ মেয়ের একটা ফুসফুস নেই'', তবে তোমার প্রেম কোথায় থাকবে?'

সোম উত্তর দিতে পারল না।

তাকে অপ্রস্তুত দেখে পেগির ফুর্তি বাড়ল। বলল, 'এই তো পুরুষের—না, না, মানুষের—প্রেম। তোমার ফুসফুস না-থাকা তো দূরের কথা, তোমার একটা কান নেই দেখলে আমি তোমার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করতুম।'

'জলজ্যান্ত দু-দুটো কান দেখেও তো কান দিচ্ছ না প্রস্তাবে।'

'দিচ্ছি নে? এইবার দিই। তুমি বলে যাও যা বলবার। বলো, ''তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, মর্ত্যের চেয়ে, স্বর্গের চেয়ে, সম্মানের চেয়ে, এমনকী কমলা লেবুর চেয়ে''।'

সোম পেগির দুই গালে দু-টি ঠোনা মেরে বলল, 'আপেলের চেয়ে।'

'বলো, ''তুমি হেলেনের চেয়েও সুন্দর, তোমার জন্যে আমি ট্রয়ের যুদ্ধ জিততে পারি, হারকিউলিস-এর মতো বারো বার অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। কী না করতে পারি! কী না করতে পারি! তোমার ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়তেও পারি''।'

সোম আহত হয়ে বলল, 'পেগি!'

'মনে কষ্টবোধ করছ? কিন্তু এক পুরুষের পাপের ফল অন্য পুরুষকে ভুগতে হবে। সে হতভাগাকে তল্লাস করে পাইনি, তোমাকে পেয়েছি, তার প্রাপ্য শাস্তি তোমাকে দেব।'

'হবুচন্দ্রের বিচার। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে।'

'জীবনে তাই হয়ে থাকে। যে লোকটা আমার ব্যাগের উপর হস্তকৌশল দেখাল তার উপর দিয়ে হয়তো ডাকাতি হয়ে গেছে।'

'ধন্য, ধন্য পেগি। আমি তোমাকে সামান্য তরুণী ভেবেছিলুম। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধা। চাই কী দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হতে পার।'

পেগি সোল্লাসে বলল, 'তবে? বিয়ে করে আমার ভবিষ্যৎ মাটি করব? আমার ইচ্ছে আছে তোমার মতো কলেজে পড়াব। অবিশ্যি অবস্থার উন্নতি হলে।'

'পেগ, আমি মত বদলাতে রাজি আছি। অর্ধং ত্যজতি পন্ডিতঃ। তুমি আর আমি দু-জনেই কলেজে যাব, ফ্ল্যাট নেওয়া নাই-বা হল, আমার ল্যাণ্ডলেডি তোমারও ল্যাণ্ডলেডি হবে।'

'তোমার বয়স কত?'

'তেইশ।'

'এই বয়সে বিয়ের ভাবনা ভাব কেন?'

'সকলেই ভাবে।'

'অন্যায়। তিরিশ পর্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার করতে হয়, তারপর বিয়ে।'

'বিয়েটাও কি একটা অ্যাডভেঞ্চার নয়?'

'যারা ও-কথা বলে তাদের বিয়ে করতে আমি চাইনে। বিয়ে আমার কাছে সেকরেড। একবার করলে শেষবারের মতো করলুম।'

'তুমি রোমান ক্যাথলিক?'

'আমি ননকনফরমিস্ট।'

‘তবে তোমার এ গোঁড়ামি কেন?’

‘গোঁড়া হলে তো আজকেই তোমাকে বিয়ে করতুম গো। নই বলে আরও আট বছর অ্যাডভেঞ্চারে কাটাব।’

সোম বলল, ‘তুমি মরো। আট বছর কেন আট মাসও আমার ধৈর্য থাকবে না। হয় কাল আমরা বিয়ে করব নয় কোনো দিন না।’

‘কাল তো আমরা লণ্ডনে ফিরছি। সারাদিন ট্রেনে।’

‘তবে পরশু লণ্ডনে।’

‘লণ্ডনে আমার ঠিকানা পাবে কোথায়? স্টেশনে আমাদের প্রথম দেখা, স্টেশনে হবে শেষ দেখা। ভিড়ের মধ্যে মাছের মতো তলিয়ে যাব।’

‘তা হলে আজকেই আমাদের বিয়ে।’

‘সে কী।’

‘আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?’

‘বলপ্রয়োগ করবে নাকি?’

‘আমার ট্যাকটিক্স আমি ফাঁস করে দেব কেন?’

‘ট্যাকটিক্স আমারও আছে। এ-রকম লোকের হাতে এই প্রথম পড়িনি।’

‘বেশ। আমি বসে বসে আমার প্ল্যান কষি। তুমি বসে বসে তোমার অতীতকালের ব্রহ্মাস্ত্রে শান দাও।’

‘তা হলে কফির ফরমাশ করো। যুদ্ধে মরব কি বাঁচব জানিনে। তবু বল সংগ্রহ করে নিই।’

সোম টেবিল বাজাল। হিল ছুটে এল। ‘ইয়েস, স্যার?’

‘দু-পেয়ালা কফি। তোমার আর কিছু চাই?’

পেগি বলল, ‘আমার ওই যথেষ্ট। তোমার দরকার হয় তো আরও কিছু চাও।’

কফি খাওয়া চলতে থাকুক। ইত্যবসরে আমরা পাঠককে তার আগের দিনের ব্যাপার জানিয়ে রাখি।

২

তার আগের দিন

পর্যঙ্কওলের প্রভাত। জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। মেঘলা করেছে বলে আকাশের রঙের সঙ্গে সমুদ্রের রং ম্যাচ করছে না। সোম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, আমার তো ঘুম ভেঙেছে, পেগির ভেঙেছে কি না। আমি যদি উঠতে গিয়ে শব্দ করি তার ঘুম অকালে ভাঙবে। অকালে নয় তো কী? কাল রাত্রি মনে পড়ে না? পড়ে। ওঃ, কী দুর্দিনই গেছে। কিছুতেই রাত্রের আশ্রয় খুঁজে পাইনে, যদি-বা পেলুম কী লজ্জা! একটি ঘরে দু-জনের বিছানা। কখনো এমন ঘটে কারুর জীবনে? কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছি?

সোম আকাশ ও সমুদ্র উভয়ের রাত্রিযাপন-রহস্য অনুধ্যান করছে। ভাবছে, কেমন করে আত্মসংবরণ করলুম? পাশের বিছানায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রলোভন। যুবতী নারী? তার বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুট তুচ্ছ, রকফেলারের ঐশ্বর্য ছার। ঘুম কি কিছুতেই আসে? তার প্রতিটি নিঃশ্বাসপতনের শব্দ শুনছিলুম—যেন এক একটি ডলার। হঠাৎ একসময় তার নিঃশ্বাস ফেলা থামল। সে পাশ ফিরল। ফিরে লেপটাকে আরেকটু উপরের দিকে টেনে নিল। রাত্রি অন্ধকার হলেও কাচের দেয়ালজোড়া জানালা যেন জানালা নয়, কাচের দেয়াল। বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ঘর, গ্যারেট, ছাদটা ঢালু হয়ে নেমেছে আমাদের পায়ের দিকে। বেশ দেখতে পাচ্ছিলুম তার বব-করা চুল তার গাল বেয়ে তার মুখ ও চিবুক আড়াল করেছে। ইচ্ছে করছিল হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিই, তা হলে তার শুভ্র মুখখানি রজনীগন্ধার মতো ফুটন্ত দেখায়। কিন্তু সে যে ভীষণ চমকে উঠত। হয়তো চেঁচিয়ে উঠত, ‘চোর’, ‘চোর’। অথবা তার চেয়ে যা খারাপ তাই অনুমান করত! বলত, নাঃ, পুরুষমানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করতে নেই। ওরা মার্জার বৈষ্ণব, সুযোগ পেলেই নখদন্ত বের করে।

সোমের বক্ষে নটরাজের তান্ডব চলেছিল যতক্ষণ না তার ঘুম এসেছে ততক্ষণ। কামনার ডম্বরুধ্বনি, কল্পিত সম্ভোগের তাতা থই থই, অসংযমের ছন্দ। রাত্রে কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেলে সোম খালি ভেবেছে, জীবনে এ সুযোগ ফিরবে না, জীবনে এমন রাত আসবে না—too good, too good। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাত্রি প্রভাতের অভিমুখে ছুটেছে। মুমূর্ষুর মতো হতাশ হয়ে সোম জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির মতো পেগির নিঃশ্বাসপতনের শব্দ গুনতে থাকে, গুনতে গুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

এইমাত্র তার শেষবার ঘুম ভেঙেছে। এবার প্রভাত। কাপড় ছাড়তে হবে, প্রাতরাশ করতে হবে, তারপর সমুদ্রকূলে খানিক বেড়িয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরতে হবে। আবু হোসেনের আরব্যরজনী পোহাল। পেগির ছুটি ফুরিয়েছে, পেগি কাল অফিস করবে। লণ্ডনের জনতার মধ্যে সোম তার কেউ নেয়, সোমও তাকে খুঁজে নিরাশ হবে।

আসন্ন বিরহের বেদনা তার সম্ভোগকামনাকে লজ্জা দিয়ে চুপ করিয়েছিল। আহা, চাইনে সম্ভোগ, চাইনে আর কিছু, সমস্ত জীবনটা যদি এবারকার ইস্টারের ছুটি হত তার এবং পেগির। তারা শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু পেত, গল্প করত, তর্ক করত, একসঙ্গে খেত, একই ঘরে স্বতন্ত্র শয্যায় শুয়ে পরস্পরকে বলাবলি করত, ‘গুডনাইট, মিস্টার সোম’, ‘গুডনাইট, মিস স্কট।’

‘হ্যালো।’

সোম পাশ ফিরে দেখল পেগি তখনো তেমনি নিশ্চলভাবে পড়ে। ওঠবার নাম করছে না। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানকার আলস্যটুকু ভোগ করে নিচ্ছে। শুধু আলগোছে ডাকছে, ‘হ্যালো।’

সোম বলল, ‘ঘুম ভেঙেছে আপনার?’

‘আপনার?’

‘অনেকক্ষণ। সত্যি কথা বলতে কী আমার ঘুম ক্রমাগত ভেঙেছে আর লেগেছে।’

‘আমার নাকের গর্জনে?’

‘কখনো না। আপনার নাক তো কামান নয়।’

‘কটা বাজল?’
‘আটটা বাজে।’
‘উঠতে কান্না পাচ্ছে।’
‘আরও আট ঘণ্টা ঘুমোন না?’
‘উঁহু, ট্রেন ফেল করব।’
‘কোথাকার ট্রেন? লণ্ডনের, না, টেনবির?’
পেগি গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, ‘ওমা, টেনবি গেলে আমার চাকরি থাকবে?’
‘কিন্তু টেনবি না গেলে আপনার আফশোস থাকবে। কাল শুনলেন না টেনবির সুখ্যাতি?’
‘আমার দেশের সকলই সুন্দর। It is a dear old country. তা বলে সব ঘুরে দেখবার মতো আয়ু আমার নেই।’
সোম নীরব।
পেগি বলল, ‘আপনার উৎসাহে আমি বাধা দেব না, মিস্টার সোম।’
সোম অভিমানের সুরে বলল, ‘আপনার যে উৎসাহ নেই এই আমার উৎসাহের চরম বাধা।’
‘অদ্ভুত মানুষ তো? আমার চাকরিটি নেবেন?’
‘তা কি বলেছি? আপনার চাকরি আপনি সারাজীবন রাখুন।’
‘পারি নে এমন মানুষকে নিয়ে। সলসবেরি থেকে টানলেন ব্রিস্টলে। ব্রিস্টল থেকে পর্থকওলে। টেনবি থেকে নিউ ইয়র্কে টানবেন নাকি?’
‘নিউ ইয়র্ক থেকে ইন্ডিয়ায়।’
‘আশ্চর্য নয়। কী জাদু আছে আপনাতে। ব্ল্যাক ম্যাজিক জানেন বুঝি?’
‘তা যদি জানতুম তবে আমার দুঃখ ছিল কী! আপনাকে একদন্ড চোখের আড়াল হতে দিতুম না।’
‘এরই মধ্যে এত। আমি ভেবেছিলুম এই লোকটির যখন কালো চেহারা তখন এই হবে আমার একমাত্র পুরুষ-বন্ধু।’
‘তার মানে কী, মিস স্কট?’
‘আর ঘটা করেন কেন? যা বলে ডাকতে মন চায় তাই বলে ডাকুন।’
‘পেগি বলে ডাকব?’
(হেসে) ‘ডাকলে জিভখানা কেটে ফেলব না?’
‘তুমি তা হলে আমাকে কল্যাণ বলে ডাকবে?’
‘কী নাম? কলিন?’
‘কল্যাণ।’
‘কোলল্যান।’
‘হয়েছে।’
‘তা হোক। ও নামে ডাকা শক্ত। সোম বলে ডাকব।’
‘কিন্তু একমাত্র পুরুষ-বন্ধু সম্বন্ধে কী বলছিলে, পেগি।’
‘বলছিলুম এমন একজন পুরুষ দেখলুম না যে বন্ধুতার মর্যাদা রাখল। দু-দিন পরে নর-নারীর সেই আদিম সম্পর্ক। বন্ধু হয়ে উঠল প্রেমিক। হতে চাইল স্বামী।’
‘স্বামী কি নারীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু নয়?’
‘চাইনে শ্রেষ্ঠ বন্ধু। চাই কতকগুলি পুরুষ যারা আমার তেমনি দরদি বন্ধু হবে যেমন আমার বন্ধুনি ক্যাথরিন, ম্যারিয়ন, মেরি। আমার অসুখ করলে তত্ত্ব নেবে, বলবে না যে, “কী হবে গো! তোমার অসুখ

আমাতে বর্তায় না?'' আমার সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে হঠাৎ আমার গলাটা জড়িয়ে ধরবে না, আমি গাল সরিয়ে নিলে আমার কানের উপর চুমু খাবে না।'

সোম হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা, আমি সে গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমি ঠিক গালকেই তাক করব—আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।'

পেগি হেসে গড়াতে গড়াতে যেই খাটের প্রান্তরেখায় এল অমনি লাফ দিয়ে বলল, 'বন্ধু, চোখ বোজো। আমার কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে পরে চোখ খুলতে পারবে।'

সোম চোখ ফিরিয়ে নিল সমুদ্রের দিকে। সেখান থেকে মাইল খানেক দূর। তবু যারা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে তাদের বেশ দেখা যায়।

কাপড় ছেড়ে পেগি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, 'নীচে অপেক্ষা করছি। দেরি কোরো না।'

খেতে খেতে পেগি বলল, 'সোম, ভেবে দেখলুম, এত দূর যখন এসেছি তখন টেনবিটা দেখে যাওয়াই ভালো। একদিনের ছুটির জন্যে তার করে দিই।'

'উঁহু। তিন দিনের কমে আমি রাজি নই।'

'সোম, don't be silly।'

'পেগি, don't be rude।'

'মাফ চাইছি, সোম।'

'মাফ করবার কিছু নেই, পেগ।'

'You are a dear.' (কোমল সুরে)

'পেগ তোমার তিন দিনের মাইনে দেবার মতো সঙ্গতি তোমার বন্ধুর আছে।

'কিন্তু তোমার বন্ধুনি তা নেবে না, সোম।'

'নিক নাই নিক, আমি আমার দাবি ছাড়ব না। তিনটি দিন আমাকে দিতে হবে।

'সোম, be reasonable, দু-দিন।'

'আচ্ছা, দু-দিন।'

পেগি ও সোম রাত্রের ঘরভাড়া দিয়ে বিদায় নেবে এমন সময় বাড়ির কর্ত্রী এসে সোমকে একখানি অটোগ্রাফের খাতা দিয়ে বলল, 'নিজের ভাষায় আপনার নামটি লিখে দিয়ে যাবেন? কৃতার্থ হব।'

সোম বলল, 'নিশ্চয় লিখে দেব।'

বুড়ি বলল, 'ম্যাডাম, আপনি?'

পেগি হেসে বলল, 'আমার নিজের ভাষা কি আমি জানি? সোম, তুমি আমাদের নিজের ভাষায় লিখে দাও।'

বুড়ি তার কথা বিশ্বাস করল না। এদের রং আলাদা, ইংরেজির উচ্চারণ আলাদা।

কিন্তু পেগি কেন নিজের নাম-ধাম লিখল না? কারণ সে কিছুতেই লিখতে পারত না যে তার নাম পেগি সোম। যদি লিখত পেগি স্কট তবে বুড়ি ভাবত, বটে? ডুবে ডুবে জল খাবার আর জায়গা পেলে না? কাল বারোটা রাত্রে এসে বললে, 'ঘরের সন্ধানে চার ঘণ্টা ঘুরেছি, আজকের মতো আশ্রয় দাও।' আইবুড়ো মেয়ের এই চক্রান্ত।

পর্থকওল থেকে টেনবি যাবার পথে অনেকগুলো চেঞ্জ। ক্রমাগত ট্রেন বদল করতে করতে পাছে লাঞ্চ-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় এই ভেবে তারা মাঝপথে নেমে পড়ল সোয়ানসি-তে। খুব বুদ্ধিমানের কাজ করল, কেননা সে রাত্রে উপবাস দিতে বাধ্য হওয়া তাদের অদৃষ্টে ছিল। অবশ্য সে-কথা আগে থেকে জানলে তারা ডবল লাঞ্চ খেত, এত খেত যে রাত্রে খাবার দরকার হত না। কিন্তু তারা ভবিতব্যজ্ঞ ছিল না। সেইজন্যে

সম্মুখে একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়ল এবং ওয়েলস-জাতীয়া ওয়েট্রেসকে ফরমাশ দিল যা সাধারণত খেয়ে থাকে তাই।

পেগি বলল, ‘ওয়েলসরা কেমনতরো funny, যেন ইংরেজই নয়।’

সোম বলল, ‘ইংরেজ না হলেই funny হতে হবে তার মানে কী!’

‘আহা, তোমাকে গায়ে পেতে নিতে কে বলছে? আমি শুধু বলতে চাই ওরা দেখতে আমাদের মতো নয়।’

‘আমার মতো নয় সে-কথা ঠিক। এবং তোমার মতো নয় সে-কথাও ঠিক। অনেকটা কন্টিনেন্টালদের মতো। ওই ছেলেটিকে লক্ষ করো। ওই যুবকের দলটিকেও।’

‘বড়ো বক বক করে। শিষ্ট হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, নড়ছেই চড়ছেই উঠছেই বসছেই।’

‘আমার এই ভালো লাগে। সর্বদা সব ক-টা অঙ্গ ব্যবহার করছে। আমার দেশের লোক তাই করে।’

‘তবে তোমার দেশে আমি যাব না।’

‘আমার দেশের দুর্ভাগ্য।’

‘শুনেছি তোমার দেশে সাপ আছে।’

‘শুধু সাপ? বাঘ ভাল্লুক কুমির। তার চেয়েও যা মারাত্মক, মশা মাছি ইঁদুর।’

(রুদ্ধনিঃশ্বাসে) ‘সত্যি?’

‘সত্যি।’

‘তবে সে-দেশে তুমি ছিলে কী করে?’

‘আরও তিরিশ কোটি মানুষ আছে।’

‘সত্যি?’

‘বিশ্বাস হয় না?’

‘না।’

‘বইতে পড়নি?’

‘বই আমি তেমন পড়ি নে। I am not a great reader, you know.'‘তোমাদের সাম্রাজ্য। খবর রাখ না?’

‘ইশকুলে পড়েছিলুম বটে India is the brightest gem on the British crown। আর ওখানকার সবাই ভেলকি জানে। তুমি জান?’

‘পাগল!’

‘না, না, সত্যি বলো। লুকিয়ো না। লোহাকে সোনা করতে পার?’

‘তা জানলে তো আমরা জাত-কে-জাত বড়োলোক হয়ে থাকতুম, পেগি।’

‘আর কত বড়োলোক হতে? শুনেছি তোমার দেশে অগুনতি মহারাজা। এই যে তুমি এত দূর দেশে এসেছ বড়োলোক বলেই তো পারলে?’

‘এর জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি পেগ। সে তুমি ভাবতে পারবে না, বন্ধু। তোমার দেশের ছেলেরা যে বয়সে যৌবনকে ভোগ দিয়ে সার্থক করে সে বয়সে আমি ঘরে খিল দিয়ে বই মুখস্থ করেছি। কত বসন্ত দোরে ঘা দিয়ে গেছে, সাড়া পায়নি। আমি যে যুবক সে আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম তোমার দেশে পা দিয়ে।’

এর পরে কিছুক্ষণ দু-জনেই নিস্তব্ধে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। মুখে মৃদু মিষ্টি হাসি।

পেগি বলল, ‘আচ্ছা, তোমার দেশে কুকুর আছে?’

সোম অট্টহাস্য করে বলল, ‘অসভ্যতা মাফ করো, পেগি। বললে পারতে, তোমার দেশে মেয়েমানুষ আছে?’

‘সে তো স্বতঃসিদ্ধ।’

‘মোটেই না। এমন দেশ আছে যেখানে মেয়েমানুষ নেই।’

'Don't be ridiculous.'

'ধরো, অ্যান্টার্কটিকা একটা মহাদেশ। সেখানে মেয়েমানুষ নেই।'

পেগি হার মানল। বলল, 'তাই তো। তুমি ভয়ানক চতুর। কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না যে। তোমার দেশে কুকুর আছে?'

'আছে। তুমি কুকুর ভালোবাসো?'

'ভালোবাসি। I worship them.'

'আশ্চর্য নয়। কে যেন লিখেছে ইংরেজরা আগে God-কে পূজা করত, আজকাল Dog-কে পূজা করে।'

আরও কয়েকবার ট্রেন বদল করে তারা টেনবির গাড়িতে উঠল। তখন সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। তবে ভরসা এই যে ইংল্যাণ্ডের গোধূলি বহুক্ষণব্যাপী।

গাড়িতে নতুন আলাপীরা চিরন্তন বিষয় নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুলছিল। 'এমন ওয়েদার কোনো বছর হয় না।'...'যেমন করে হোক ইস্টারের সময়টা বৃষ্টি হবেই। এবারকার ইস্টারটা ব্যতিক্রম।'...'প্রতিদিন রৌদ্র। সারাদিন রৌদ্র।'

পেগি ও সোম পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চোখে চোখে হাসছিল। এই চারটি দিন তাদের দু-জনের পক্ষে সব দিক দিয়ে সুদিন।

এক বর্ষীয়সী সোমের সঙ্গে আলাপ করবার ছল খুঁজছিলেন। বললেন, 'আপনি আসছেন কোনো গরম দেশ থেকে, না মশাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ডিয়া থেকে।'

'সঙ্গে করে এই সুন্দর ওয়েদারটি নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্যে।'

সকলে সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক।'

সোম সস্মিত প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু আমি এসেছি কবে! দেড় বছর আগে!'

'দেড় বছর আগে।' (প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে') 'সেইজন্যে এমন ইংরেজি বলতে পারছেন।'

'ইংরেজি আমি দেশেই শিখেছি।'

'বটে! ইশকুল আছে ও দেশে?'

'অজস্র।'

বর্ষীয়সী আর কথা খুঁজে পেলেন না। একটি মধ্যবয়সিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওয়েলস কেমন লাগছে?'

সোম বলল, 'ইংল্যাণ্ডের থেকে এমন কী তফাত।'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু যারা ইংল্যাণ্ড গেছে তারা বলে অনেক তফাত!'

'আপনি ইংল্যাণ্ডে যাননি?'

'কবে আর গেলুম! যাই যাই করি, যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

সোম বলল, 'আপনাকে কিন্তু দেখতে ওয়েলসের লোকেদের মতো নয়।'

'তা তো হবেই। পেমব্রোক অঞ্চলে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পূর্বপুরুষ ছিল ফ্লেমিশ আগন্তুক।'

পথে মধ্যবয়সিনী নেমে গেলেন। যাবার সময় এমনভাবে ও এমন সুরে 'গুড বাই' বললেন যেন বহু পুরাতন বন্ধুনি।

সোম পেগির আরও নিকটে সরে এল। পেগি বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে হাত রাখল। একান্ত নির্ভরের সঙ্গে। সোম নিজেকে ধন্য জ্ঞান করল। তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ। সূর্যাস্তটি সুন্দর। ট্রেনটি মন্থর। প্রতিবেশীগুলি সহৃদয়। আর তার সাথিটি? সে পোষা পাখিটির মতো তার হাতের মুঠোয় নিজের প্রাণটি ভরে দিয়েছে।

পেগে সোমের কাঁধে মাথা রেখে নিঃস্পন্দ হয়ে রইল। তার দৃষ্টি জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তে নিলীন হয়েছে। সোম অনড় অচঞ্চলভাবে কাঁধ খাড়া রাখল। সে এক কঠোর পরীক্ষা।

অবশেষে ট্রেন টেনবিতে পৌঁছোল।

তখন গোধূলি লগ্ন। দু-জনে হাত ধরাধরিভাবে ছোটো শহরটিতে রাতের বাসার খোঁজে চলল।

গুটি দুই তিন হোটেল অতিক্রম করল। তাদের হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। হোটেলের খাঁই মেটানো যায় না। যদি ছোটো বোর্ডিং হাউস পায় তো উত্তম হয়।

দু-এক জায়গায় বেল টিপল। জিজ্ঞাসা করে, উত্তর পেল, এখানে তো ঘর খালি নেই, আর একটু এগিয়ে গেলে পেতে পারেন। আর একটু এগিয়ে যেতে যেতে তারা যেখানে পৌঁছোল সেখানে সমুদ্র সংকীর্ণ হয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

একজনের সঙ্গে দেখা।

সোম বলল, 'বলতে পারেন, এখানে বোর্ডিং হাউস পাই কোথায়?'

'কী? আসল সমুদ্রটা কোন দিকে? সোজা দক্ষিণ মুখে যান, সমুদ্রে পড়বেন, বাঁধানো ঘাট, বিস্তৃত promenade.'

'সে-দিকে বোর্ডিং হাউস আছে?'

'একটা নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। আমরাই তৈরি করছি। তৈরি শেষ হয়ে যাক, আমরা ওখানে একটা মিটিং করব দেখবেন। লেবার পার্টির মিটিং। জানেন মশাই, জায়গাটা কনসারভেটিভদের পৈত্রিক সম্পত্তি—বাছাধনরা নড়তে চান না সিংহাসন থেকে। তা ওরা চলে ডালে ডালে তো আমরা চলি পাতায় পাতায়।'

লোকটা বদ্ধ কালা ও বাচাল। সোম বলল, 'পেগি, কী করা যায়?'

পেগি বলল, 'কালকের মতো চার ঘণ্টা হাঁটতে পারি নে বাপু। আজকে ইস্টার সোমবার, সব জায়গা ভরতি।'

সোম আরেকবার চেষ্টা করল। 'ওহে, শুনছ? আমরা লণ্ডন থেকে আসছি—'

'আমি জানি আপনি টাইবেটান (Tibetan)। ঠিক কি না বলুন। আমি বাডিজম (Buddhism) সম্বন্ধেও খবর রাখি, মশাই।'

সোম হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পেগ, তুমি এইখানে বোসো। আমি খোঁজ করে আসছি।'

পেগি বলল, 'ওকে হাত নেড়ে বোঝাতে পার না ইঙ্গিতে?'

সোম বলল, 'তা হলে ও ভাববে আমি ওকে কালা বলে উপহাস করছি। রেগে আমার মাথা নেবে।'

যা হয় হোক সামনের টি-রুমসে ধাক্কা মারব। এই ভেবে সোম পেগিকে পিছনে রেখে খানিক দূর এগিয়ে গেল।

টি-রুমসের দরজা খুলে একটি বুড়ি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল।

সোম বলল, 'দু-টি মানুষের জন্যে ঘর দরকার। হবে?'

সোম আশা করেনি যে 'হ্যাঁ' শুনবে। বুড়ি বলল, 'দু-টি ছোটো ঘর খালি ছিল। আজকেই একটিতে লোক নিয়েছি। একটি ছোটো ও একটি বড়ো ঘর খালি আছে। দেখবেন?'

সোম পরিদর্শন করল। ঘর দু-টি স্বতন্ত্র তলায়। বুড়িকে বলল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। বেহাত কোরো না।'

পেগিকে বলল, 'তোমার পছন্দ হবে না জানি। তবু নাই ঘরের চেয়ে যেমন-তেমন ঘর ভালো। এখন ভেবে বলো একটা বড়ো ঘর ও একটা ছোটো ঘর নেওয়া যাবে, না, কেবল একটা বড়ো ঘর?'

'দুটো ঘর নিলে টাকা বেশি নেবে?'

'নেবে না? ইস্টারের মরসুম?'

'তবে—তবে—'

'বুঝেছি। কিন্তু বড়ো ঘরটিও যথেষ্ট বড়ো নয়। তাতে একটা বড়ো খাট ও একটা ছোটো খাট। ছোটো খাটটাতে বিছানা পাতা নেই।'

'উপায়?'

'বুড়িটি ভালো। বললে পেতে দেবে।'

বুড়ি বলল, 'তার আর কী! ধোপা-খরচা দিতে রাজি থাকেন তো আরেক সাজ বিছানা পেতে দিচ্ছি।'

সোম বলল, 'তা না হয় হল। আমি চার দিন স্নান করিনি, মিসেস উইলকিনস। স্নানের ঘর আছে তো?'

'দুঃখিত হলুম স্যার। শোবার ঘরে গরম জল দিয়ে আসতে পারি। গামলায় স্নান করবেন।'

'অভ্যাস নেই, মিসেস উইলকিনস। তোমরা কোথায় স্নান কর?'

'আমার কথা যদি জানতে চান আমি পঁয়ত্রিশ বছর এই বাড়িতে আছি। পঁয়ত্রিশ বছর গামলায় স্নান করে আসছি স্যার।'

'শাবাশ! বোধ হয় পঁয়ত্রিশ বারের বেশি স্নান করতে হয়নি, মিসেস উইলকিনস।'

বুড়ি আপত্তি করে বলল, 'না, না, সে কী হয়, স্যার! সমুদ্র এত কাছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রস্নান করেছি।'

'ঠিক, মিসেস উইলকিনস, তোমারও তো একদিন এঁর বয়স ও এঁর সৌন্দর্য ছিল।'

স্নানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা করতে পারবে কি না শুনে বুড়ি ঘাড় নাড়ল। বুড়ি ও তার বুড়ো সন্ধ্যার আগে High Tea খায়, ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। বাড়িতে এমন কিছু নেই যাতে দু-জনের পেট ভরতে পারে। তবে এখানে হোটেলগুলোতে ডিনার-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, হোটেলে ডিনার খেয়ে সমুদ্রের বাঁধের উপর বেড়িয়ে এলে যদি ক্ষুধা লাগে তবে কিছু ডিম ও রুটি বুড়ি জোগাতে পারবে।

রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া গেল না। ছোটো শহর। ছ-টার আগে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

খোলা ছিল কয়েকটি দামি ও নামি হোটেল। কিন্তু সেখানে খাবার খরচা অনেক। অত খরচ করতে পেগি কিংবা সোম রাজি নয়। পেগি বেরিয়েছিল তিন দিনের বাসা খরচা সম্বল করে। তিন দিনের বদলে চার দিন তো হলই, পাঁচ দিনও হবে। শুধু তাই নয়। সলসবেরি পর্যন্ত রেলভাড়া সঙ্গে ছিল, তার চারগুণ দূরে এসেছে। সেই জন্যে পেগি আজ তার বাড়িতে তার করেছে, 'টেনবির ডাকঘরের ঠিকানায় তার করে টাকা পাঠাও।' টাকাটা কাল সকালে ডাকঘরে গেলে পাবে খুব সম্ভব। তবু বলা যায় না তো। ডাকঘরওয়ালিরা যা দজ্জাল। যখন পুরুষ কেরানি ছিল তখন সুন্দরী তরুণীর মুখ দেখে বিশ্বাস করত। এখন ডাকঘরগুলো মেয়ে-কেরানিতে ঠাসা। তারা বিষম খুঁতখুঁতে। হয়তো বলবে, 'তুমি যে পেগি স্কট তার প্রমাণ কী?' পেগি বলবে, 'ক-জন পেগি স্কট এসে তোমার কাছে টাকা চেয়েছে শুনি?' মেয়েটা জবাব দিতে না পেরে চটে যাবে।

সোম পনেরো দিনের খরচা সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু টেনবি পর্যন্ত রেলভাড়া লাগবে, তার উদ্ভটতম কল্পনাও এতদূর যায়নি। যেন একজন কলকাতা ছাড়বার আগে ভেবেছিল হাজারিবাগ অবধি যাবে, কিন্তু ঘটনাচক্রে উপনীত হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। তার কল্পনার দৌড় ছিল গিল্ডফোর্ড পর্যন্ত, কিন্তু ভুল গাড়িতে চড়ে সলসবেরি, তার পরে রামমোহন রায়ের কবর দেখতে ব্রিস্টল। এতদূর যখন এসে পড়েছি তখন ওয়েলসটা মাড়িয়ে গেলে ক্ষোভ থাকে না। তাই কার্ডিফ পর্যন্ত আসা। তারপর থেকে বিধাতার নির্দেশ। কেমন করে কী হয়ে গেল, হঠাৎ চলন্ত বাস ধরে পর্থকওল রওনা হওয়া, রবিবারের রাত্রি, বাসা কিংবা খাবার কোনোটাই খুঁজে না পাওয়া, অনেক কান্ড করে অদ্ভুত অবস্থায় রাত্রিবাস। বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেলে স্বাদ বদলাতে চায় না। আরও নির্জনে পেতে চাই পেগিকে, আরও নির্জনে। পর্থকওলে বড়ো ভিড়, চলো টেনবি। টেনবিতেও ভিড় নেহাত কম নয়, চলো অন্য কোথাও। সোম ইতিমধ্যে ভাবতে আরম্ভ করেছে কাল পেগিকে নিয়ে কোন ঘুমন্ত পুরীতে যাবে—পেমব্রোক, ফিশগার্ড, আয়ারল্যাণ্ড? অন্তত সন্নিকটবর্তী ম্যানরবিয়ের, যেখানে নর্মান যুগের দুর্গ আছে? ম্যানরবিয়ের যদি যথেষ্ট জনবিরল না হয় তবে পেমব্রোক, ফিশগার্ড, আয়ারল্যাণ্ড। টাকা চাই। যা অবশিষ্ট আছে তাকে সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। পেগিকে আজ

টাকার জন্যে তার করতে বারণ করেছে কত। সে-ই যখন পেগিকে দূর থেকে দূরতর দেশে নিয়ে চলেছে তখন টাকার ভাবনা পেগির নয়, তার। কিন্তু পেগি বারণ মানেনি। বলেছে, সুখ যখন আমারও, সুখের দাম তখন আমিও দেব না কেন। ঋণী হতে পারব না, সোম।

সোম ভাবছিল, ভগবান করুন, পেগির যেন বাড়ি থেকে কাল টাকা না আসে। তা হলে আমার কাছে ধার নিতেই হবে তাকে। শোধ দেবার সময় আসার আগে পেগি আমার প্রিয়া। তখন আমরা শুধু অভিন্নহৃদয় নই, অভিন্নপকেট।

তা বলে পেগি কিংবা সোম কারুর ইচ্ছে ছিল না যে আজকের রাতটা উপোস দেবে। ওকথা ওরা ভুলেও ভাবেনি। লণ্ডন-ব্রিস্টলের মতো একটা সস্তা রেস্তোরাঁ পাবেই। টেনবির সুখ্যাতি শুনেছে। এমন একটাও রেস্তোরাঁ পাবে না যেখানে অল্প খরচে নৈশভোজন করা যায়?

সমস্ত শহরটা তিন বার চষে বেড়াবার পর তাদের চেতনা হল যে ন-টা বাজে। এখন হোটেলগুলোতেও ডিনার-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ।

পেগি বলল, ‘আমি আর শরীরের ভার বইতে পারছি নে, সোম। আমার ক্ষুধাও কখন নষ্ট হয়ে গেছে।’

সোম বলল, ‘লক্ষ্মীটি, এখনও দু-একটা হোটেলে ডিনার না হোক সাপার পাওয়া যাবে। আমার কাঁধে ভর দাও।’

পেগি বলল, ‘আমি এইখানে বসে তোমার প্রতীক্ষায় রইলুম। তুমি খেয়ে এসো।’

‘সে হয় না, দুষ্টু। একযাত্রায় পৃথক ফল?’

‘আমার ক্ষুধা নেই বলে তুমি উপোস দেবে? বেশ তো!’

‘তোমাকে ফেলে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাই নে, অমৃতও খেতে চাই নে।’

(অতি কষ্টে খিল খিল করে হেসে) ‘যেমন অবলীলাক্রমে বললে, শুনে মনে হল ও কথা অনেক বার প্র্যাকটিস করেছ। প্রেম করতে করতে ঝানু হয়ে গেছ। না?’

‘মুখে যা আসে বলো। কিন্তু পেট খালি রাখতে পাবে না বলে দিলুম।’

‘জোর করে গেলাবে নাকি?’

‘নিশ্চয়ই। তোমার দেহের উপর আমার অধিকার আছে।’

‘ইস!’

‘ইস কী গো? তুমি না খেয়ে রোগা হয়ে যাবে, আমি তাই দেখে ও তাই স্পর্শ করে সুখ পাব?’

‘যেন তোমার সুখের জন্যে আমার সৃষ্টি?’

‘নিশ্চয়ই। তোমার সুখের জন্য আমার। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের ভোগের জন্যে।’

‘যাও। তর্ক করবার মতো শক্তি নেই আমার।’

‘তবে আমার কাঁধে ভর দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো হাঁটো। ওই যে ফলের দোকানটা ওটা এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে।’

বাস্তবিক দোকানটা বন্ধ হবার মুখে। সোম ও পেগি এক মিনিট পরে এলে পস্তাত।

‘ইয়েস, ম্যাডাম? ইয়েস, স্যার?’

পেগি বলল, ‘আমাকে দাও আপেল।’

সোম বলল, ‘আমাকে দাও কমলা লেবু।’

তারপর দু-জনে সমুদ্রের বাঁধের উপর একটি বেঞ্চিতে বসে ফলগুলির সদব্যবহার করল। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে একটিও তারা অনুপস্থিত নেই। সমুদ্রের জল আকাশের মতো কালো অথচ ফেন-ধবল। তারাগুলি যেন আকাশের ফেনা, সমুদ্রে ছিটিয়ে পড়ছে।

আপেল ও কমলা লেবু ওরা ভাগ করে খেল। পেগি আধখানা খায়, সোম বাকিটা শেষ করে। সোম কিছুটা খায়, বাকিটা পেগিকে খাইয়ে দেয়। আদর করে তার মাথাটি বুকের কাছে আনে, একটি হাতে তাকে জড়িয়ে

ধরে অন্য হাতটি তার মুখের কাছে নেয়। পেগি যখন হ্যাঁ করে তখন দুষ্টুমি করে হাত সরিয়ে নেয়, পেগি চটে গিয়ে বলে, 'চাইনে আমি খেতে।' মুখে কুলুপ লাগায়। সোম তার মুখ খোলবার ভান করে গাল টিপে দেয়। পেগি হাসি চেপে থাকতে পারে না। মুখ খোলে। সেই সুযোগে সোম তার মুখে খাবার গুঁজে দেয়।

পেগি বলল, 'রাত অনেক হয়েছে। এবার পুলিশে পাকড়াবে।'

সোম বলল, 'কেন, আমরা তো কোনো অপরাধ করছি নে?'

'কে জানে বাপু। তুমি যে রেট-এ অগ্রসর হচ্ছ—'

'বাকিটা শেষ করে ফেল। যে রেট-এ অগ্রসর হচ্ছি—'

'মিস সাভিজ-এর মামলা মনে পড়ে? জিক্স হাইড পার্কে এক-শোটা পাহারাওয়ালা অতিরিক্ত বসিয়েছে।'

'টেনবিতে তো বসায়নি?'

'কে জানে বাপু; শুনলে না, কনসারভেটিভদের পৈত্রিক সম্পত্তি? বাবুরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হালে পানি পাচ্ছেন না, ঠাওরেছেন এই করলে বুড়ি ভোটারদের ভোট-এর জোরে অথই পাথার পার হবেন। সেটি আমরা হতে দিচ্ছিনে।'

'তোমরা ফ্ল্যাপাররা তো এবার ভোট-এর অধিকার পেয়েছ। কাকে ভোট দিচ্ছ?'

'লেবার-কে।'

'ইংল্যাণ্ডের মেয়েদের আমি চিনি। ডাচেসরা যেদিকে ওরাও সেইদিকে।'

'না গো মশাই। ওদের যথেষ্ট নিজত্ব আছে। ওরাও একটু-আধটু চিন্তা করে থাকে।'

'চিন্তাশক্তি থাকলে তো?'

'অমন যদি বল তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেব।'

'তাতে করে এই প্রমাণ হয় যে তোমাদের বাহুবল আছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি?'

'না যদি থাকে কেয়ার করিনে। রূপ যৌবন বাহুবল ও বিত্ত—এই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'এই যদি তোমাদের ধারণা হয় তবে ভাবী যুগের ইংল্যাণ্ডের কী দশা হবে ভাবি।'

'ইংল্যাণ্ডের দশা ভাবতে হবে না। ইংল্যাণ্ড অমর। Her soul goes marching on.' পেগি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। আর কালক্ষেপ করল না। বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি-না স্নান করবে কথা দিয়েছ?'

'যাঃ। ভুলে মেরে দিয়েছিলুম।'

'এই তো তোমার চিন্তাশক্তির প্রমাণ। এখন এসো। চলৎ শক্তির প্রমাণ দাও। মিসেস উইলকিনস অভিশাপ দিতে থাকবে।'

শোবার ঘরে স্নানের জল দিয়েছে। যে স্নান করবে সে ছাড়া আর কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না।

পেগি বলল, 'তুমি উপরে যাও, স্নান করো গে। আমি ততক্ষণ মিসেস উইলকিনসের সঙ্গে গল্প করতে থাকি।'

পেগিকে একদন্ড চোখের আড়াল করলে সোমের চোখ ছল ছল করে, একদন্ড কাছছাড়া করলে সোমের প্রাণ চলে যায়। সোম দশ মিনিটে স্নান শেষ করে, রাতের কাপড় পরে ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে বিছানায় উঠল। কিন্তু যতই অপেক্ষা করে পেগি আর আসে না।

পেগি কি এ ঘরে শোবে না?

নীচে গিয়ে পেগিকে পাকড়াও করে আনবে, সে উপায় নেই। তা হলে পোশাক পরতে হয়, অন্তত ড্রেসিং গাউন চড়াতে হয়। বাহুল্য মনে করে ড্রেসিং গাউন সোম আনেনি। সঙ্গে একটা হাত-ব্যাগ এনেছে, তাতে ধরে রাতের কাপড়, কামাবার সরঞ্জাম, অতিরিক্ত টাইকলার মোজা গেঞ্জি শার্ট। আর দু-চারটে খুচরো উপকরণ। যেটা পরে সেটার বেশি সুট আনেনি। সোম বোঝা বাড়াতে ভালোবাসে না। তাতে ভ্রমণের সুখ হ্রাস পায়। সোম দেখল পেগিরও মত তাই। পেগি অবশ্য এক বস্ত্রে আসেনি। তবু একটা সুটকেসে তার

কুলিয়ে গেছে। সোম বয় পেগির সুটকেস, পেগি ধরে সোমের হাত-ব্যাগ। কুলি করতে হয় না। ট্যাক্সি করতে হয় না। পথে চলার সুখ তারা ষোলো আনা ভোগ করছে।

দরজায় টোকা পড়ল। 'ভিতরে আসতে পারি?'

সোম বলল, 'আমার স্নান হয়ে গেছে কখন!'

পেগি দুধের গেলাসটি সোমের মুখের কাছে এনে বলল, 'Now be a good boy। এটুকু ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলো দেখি, যাদু।'

সোম বলল, 'এ কী?'

'এর নাম দুধ। ছোটো ছেলেরা এই খেয়ে ঘুমোয়।'

'ছোটো মেয়েটির খাওয়া হয়েছে?'

'ছোটো মেয়েটি স্নান করেনি, গরম দুধের দরকার বোধ করে না।'

'ছোটো ছেলেটির প্রতিজ্ঞা সে একা কোনো জিনিস খাবে না।'

'ঢং রাখো। ওঠো, খাও।'

'হুকুম?'

'হুকুম।'

'তবে দেখছি উঠতে হল। কিন্তু পেগ, তুমি একটি চুমুক খাও।'

'কী আবদারে ছেলে! এমনটি দেখিনি!'

'কী কড়ামেজাজি ঠাকুমা! এমনটি দেখিনি!'

দুধ খাওয়া শেষ হলে পেগি বলল, 'লক্ষ্মী ছেলেরা এখন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়। ঠাকুমার কাপড় ছাড়া দেখে না।'

সোম পাশ ফিরে চোখ বুজল। পেগি কাপড় ছেড়ে প্রথমে গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দিল, তারপরে নিজের বিছানায় লাফ দিয়ে উঠল। পেগির বড়ো খাট, সোমের খাট ছোটো।

'সোম, ঘুমোলে?'

সোম গলার সাহায্যে নাক ডাকাতে লাগল। সেই তার উত্তর।

'আমি একা জেগে থাকি কেন? আমি কিন্তু সত্যি সত্যি নাক ডাকাব।'

সোম বলল, 'চেষ্টা করলেও পারবে না।'

'ও কৌশলটা তোমার পেটেন্ট?'

'তুমি জাল করতে চাইলেও পার না।'

পেগি চেষ্টা করে হাস্যাস্পদ হল। তার নিজের হাস্যাস্পদ।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পেগি হঠাৎ আর্তকণ্ঠে ডাকল, 'সোম!'

সোমের ঘুম লেগে আসছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে সাড়া দিল। 'কী, পেগ।'

'ওটা কী ওখানে দাঁড়িয়ে?'

সোম চোখ মেলে বলল, 'কোনটা?'

'ওই যে জানালার কাছে। সোম, আমি মরে যাব। উঃ—উঃ—উঃ।'

সোম উঠে বসল। জানালার কাছে একটা ছায়া। গাছের ছায়া হবে। সোম জানালার কাছে গিয়ে স্ক্রিন টেনে দিল। বাইরে থেকে যেটুকু আলো আসছিল—গ্যাস পোস্টের আলো—সেটুকু গেল বন্ধ হয়ে। তখন সোম মোমবাতি জ্বালাল।

'পেগ।'

'কী?'

‘জানালার দিকে তাকাও।’
‘না গো। আমার গা ছমছম করছে।’
‘ভূত নয়, পেগ। গাছের ছায়া।’
‘তুমি আমার কাছে এসে বোসো।’
সোম তার শিয়রে বসল। বলল, ‘এত সাহসী অথচ এত ভীতু তুমি। সব মেয়েই তাই।’
সোম তার চুলগুলির ভিতর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। পেগি নীরবে আদর উপভোগ করতে থাকল।
সোম বলল, ‘অনেকটা হেঁটেছ আজ। পা কনকন করছে?’
‘করছে।’
সোম তার পায়ের কাছে উঠে গেল। পায়ে হাত বুলিয়ে দিল। পা টিপে দিল।
পেগি বলল, ‘উঃ। লাগে।’
‘একটু লাগবেই তো। তা নইলে সারবে না।’
পেগি বলল, ‘বড্ড লাগছে।’
সোম বলল, ‘আচ্ছা, আরেকটু আস্তে টিপছি।’
সোমের নিজেরই নেশা লেগে গেছিল। পনেরো মিনিট কেটে গেল। সে থামবার নাম করে না। বলে, ‘এবার উরু আর কোমর।’
পেগি বলল, ‘আমি আপত্তি করলে কি তুমি শুনবে যে আপত্তি করব?’
অর্থাৎ সে সাহ্লাদে সম্মতি দিল।
তারপর সোম দাবি করল পিঠ।
পেগি বলল, ‘তোমার ম্যাসাজ-এর হাত দেখছি পাকা। কোথায় কোথায় প্র্যাকটিস করেছ?’
সোম বলল, ‘ওটা আমাদের professional secret।'
সোমের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। পিঠের পরে হাত। একঘণ্টা কেটে গেল। রাত তখন বোধ করি একটা।
পেগি বলল, ‘আমাকে ঘুমোতে দেবে না?’
‘আগে তোমাকে সুস্থ করে তুলি।’
‘তুমি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছ, আমার শরীরের কোনো অঙ্গ বাদ দেবে না!’
‘তাতে তোমার লোকসান?’
‘লোকসান? মেয়েমানুষের লজ্জাশরম বলে কি কিছু নেই?’
‘ওটা একটা কুসংস্কার।’
‘উঃ, আমাকে ডালকুত্তার মতো ছিঁড়ে ফেলো না।’
‘আচ্ছা, আরও আস্তে।’
সোমের উৎসাহ ক্রমশ শ্লীলতার সীমা টপকাতে চায়। বুক।
পেগি বলল, ‘ওইটি পারবে না। সরাও, সরাও, হাত সরাও।’
সোম অভিমানে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। লক্ষপতি ছিল, কোটিপতি হতে গিয়ে পড়বি তো পড় শূন্যের কোটায়। মন্টিকার্লোতে জুয়ো খেলতে গেছিল। প্রায় সব পেয়েছিল, সব পাবার লোভে সব খোয়াল। এখন তাকে গলাধাক্কা দিয়ে casino-র চৌহদ্দি পার করে দিয়েছে।
সোমের মন গেল গলা ছেড়ে কাঁদতে। কিন্তু তার পৌরুষের অহংকার ছিল। তাইতে তাকে বাঁচাল। সে চুপটি করে বিছানায় ফিরে আসবার আগে এক ফুঁয়ে বাতিটি দিল নিবিয়ে। পেগিকে ‘গুড নাইট’ বলতেও অভিমানে তার মুখ ফুটছিল না। সে ভাবছিল, নাঃ, কালকেই লণ্ডনে রওয়ানা হবে, পেগি যা ভাবে ভাবুক। কীই-বা তার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক! পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়ে। সোমকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিল

পর্যন্ত। নিশ্চয়ই অন্ধকারে মুখ টিপে টিপে হাসছে। ভাবছে, প্রশ্রয় দিলুম, দিলুম, দিলুম। খেলিয়ে খেলিয়ে বুকের কাছ পর্যন্ত আনলুম! তারপরে মারলুম ফট করে একটা চড়। কুকুর! কুকুর! কুকুর! মাথায় উঠত!

সোম বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ জেগে বোধ করল কার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার গালের উপর পড়ছে। কে যেন আদর করে তার চোখের পাতার উপর সুগন্ধিযুক্ত রুমাল বুলিয়ে দিচ্ছে। সোম জাগল বটে, কিন্তু অভিমানে কথাটি কইল না। পেগি জানতেই পারল না যে সোম জেগে আছে। সোম বুদ্ধি খাটিয়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল ঠিক ঘুমন্ত মানুষের মতো।

পেগি সোমের কপালের উপর ঝুঁকে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে একটি চুমু খেল। যেন খাওয়া আর ফুরায় না। এক মিনিট যায়, দু মিনিট যায়, পাঁচ মিনিট যায়। সোম ভাবল, পেগি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

সোম বলল, 'পেগ?'

পেগি চমক দমন করে সহজভাবে বলল, 'ডিয়ার?'—ক্ষণেকের জন্যে মুখ তুলে আবার তেমনিভাবে রাখল। না জানি কত মধু পেয়েছে। শেষ না করে উঠে যেতে চায় না।

সোম বলল, 'পেগ, স্বার্থপরের মতো একা খেয়ো না। আমাকেও অংশী হতে দাও।'

পেগি বসবার ভঙ্গি বদল করে সোমের ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ ও সোমের অধরের উপর অধর স্থাপন করল। তার বুকের একাংশ সোমের বুকের একাংশ চুম্বন করছিল।

সোম আনন্দের উত্তেজনায় মূর্ছা গেল। যখন চেতন হল তখন পেগি উঠে গেছে। সোমের হৃদয় বলছিল, আমি পূর্ণ, আমার খেদ রবে না আজকে যদি মরি। দেহ বলছিল কী জ্বালা! কী জ্বালা! আমার শিরায় শিরায় মশাল জ্বলছে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে মরব।

সোম বিছানা ছেড়ে অনেকক্ষণ পায়চারি করল—ধীরে, অতি ধীরে; যাতে পেগির ঘুম না চটে যায়। জানালার কাছে এসে স্ক্রিন খুলে দিল। সমুদ্রের হাওয়া ঝিরঝির করে তার গায়ে এসে লাগল। তার দেহ স্নিগ্ধ হল।

আবার বিছানায় ফিরে এল। ভাবতে লাগল, কী আশ্চর্য এই জগৎ, কী আশ্চর্য মানুষের জীবন! পৃথিবীর এক কোণে তার জন্ম, পেগির জন্ম আর এক কোণে। তেইশ বছর তার খোঁজে কাটিয়ে দিয়েছে, এতদিন পায়নি। অকস্মাৎ ভিক্টোরিয়ার ভুল ট্রেনে সাক্ষাৎ। প্রথম রাত্রে সে স্বল্পপরিচিতা, সৌজন্যময়ী। দ্বিতীয় রাত্রে সে অবিজিতা, রহস্যময়ী। তৃতীয় রাত্রি পর্থকওলে। চতুর্থ রাত্রি এইখানে। চার রাত্রি নয়, যেন চারটি গুণ।

সোম একে একে প্রত্যেক যুগের ইতিহাস মনে লিখতে লিখতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

৩
তারও আগের দিন

ব্রিস্টলের একটা residential হোটেলের যে ঘরে লোকে খায়, বসে ও স্মোক করে সেই ঘরে সোম বসে পেগির জন্য অপেক্ষা করছিল। পেগি এলে দু-জনে প্রাতরাশ করবে।

ঘরটি লম্বা। একখানি মাত্র টেবিল। সেটিকে ঘিরে প্রায় বিশ জনের আসন। টেবিলের উপর একতাল রুটি। দু-টি কি তিনটি পাত্রে অনেকখানি জ্যাম। বোধহয় হোটেলের নিজের তৈরি। মার্গারিনের মতো দেখতে খানিকটা সস্তা মাখনের অল্পই অবশিষ্ট আছে। কেননা ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং দেরি করে যারা উঠেছে তাদের খাওয়া চলেছে।

তাদের প্রত্যেকেই খেতে বসবার আগে একবার সোমকে বলেছে, 'খাওয়া হয়ে গেছে আপনার?'

সোম বলেছে, 'না।'

'আসুন, খেতে বসি।'

'ধন্যবাদ। আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

প্রত্যেকের খাওয়া শেষ হয়ে যায়, আরেকবার সোমের সঙ্গে আলাপ জমাবার ছল খোঁজে। বলে, 'দিনটা চমৎকার।'

সোম বলে, 'চমৎকার।'

'এবারকার মতো ইস্টার আর হয়নি।'

'শুনতে পাই।'

'কোথা থেকে আসছেন?'

'লণ্ডন থেকে।'

'ওঃ, লণ্ডন। তা হলে আমাদের ব্রিস্টলকে আপনার মনে ধরবে না।'

কেউ বলে, 'আমি আসছি কার্ডিফ থেকে।'

'কার্ডিফ? সে কত দূর?'

'এই তো, চ্যানেলের ওপারে।'

'ওয়েলস দেখতে ইচ্ছে করে।'

'দেখেননি? দেখবার মতো। Wye Valley-র নাম শুনেছেন?'

'না।'

'সুন্দর।'

'কার্ডিফের কয়লার খনির কুলিদের ভারি দুর্দশা, না?'

'হবে না? ব্যাটারা গোঁয়ার। হিতবাক্য শুনবে না। ওদেরই তো দোষ।'

'এ বিষয়ে একমত হতে পারলুম না।'

ঘরের একাংশে কয়েকখানা গাইড বই ও ডাইরেক্টরি ছিল। সোম পাতা ওলটানোতে মন দিল। খুঁজে বের করতে হবে রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির শহরের কোন অঞ্চলে। জিজ্ঞাসাও করল দু-একজনকে।

'বলতে পারেন রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি কোনখানে?'

'কার বললেন?'

'রাজা রামমোহন রায়ের। একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয়ের।'

(Shrug করে) 'আমার তো জানা নেই। এই এন্ড্রুজ, জান একজন ইন্ডিয়ান মহারাজার কবর এ শহরের কোনখানে?'

এন্ড্রুজ জানে না। কিন্তু গোরস্থানগুলোর নাম করল। আজ রবিবার, দু-টোর আগে কোনো গোরস্থানে ঢুকতে দেবে না।

ইতিমধ্যে সোমের মন ওয়েলস-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিল। কাল রাত্রে ব্রিস্টলের যতটুকু দেখেছে ততটুকু তাকে আকৃষ্ট করেনি। লণ্ডনেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভেবেছিল সমুদ্রের উপরে। তাও নয়। লণ্ডনের একটা খেলো সংস্করণ। যে নাটক লণ্ডনে বহুদিন অভিনীত হয়ে আর চলল না সেই নাটক এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। পেগিকে নিয়ে কোনো একটা থিয়েটারে যেত, কিন্তু প্রোগ্রাম দেখে পা সরেনি।

পেগির প্রবেশ।

(চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে) 'গুড মর্নিং, মিস স্কট।'

(সলজ্জে) 'গুড মর্নিং, মিস্টার সোম। আমার খুব দেরি হয়ে গেছে?

'খুব না। মোটে দেড় ঘণ্টা।'

'মোটে দেড় ঘণ্টা? আমি ভেবেছিলুম আপনার মুখে শুনব দেড় শতাব্দী? নাঃ, আপনি poet-ও না, lover-ও না, ভুল ভেবেছিলুম। যাক, খাওয়া হয়েছে?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'হয়নি। কিন্তু কেন?'

'সেটাও অনুমান করুন।'

'দিন তা হলে আপনার হাত। তাই দেখে বলব। (তা দেখে) হাতে লিখেছে আপনি পেগি স্কট নাম্নী একটি মহিলার আসার পথ চেয়ে বসে কড়িকাঠ গুনছিলেন।'

'শেষটুকু ভুল। ডাইরেক্টরি ঘাঁটছিলুম। তার মানে কাজ গুছিয়ে রাখছিলুম।'

'সেই কথাই তো আমিও বলি। আপনি poet-ও না, lover-ও না, আপনি কাজের মানুষ। আমাদের মতো বিছানায় পড়ে পড়ে পাঁচ মিনিট পর পর ভাবেন না যে, থাক আর পাঁচ মিনিট পরে উঠব।'

'পাঁচ মিনিট আগে উঠলে পাঁচ মিনিট আগে একজনকে দেখতে পাব এমন যদি ভেবে থাকি সে কি আমার অপরাধ?'

'তা হলে অন্তত দরজায় একটা টোকা মেরে জানিয়ে যেতে হয় যে হুজুর দেখতে চান।'

'মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মানুষ তেড়ে মারতে আসে। অন্তত আমি তেমন মানুষ।'

'না, না, আর দেরি নয়। আসুন, খেতে বসি। কই, এরা কি কেউ কফি তৈরি করে দিয়ে যাবে না? কে আছে?' (একজন কফি দিয়ে গেল।) 'মিস্টার সোমের আজকের প্রোগ্রাম কী?'

'আপনারটা আগে বলুন।'

'আমি মাসিমার বাড়ি যাচ্ছি! সেইখানেই থাকব আজ। কালকের ট্রেনে লণ্ডন।'

'আর আমি যাচ্ছি ওয়েলস। ব্রিস্টলে আমার মন টিকছে না।'

'ও মা, তাই নাকি। আমি ভাবছিলুম কে আমাকে কাল ট্রেনে বসিয়ে দেবে।'

'ট্রেনে বসিয়ে দিতে কেউ হয়তো রাজি আছে, কিন্তু কার্ডিফ থেকে।'

'এত চুলো থাকতে কার্ডিফ? আমাদের কাজের মানুষটি কি কয়লার আড়তদার?'

'কয়লার কুলিদের দুরবস্থাটা একবার চাক্ষুষ দেখবার অভিপ্রায় আছে।'

'কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে আমি যেতে দেব না। সে যে আমার দেশের কলঙ্ক।'

(চমৎকৃত হয়ে) 'তাহলে সৌন্দর্যের মধ্যে নিয়ে চলুন। Wye Valley-তে?'

'আজকেই?'

'কাল তো আপনি লণ্ডনে চললেন?'

'তবু মাসিমা আটকাবেন।'

'মাসিমার সঙ্গে দেখা নাই করলেন?'

'বটে! যে কারণে এতদূর এলুম সেইটেকে বিসর্জন দেব?'

'বলুন, যে অছিলায় এতদূর এলুম।' (সোম মুখ টিপে টিপে হাসছিল।)

‘ভাবছেন আপনাকে ছাড়তে না পেরে এখানে এসেছি?’

‘কিংবা আমি ছাড়তে চাইনি বলে এখানে এসেছেন।’

‘কী ধৃষ্টতা!’

‘কী কপট কোপ!’

‘বেশি চটাবেন না। সবটা মাখন খেয়ে শেষ করে ফেলব।’

‘মোটা হবার ভয় নেই।’

‘হলে তো বেঁচে যাই। ‘ছাড়তে চাইনে’—বলে কেউ পিসি-মাসির প্রতি কর্তব্য ভুলিয়ে দেয় না।’

‘কিন্তু মোটা হতে আপনাকে আমি দেব না। সে আমার সৌন্দর্যবোধের উপর অত্যাচার! অতএব দিন ওটুকু মাখন।’

পেগি তার মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। একলাটি যাবে? মিস্টার সোম তাকে পৌঁছে দেবেন না?

সোমের বড়ো সংকোচ বোধ হচ্ছিল। পেগির সঙ্গে তার পথে পরিচয়। মাসিমা যদি জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমাদের পেগির সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুতা, না?’ সোম কী বলে উত্তর করবে? বলবে, ‘দু-দিনের পরিচয়ে যতটা হয় তার বেশি নয়?’ কিন্তু সত্যি তার বেশি নয়? সোম নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করল। হৃদয় উত্তর না করে লাজুক বধূর মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কিংবা ফুর্তি করে বলবে, ‘এত বন্ধুতা যে সেই জোরে আপনাকে 'Auntie' বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে।’ কিন্তু ফুর্তির পরেই হৃদয় নিজ মূর্তি ধরবে। হৃদয়ের কাঁপুনি এত উত্তাল হবে যে কানে বাজবে।

সোম বেঁকে বসল। ব্রিস্টলে তার থাকতে রুচি নেই, সে বারোটার ট্রেনে কার্ডিফ যেতে চায়। পেগির কাছে যদি পেগির মাসিমা-ই হয় বড়ো, পেগির বন্ধু কেউ না হয়—তবে পেগি একাই যাক, একাই থাক। আশা করা যায় মেসোমশাই ট্রেনে তুলে দিতে পারবেন, দুই হাতে করে তুলে দেবেন, ছোটো খুকিটি কি না।

‘বলবেন, Nunkey dear, আমাকে দু-হাতে তুলে ট্রেনে চাপিয়ে দাও না? আমি উঠতে গেলে পড়ে যাব যে। এমনি করে আব্দারের সুরে বলবেন।’ (সোম সুরের নমুনা দিল।)

‘উপদেশটা মাঠে মারা গেল। আমার মাসিমা সুতো কাটেন!’

‘Spinster? তা হলে তো বোনঝিটিকে পেলে লুফে নেবেন। ছেড়ে দেবেন না কালকের আগে। আমাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে হোটেলে।’

‘একা থাকতে পারবেন না?’

‘একা যদি থাকতেই হয়, ব্রিস্টলে কেন?’

‘বুঝেছি। পথে আরেকটি সঙ্গিনী পাবার আশা রাখেন।’

‘একজন যুবকের পক্ষে কি সেটা অন্যায় আশা, মিস স্কট?’

‘অতি ন্যায়সঙ্গত আশা। কিন্তু আমাকে আপনি ভাববার কারণ দিয়েছিলেন যে আপনি সকলের মতো নন।’

‘কাঁদছেন?’

‘কই, না? হাসছিই তো।’

‘তবে বুঝতে হবে হাসি-কান্না একই জিনিস। অনুমতি দেন তো চোখ মুছে দিই।’

‘ধন্যবাদ। অত গ্যালান্টপনা দেখাতে হবে না। বিদায়।’ (পেগি যাবার জন্য পা বাড়াল।)

‘বিদায়।’

(হঠাৎ সশব্দে হেসে) ‘আসুন না আমার ট্যাক্সিতে? আপনাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাব।’

‘ধন্যবাদ, মিস স্কট। কিন্তু আমার ট্রেনের দেরি আছে। পায়ে হেঁটে শহর দেখতে দেখতে যাব।’

ট্যাক্সি চলে গেল। সোম ভগ্নহৃদয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। হাতব্যাগটি নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে, যেদিকে দুই চোখ যায়। তারপর ট্যাক্সিতে করে স্টেশনে যাবে।

দু-দিনের সান্নিধ্য মিস স্কটের প্রতি তাকে আসক্ত করেছিল। মিস স্কট গেছে, কিন্তু আসক্তি থেকে গেছে। সোম বিছানায় শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ কাঁদবে ভাবছিল, যদি আসক্তিটা জল হয়ে কেটে যায়। স্মৃতির বোঝা বয়ে পথে চলা যায় না। পথিকের পক্ষে একটা হাতব্যাগই যথেষ্ট বোঝা।

কিন্তু বাসি বিছানায় শুতে তার প্রবৃত্তি হয় না। সে ব্যাগটা হাতে করে করিডর দিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, এমন সময় হোটেলওয়ালার মেয়ের সঙ্গে দেখা। তার হাতের উপর একটা টিয়া পাখি।

'আর ফিরে আসছেন না, মিস্টার?'

'না, মিস।'

'আবার কখনো এলে এখানেই উঠবেন।'

'যদি কখনো আসি। কিন্তু 'যদি' কথাটা 'আসি' কথাটার থেকে অনেক অনেক বড়ো।'

'কখনো আসবেন না?'

'আপনার দেশ তো আমার দেশ নয়, মিস। আমার দেশে ফিরে যেতে হবে না?'

'আপনার মা-বাবা এদেশে নেই?'

'দেশে দেশে আর সব পাওয়া যায়। টিয়া পাখি পর্যন্ত। কিন্তু মা-বাবা একটু দুষ্প্রাপ্য। না, মিস?'

(সকৌতুক) 'টিয়া পাখি, আপনার দেশে পাওয়া যায়?'

'ঝাঁকে ঝাঁকে। ক-টা চান?'

'তা বলে আমার জিম-এর মতো টিয়ে কখনো পাওয়া যাবে না। যা বলেছেন, একটু দুষ্প্রাপ্য। দেখুন, দেখুন, কেমন দুষ্টু। কামড়াতে চায়। আমি ওর মা, আমাকে ও কামড়াতে চায়। যেন ওর খাদ্য। লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।'

সোম একটু আদর করল টিয়াটিকে। আদর করলে কামড়াতে আসে। সোম মনে মনে বলল, 'মেয়েমানুষের মতো।' মনে মনে হাসল। উপমাটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছে। মিস স্কটকে শোনাতে পারলে গায়ের জ্বালা মিটত। কিন্তু মিস স্কট ঠিকানা দিয়ে যায়নি। এতবড়ো জগতে যাকে একদিন অকস্মাৎ পেয়েছিল আজ তাকে অকস্মাৎ হারিয়েছে। মিস স্কট যেন একটা স্বপ্ন।

'তাহলে বিদায়, মিস।'

'বিদায়। কিন্তু আসবেন, বুঝলেন? দেশে যাবার আগে একবার আসবেন।'

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'। সোম যখনি যেখানে গেছে সেখানে ভালোবেসেছে ভালোবাসিয়েছে। কতজনকে কথা দিয়েছে, 'হ্যাঁ, আসব বইকী, আবার একদিন আসব।' কিন্তু পারে না যেতে। ওটা শুধু কথার কথা। উভয় পক্ষের সাময়িক সন্তোষের জন্য।

সোম ট্রাম পেল না। রবিবার সকাল বেলা ট্রাম-চলাচল বন্ধ থাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র। পায়ে হেঁটে অলি-গলি ঘুরতে ঘুরতে একটা পার্কে গিয়ে পড়ল। সেখানে পলিটিক্যাল বক্তৃতা শুনল। তারপর নদী দেখতে গেল। ছোটো নদী। নাম Avon, কিন্তু শেকসপিয়রের Avon নয়।

পরিশেষে স্টেশনে পৌঁছোল।

কিনল কার্ডিফের টিকিট। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মিনিট পনেরো পরে ছাড়বে। সোম একটি জায়গা দখল করে হাতব্যাগটি রাখল। প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে থাকল। রবিবারের কাগজ বিক্রি হচ্ছিল। খান দুয়েক কিনল। মিস স্কটের জন্য তার মন-কেমন-করা কমে এসেছে, মন উন্মুখ হয়েছে Severn নদী দেখতে। Severn নদীর তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে সোম তার হিসাব করছে। Severn নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানটা নদীর বহুগুণ চওড়া।

সোমের কামরায় কারা কখন জায়গা নিয়েছে সোম লক্ষ করেনি। সোম ধেয়ানে Severn Tunnel-এর ছবি ও নয়নে রবিবাসরীয় পত্রিকার ছবি দেখছিল। ট্রেন ছাড়বার সংকেত শুনে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই কামরায় উঠে বসল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে Sunday Pictorial-এ নিবিষ্ট রইল।

হঠাৎ ভূত দেখলে কেমন বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। সোম প্রথমটা কাঠ হয়ে গেল। তার হৃদয়স্পন্দন বন্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্থগিত, দৃষ্টি পক্ষাহত। কয়েক মিনিট—কয়েক ঘণ্টা—কেটে গেলে পর লাফ দিয়ে দাঁড়াল। যেন স্প্রিংযুক্ত কলের পুতুল। সাহস হচ্ছিল না, তবু দুই হাত দিয়ে পেগিকে স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করল, 'মাফ করবেন আমাকে। আপনি কি পেগি স্কট? না আমার মতিভ্রম?'

কামরায় লোক ঠাসা। একটা কালো মানুষের কান্ড দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির। পেগি চট করে সোমের অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। পরম বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'হ্যালো! আপনি এখানে! আমার পাঁচ বছর পরে দেখতে পাওয়া বন্ধু মিস্টার সোম। এতক্ষণ চিনতে পারিনি বলে মাফ করবেন তো?'

এই বলে পেগি তাকে হিড়হিড় করে টেনে কামরার বাইরে করিডরে নিয়ে গেল। সোম তখনো অপ্রকৃতিস্থ। পাঁচ বছর আগে সে তো ভারতবর্ষে ছিল।

পেগি বলল, 'অন্যমনস্ক মানুষ ঢের দেখেছি, কিন্তু এমনটি এই প্রথম। ছি ছি এক গাড়ি মানুষের সামনে কী রঙ্গই করলেন?'

'কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি নে, মিস স্কট—'

'মাসিমাকে মিথ্যে বলে পালিয়ে এসেছি। বলেছি, কার্ডিফে আমার ইয়ংম্যানের সঙ্গে যাচ্ছিলুম, পথে পড়ল ব্রিস্টল, ভাবলুম আপন মাসিমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা হবে।' মাসিমা বললেন, 'তবে তোকে আটকাব না, পেগ। শেষকালে অভিশাপ দিবি। তোকে স্টেশনে দিয়ে আসব?' বললুম, 'ধন্যবাদ, মাসিমা। কিন্তু আজকালকার মেয়ের chaperon দরকার করে না। তাতে করে আমার ইয়ংম্যানকে অপদস্থ করা হয়। যার যা কাজ।' মাসিমা খুব হাসলেন। বললেন, 'তাকেও এখানে আনলি নে কেন, ছুঁড়ি! আমি তার কী জবাব দিই বলুন! আপনি কি আমার মুখ রেখেছেন। বললুম, ''তারও এখানে একটি পিসিমা আছে''।'

সোমের হাসি আর থামে না।

এদিকে Severn নদীর সুড়ঙ্গও আর আসে না। সোম সে-কথা ভুলে গেছিল। কিন্তু তার কামরায় যারা ছিল তারা ওই পথ দিয়ে সকাল সকাল বাড়ি পৌঁছোনোর জন্যে উৎকণ্ঠিত। ব্রিস্টল থেকে কার্ডিফে যাবার দুটো রেলরাস্তা। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে সংক্ষেপে, অন্যটা নদী যেখানে সংকীর্ণ সেইখান অবধি গিয়ে সেতুর উপর দিয়ে।

সোমরা যখন কামরায় ফিরে এল তখন তাদের আচরণ সম্বন্ধে কারুর মুখভাবে কোনো সন্দেহ বা কৌতূহল বা নিন্দা প্রকাশ পেল না, সকলে ভাবছে ট্রেনের আচরণের কথা। সে যে এমন করে দাগা দেবে কেউ প্রত্যাশা করেনি। তারা তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছে। সোম ও পেগি তর্কের আসরে ভিড়ে গেল। সুড়ঙ্গটা ফস্কে গেল বলে সোমের আফশোস সকলের আফশোসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। অন্যদের আফশোস তো এই যে অন্যেরা যথাসময়ে মধ্যাহ্নভোজন করতে পারে না। একটি মেয়ে প্রত্যেকের কাছে একবার করে দুঃখ জানাচ্ছিল এইরকম যে, সুড়ঙ্গের ওপারের স্টেশনে তাকে নেবার জন্যে একজন (অর্থাৎ তার ইয়ংম্যান) এসে নিরাশ হবে। আর এই যে ট্রেনটা এটাও ঘুরে ফিরে সেই স্টেশন দিয়ে কার্ডিফ যাবে। একেবারে ওদিক মাড়াবে না এমন নয়। কিন্তু অন্তত একটি ঘণ্টা দেরি করবে! কী জানি!

সোমের সঙ্গে এক টেকো বুড়োর গল্প চলছিল। বুড়ো, তার বুড়ি ও বন্ধুরা মিলে জ্যামেইকা বেড়াতে গেছিল। এই ফিরছে। সঙ্গে বিস্তর তোড়জোড়। ওরা শুধু হেঁটে বেড়ায়নি, সে তাদের গলফ খেলার বহুল উপকরণ দেখে অনুমান করা যায়।

এও তো ইন্ডিজ, সেও তো ইন্ডিয়া, তবে জ্যামাইকার সঙ্গে ভারতবর্ষের তফাত কী। টেকোর প্রশ্নটা হল এই ভাবের। সোম থতমত খেয়ে বলল, 'তাই তো।'

সোম ভেবে বলল, 'ভারতবর্ষে আম হয়।'

টেকো বাঁধানো দাঁত বের করে বলল, 'জ্যামাইকাতেও আম হয়। আমরা খেয়ে এসেছি, না ডরোথি!'

স্ত্রী বললেন, 'সঙ্গে করেও কিছু এনেছি।'

কার্ডিফে নেমে সোম ও পেগির প্রথম ভাবনা হল এই অবেলায় কোনো রেস্তোরাঁতে পেট ভরে খেতে পাওয়া যাবে কি যাবে না। কিন্তু পাওয়া গেল। স্টেশনের কাছেই রেস্তোরাঁ। ক্ষুধার পরিমাণ অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ স্থির করে ওয়েট্রেসকে বলল, 'জলদি করো।'

গল্প করবার মতো শক্তি দু-জনের কারুর ছিল না। দু-জনে দু-জনের কথা ভাবছিল। আর মুচকে মুচকে হাসছিল। কেই-বা ভেবেছিল আবার তারা এক সঙ্গে খেতে বসবে? পরস্পরের সান্নিধ্য পাবে? পরস্পরের সাক্ষাৎ পাবে? কেউ কারুর ঠিকানা জানত না। ধরো যদি বারোটার গাড়িতে সোম না আসত, আসত আগে কিংবা পরে, তবে পেগি কি কোনোদিন তার দিশে পেত? সম্ভবত কোনো ভারতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করত, 'মিস্টার সোমকে চেনেন?' কিন্তু ভারতীয় কি লণ্ডনে দশটি-বিশটি আছে? আর মিস্টার সোম যে দশ-বিশ জন নেই তারই বা কোন স্থিরতা? সোমের খ্রিস্টান নামটা পর্যন্ত পেগির জানা নেই। পেগি হয়তো বুদ্ধি খাটিয়ে টাইমস সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিত : Shome, Meet me at Piccadilly Circus on Saturday at 1-30—Peggy। কিন্তু সে বিজ্ঞাপন হয়তো সোমের চোখ এড়িয়ে যেত। আর পেগি যে টাইমস কাগজে বিজ্ঞাপন দিত এমন সম্ভাবনা অল্প। পেগির প্রিয় কাগজ ডেলি মিরার। ওখানা সোমের চোখে পড়ে না। তবু সোম হয়তো মাস খানেক ডেলি মিরার-এর প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপন অধ্যয়ন করত।

পরিতোষপূর্বক আহার সমাপন করে দু-জনে চলল কার্ডিফ দেখতে। পরিষ্কার তকতকে শহর। ব্রিস্টলের চাইতে সুখদৃশ্য।

সোম বলল, 'কই, কুৎসিত নয় তো?'

পেগি বলল, 'যেদিকটা গরিব লোকেরা থাকে সেদিকটা কুৎসিত। কিন্তু সেদিকটা আপনি দেখতে পাবেন না।'

এই বলে পেগি তাকে পেনার্থ নামক উপকণ্ঠে যাবার বাস-এ তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বসল।

পেনার্থ সমুদ্রের উপকূলে। তার অনতিদূরে বনানী। দিনটিও সেদিন ছিল রৌদ্রময়ী। সোম মুগ্ধ হয়ে গেল! বলল, 'আমার যদি দেদার টাকা থাকত আমি সমুদ্রের থেকে ত্রিশ হাত দূরে ওরই একটা হোটেলে সাত দিন থাকতুম। কিন্তু যা আছে তাতে দু-শো হাত দূরের একটা বোর্ডিং হাউসেও কুলোবে না। অতএব আমরা আজ রাত্রিটা পেনার্থে কাটালুম না, মিস স্কট।'

পেনার্থ ত্যাগ করতে তাদের পা সরছিল না। কার্ডিফে ফিরে এল। সেখানে পেগি বলল, 'ভালো কথা। মাসিমা বলছিল, ''তোর ইয়ং ম্যানকে বলিস পর্থকওল যেতে।' কার্ডিফ থেকে বেশি দূর নয়। ছোটো গ্রাম, কিন্তু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর''।'

সোম বলল, 'তাই চলুন। হয়তো অল্প খরচে সমুদ্রের ধারে বাসা পাব।'

পর্থকওল-এর বাস-এর অপেক্ষায় আছে এমন সময় চিরকুট পরা একটি রোগা মানুষ তাদের সামনে পাত পাতল। 'একটি পেনি দিন!'

পেগি বলল, 'ভাগ। নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। ভিক্ষা করিস কেন?'

'রাত্রে মাথা গুঁজবার আশ্রয় চাই যে।'

'খেটে খাস নে কেন?'

'হা হা হা। তার উপায় কি আপনারা রেখেছেন? কাজও দেবেন না, ভাতও দেবেন না, দিতে পারেন কেবল পুলিশে।'

সোম বলল, 'তুমি খনির কুলি?'

'আমি খনির কুলি!'

পেগি বলল, 'দেশের শত্রু!'

'কারা শত্রু তা বোঝা গেছে।'

সোম তাকে দু-জনের হয়ে দুটো পেনি দিয়ে বলল, 'তোমরা তো দেশের লোকের কাছ থেকে অনেক দান পাচ্ছ, তবু রাত্রে শোবার জায়গা পাও না?'

'পেলে ভিক্ষা করি সাধে?'

'কাগজে তো লিখছে—'

'কাগজওয়ালারা আমাদের শত্রু।'

পেগি বলল, 'যা, যা, বাজে বকিস নে। দেশসুদ্ধ তোদের শত্রু।'

'বিশ্বাস করছেন না। আমি অবিবাহিত বলে দানের অংশ আমাকে নামমাত্র দেয়।'

'তাই বল। কিন্তু সবাইকে শত্রু ঠাওরাসনে।'

লোকটা চলে গেলে সোম বলল, 'লোকটা কী তেজস্বী!'

পেগি বলল, 'আমার দেশের সবাই তেজস্বী। তাই আমাদের ঘরোয়া বিবাদ গেল না। দেখ, না ওরা বাড়াবাড়ি করে কী ক্ষতিটাই করাল। অবশ্য আমি খনির মালিকদেরও ক্ষমা করি নে। দু-পক্ষই দেশের শত্রুতা করেছে।'

পর্থকওল-এর বাস যখন এল তখন ছ-টা বেজে গেছে। অল্পক্ষণ পরে গোধূলির আলোটুকুও রইল না। অন্ধকারে বাস চলতে লাগল ছোটো ছোটো গ্রাম ছাড়িয়ে। পেগি ও সোম খুব কাছাকাছি বসেছিল হাতে হাত রেখে। তারা আজ উভয়ে উভয়ের জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছে, বিচ্ছেদের দুঃখ। বিচ্ছেদের পরে মিলিত হয়ে অনেক সুখও পেয়েছে। সুখ দুঃখের অতীত একটি সহজ প্রাপ্তির ভাব তাদের বিভোর করেছিল। তারা সঙ্গী ও সঙ্গিনী। এই সম্পর্কটি অন্য কোনো সম্পর্কের মতো ধরাবাঁধা নয়। পরস্পরের কাছে তাদের কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। প্রেমের মধ্যে দায় আছে—দেবার ও পাবার তাড়না। যারা ভালোবাসে তারা পরস্পরের অধীন। একেবারে ক্রীতদাস। বন্ধুতাও প্রেমধর্মী। সেও একপ্রকার বাঁধন। কিন্তু সাথিত্ব জিনিসটির মধ্যে মুক্তি আছে। ও যেন পদ্মপত্রের সঙ্গে বারিবিন্দুর সম্পর্ক। কিংবা তৃণের সঙ্গে শিশিরবিন্দুর।

কাল আমরা লণ্ডন ফিরব। সেখানে কেউ কারুর কথা ভুলেও ভাবব না, কেউ কারুর নাম মনেও আনব না। আমাদের নিজের নিজের কাজ আছে, দল আছে। আর লণ্ডন শহরটাও একটা গোলকধাঁধা। কে কোন পাড়ায় থাকে ছ-মাসে একবার খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। আমি গেলুম তোমাকে দেখতে Crouch End-এ, তুমি গেছ আর কাউকে দেখতে Golders Green-এ। ফোন করলুম, চিঠি লিখলুম তবু তুমি জরুরি কারণে বাড়ি থাকলে না।

সেই জন্যে লণ্ডনের বাইরে যে দু-টি মানুষ একত্র হওয়ামাত্র এক হয়, লণ্ডনে ফিরে এলেই তারা আবার সেই একাকী। পৌনে এক কোটি লোকের মাঝখানেও একাকী। প্রত্যেকের দল আছে, কিন্তু একাকী একাকিনীর দল। কেউ কারুর সাথি নয়। লণ্ডনে প্রেম হয়, বন্ধুতা হয়, কিন্তু সাথিত্ব হয় না।

অন্ধকার সন্ধ্যায় নির্জন প্রান্তর দিয়ে বাস ছুটেছে। পেগি ও সোম দু-টি দূর দেশের পাখির মতো আকাশের পথে পাশাপাশি ডানা চালাচ্ছে। কাল যখন সন্ধ্যা হবে তখন আজকের সন্ধ্যা জগতেও থাকবে না স্মরণেও থাকবে না। সোম হয়তো পেগির সাথিত্বের লোভে লণ্ডনে ফিরবে, কিংবা আরও পশ্চিমে যাবে—এক ধাক্কায় আয়ারল্যাণ্ডটাও কাভার করে আসবে। আবার যেন এত খরচ করে ওয়েলস দিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে না-যেতে হয়। ইকনমি বলে একটা কথা আছে তো।

বাস যখন পর্থকওলে থামল তখন আটটা বেজে গেছে।

পেগি ও সোমের সাথিত্বের ঘোর কাটল। বোধহয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল। হঠাৎ এত আলো দু-জনের চোখ ঝলসে দিল। দু-ঘণ্টা এক জায়গায় বসে তাদের পায়ে খিল ধরে গেছল। সোম পেগিকে ধরে নামাল।

পেগি বলল, 'রোজ রোজ ভালো লাগে না, মিস্টার সোম।'

'কী ভালো লাগে না, মিস স্কট?'

'যদি বলি আপনাকে ভালো লাগে না?'
'তবে বলব মিথ্যা বলছেন।'
'ইস! কী অহংকার!'
'কেন, আমি কি সুপুরুষ নই?'
'আলকাৎরার মতো কালো যে!'
'বলুন, ওথেলোর মতো।'
'ও মা, তা হলে যে আমার প্রাণটি যাবে!'
'আপনার প্রাণের উপর আমার লোভ নেই। আশ্বস্ত হতে পারেন।'
'তবে কীসের উপর?'
'এই ধরুন সাথিত্বের উপর। আপনি দু-বেলা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবেন। এইটুকুতে ওথেলো খুশি।'
'কী অসাধারণ দাবি! চাকরের কাছেও এমন দাবি করলে সে জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি পায়।'
'নিষ্কৃতির জন্যে আপনাকে অত কষ্টও করতে হয় না। ট্যাক্সি ডাকান, মাসির বাড়ি হাঁকান। চাকরও তো সাতদিনের নোটিশ না দিয়ে ভাগে না।'
'ভারি রাগ করেছেন, না?'
'রাগ করলে ঘরের ভাত বেশি করে খাব। আপনার তাতে লোকসান?'
'কী সাংঘাতিক লোক। ভেবেছিলুম আপনি সকাল বেলার ঘটনা ভুলেও গেছেন, ক্ষমাও করেছেন। কিন্তু মনে মনে এত!'
সোম বলল, 'যাক, কী বলছিলেন, বলুন। রোজ রোজ কী ভালো লাগে না?'
'না মশাই, আর বলব না যে আপনাকে ভালো লাগে না। চার দিনের ছুটিতে বেরিয়েছি, একটু আনন্দ পেতে আর দিতে। কাউকে যদি রাগিয়ে তুলি তবে তো আমার ছুটিটা মাটি।'
'কী করবেন বলুন। আপনাদের ভাষায় 'অভিমান' কথাটার প্রতিশব্দ নেই। তাই বোঝাতেও পারব না আমার হৃদয়ভাব। সম্ভবত ইংরেজদের হৃদয়ে অভিমান বলে কোনো ভাবই নেই। সেই জন্যে আপনারা অমন অবস্থায় 'cross' হন, 'hurt' হন, আর কিছু হন না।'
পেগি একটা দমকা হাসি হেসে প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিল। বলল, 'বলছিলুম রোজ রোজ রাতের বাসা খুঁজতে ভালো লাগে না, মিস্টার সোম।'
'তবে আর অ্যাডভেঞ্চার কী হল!'
'রোজ রোজ একই অ্যাডভেঞ্চার? ভালো লাগে না। আজ মাসির বাড়ি থাকলে পারতুম।'
'তবে আর দেরি করছেন কেন? মাসির বাড়ি ফিরে যান। দু-টোর আগে পৌঁছোতে পারবেন।'
ঘুরে-ফিরে আবার সেই প্রসঙ্গ। পেগি আরেকটা হাসি দিয়ে আবার তাকে উড়িয়ে দিল। তুলোর মতো উড়ে যায়, উড়ে আসে।
পেগি বলে, 'দিনান্তে একখানি নির্দিষ্ট বাসা, এক বাটি গরম সুপ, একটি নরম বিছানা। এর বেশি কাম্য কী থাকতে পারে মানুষের?'
'রাত জেগে নাচতে ভালো লাগে না?'
'না। মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি। নেচেছি সারাজীবন।'
'যেন কতকালের বুড়ি! বয়স তো উনিশ কী কুড়ি।'
'না, না, অত কম নয়, মশাই। ঠিক দুগ্ধপোষ্য নাবালিকা নই।'
সোম কৌতুকের স্বরে বলল, 'মাচিমার কাছে চোবো। শুলেন না কেন মাসিমার কাছে ছোট্ট একটি বিছানায়? সকাল থেকে 'tiny tot'টিকে মাসিমা ঠেলাগাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।'

ওরা বাসা খুঁজবার আগে একবার সমুদ্রতীরটি দেখে নিল। দীর্ঘ নয়। গুটি কয়েক হোটেল। বাকি সব বোর্ডিং হাউস। রবিবারের রাত্রি—দোকানপাট বন্ধ। সকলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কিংবা সিনেমায় গেছে। পর্যকওলের বাইরে থেকে অসংখ্য লোক এসেছে ছুটি কাটাতে।

পেগি ও সোম বোর্ডিং হাউসগুলিতে বেল টিপল। যেখানে যায় সেখানে ওই একই কথা। 'তিলধারণের স্থান নেই।'...'একটু আগেও একখানা ঘর ছিল'...'তিন দিন আগে থেকে প্রত্যেকটি ঘর বুক করা।' ...'ও পাড়ায় ঘর থাকতে পারে, একবার চেষ্টা করুন না?'

কোনো পাড়াতেই চেষ্টার ত্রুটি হল না! কিন্তু কোনোখানে এক রাত্রের আশ্রয় জুটল না। এদিকে ক্ষুধাও বেশ পেয়েছে। রেস্তোরাঁ খোলা থাকলে তারা আগে খেয়ে নিত, পরে বাসা খুঁজত।

'কী করা যায়, মিস স্কট?'

'কী করা যায়, মিস্টার সোম?'

'বিপদে একটা পরামর্শ দিতে পারেন না। কোনো কাজের নন।'

'কাজের মানুষ যে আমি নই, আপনি।'

'আসুন তবে একটা হোটেলে ঢুকে সাপার খাই, তারপর সে হোটেলে না পোষায় অন্য হোটেলে জায়গা খুঁজব।'

কিন্তু সাড়ে ন-টা বেজে গেছিল। কোনো হোটেলে খাবার পাওয়া গেল না। কোথাও সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কোথাও বাইরের লোককে খাবার ঘরে ঢুকতে দেয় না।

সোম বলল, 'তা যদি হয় আমরা ভিতরের লোক হতে রাজি আছি। হোটেলে জায়গা খালি আছে?'

'খালি! স্নানের ঘরগুলো খালি ছিল, শোবার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। জায়গা!'

সোম বলল, 'তবে আসুন, আমরা এদের সবচেয়ে যে বড়ো হোটেল সেই হোটেলে যাই। হয়তো জনপিছু এক পাউণ্ড চেয়ে বসবে, তবু তাই দেব। একটি রাত সমুদ্রের নিকটতম হব।'

পেগি বলল, 'রাজি।'

কিন্তু ও হরি! সেখানে আরও অনেক স্থানপ্রার্থী দাঁড়িয়ে। কেরানি মেয়েটি বলছে, 'এখনও ছত্রিশ জনকে জায়গা দিয়ে উঠতে পারা যায়নি। তাদের দাবি সর্বাগ্রে। নাম লিখে নিতে আমার আপত্তি নেই, বলুন আপনাদের নাম।' সোম ও পেগি নাম লেখাল।

সোম বলল, 'আমরা লণ্ডন থেকে এসে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি, মিস। একটি রাতের মতো জায়গা—'

'সর্বনাশ! আজ রাতের মতো জায়গা!'

'হ্যাঁ, তাই তো—'

'অনর্থক নাম লিখে নিলুম। আমি ভেবেছিলুম কালকের রাত্রের জন্যে স্থান প্রার্থনা করছেন। আজ আর কিছু না হোক এক-শো জনকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এই তো একটু আগে একদল লোক এ গ্রামে রাত কাটাবার জায়গা না পেয়ে ব্রিজেণ্ড চলে গেল। বোধ হয় ব্রিজেণ্ডের ট্রেন কিংবা বাসও আর পাবেন না।'

'তবে কি আমরা না খেয়ে না শুয়ে সারারাত পায়চারি করে বেড়াব?'

'একটি কাজ করুন। থানায় গিয়ে পুলিশকে ধরুন। ওরা যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে।'

সোম ও পেগি থানার সন্ধানে চলল। পা আর চলতে চায় না। শূন্য উদরের উপর রাগ করে অসহযোগ করছে।

থানা বলে চেনবার উপায় ছিল না। আধখানা বাড়ি। বাইরে একটা ল্যাম্পপোস্ট-বিহীন ল্যাম্প দেওয়ালের গায়ে। সোম একটা দুয়ারে বেল টিপে ও ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। অন্য দুয়ারটাতে সফল হল। এক ঊনবিংশ শতাব্দীর বুড়ি দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কাকে চান?'

'পুলিশকে।'

বুড়ির বিরক্তির কারণ ছিল। পুলিশের খোঁজে বুড়ির ঘুম চটিয়ে দেওয়া বোধ হয় এই প্রথম নয়। প্রতিবেশিনী হিসেবে পুলিশের পিন্ডি বুড়ির ঘাড়ে, এইটে বোধহয় পর্থকওলের প্রবাদ।

উষ্মার সঙ্গে বুড়ি বলল, 'এ দরজা নয়, ও দরজা।'

'আমরা গেছিলুম ওখানে। সাড়া পাইনি।'

'জঞ্জাল! বেলটাও ওদের বে-মেরামত। ধাক্কা দিলে ওরা ভাবে কেউ আমার বাড়ি ধাক্কা দিচ্ছে। আচ্ছা আমি ভিতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।'

পুলিশের লোক সোমকে ও পেগিকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা কী লিখে নেবার জন্যে একজন কাগজ-কলম নিয়ে বসল। ওঃ, এই ব্যাপার? আচ্ছা আমাদের কর্তাকে ডেকে আনছি।

ইন্সপেক্টার রসিক লোক। সোমকে দেখে বলল, 'কোন দেশের লোক? Wandering Jew?'

'ইন্ডিয়ান।'

'ঠিক, ইন্ডিয়ানদেরই মতো দেখতে। কিন্তু উনি? ওঁকে তো দেখতে ইন্ডিয়ানের মতো নয়?'

পেগি বলল, 'উনি রেড ইন্ডিয়ান। আর আমি হোয়াইট ইন্ডিয়ান।'

ইন্সপেক্টার এর উত্তরে কী একটা রসিকতা করতে যাচ্ছিল, সোম বলল, 'কাল করবেন। আমরা সাত ঘণ্টা খাইনি, এত হেঁটেছি যে দাঁড়াতে পারছি নে। হয় আমাদের এইখানে খেতে দিন, নয় কোথাও খাবার বন্দোবস্ত করে দিন আগে।'

ইন্সপেক্টার লজ্জিত হয়ে বলল, 'সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। ইন্ডিয়ার মানুষ পর্থকওলে এসেছেন, সুখী হয়ে না ফেরেন তো কী বলেছি! অমৃতের মতো হাওয়া এখানকার। সমুদ্রতীরে গেছিলেন?'

সোম বলল, 'ক-বার করে বলব? এইমাত্র আপনার কনস্টেবলকে পর্থকওলের নাড়ীনক্ষত্রের খবর দিয়েছি।'

ইন্সপেক্টার একজনকে ডেকে বলল, 'জন?'

'স্যার।'

তিনটে বোর্ডিং হাউসের নাম দিচ্ছি। আমার নাম করে জায়গা চাইবে। একটাতে না হয় আরেকটাতে। নামগুলো মনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

জন সোমকে ও পেগিকে নিয়ে সমুদ্র সন্নিকটবর্তী তিন তিনটে বাড়িতে গেল। কেউ বলে জায়গা হয়তো একজনের হবে, কিন্তু খাবার। কেউ বলে খাবার যৎসামান্য জোগাড় করা যায়, কিন্তু বিছানা!

জনের সঙ্গে ইতিমধ্যে সোমের আলাপ চলছিল। জন নাকি লণ্ডনে ট্রেনিং নিতে গেছিল। লণ্ডনকে তার ভালো লেগেছে। এখানে তার শরীর খুব ভালো থাকছে বটে, কিন্তু বড্ড খাটুনি। অনেকের সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে।

জন বলল, 'এসেছেন যখন পর্থকওলে স্যার, তখন আপনাদের ফিরে যেতে দেব না। আমার একজনের সঙ্গে জানাশোনা আছে। কিন্তু মাইল খানেক দূরে।'

পেগি সোমের বাহুতে ভর দিয়ে সক্লেশে হাঁটছিল। সোমেরও শরীর ভেঙে পড়ছিল। মাইল খানেক দূরে। সেখানে যদি না হয় তবে? হা ভগবান!

জন বলল, 'সেখানে জায়গা থাকবেই, স্যার। না থাকলেও তারা যেমন করে হোক দেবেই। তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির।'

পেগি কথা বলছিল না। মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সাহসও ছিল না গ্রাম্য কনস্টেবলের।

একটা কাফে। গ্রামের সীমান্তদেশে তার অবস্থিতি। কাফেওয়ালিরা নিদ্রার আয়োজন করছিল। অতিথি পেয়ে আহারের আয়োজনে লেগে গেল। জনকেও ছাড়ল না। জন যে তাদের ঘরের ছেলের মতো। পাশের ঘরে

তাকে নিয়ে একজন খেতে বসল। অপর জন পেগি ও সোমকে রুটি ও ডিম পরিবেশন করল। ফল তাদের কাফে সংলগ্ন দোকানে অপর্যাপ্ত ছিল। পরিশেষে কফি।

তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, বারোটা বাজে। ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছে। কাফেওয়ালিরা সোমকে ও পেগিকে নিয়ে সকলের উপরতলায় যে গ্যারেট সেই ঘরে ছেড়ে দিল।

পেগির তখন খেয়াল ছিল না যে ঘরটাতে দুটো বিছানা এবং ঘরটা সোমেরও। কাফেওয়ালি যখন মোমবাতিটা ম্যান্টলপিসের উপর রেখে দিয়ে গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল তখন পেগি বলল, 'আপনার ঘরে যাবেন না?'

সোমও সেই কথা ভাবছিল। কনস্টেবল কি দুটো ঘরের কথা বলেনি, না দুটো ঘর পাওয়া যায়নি? কাফেওয়ালিকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে সংকোচবোধ হচ্ছিল। কাফেওয়ালি হয়তো ধরে নিয়েছে যে এরা স্বামী-স্ত্রী। তা নইলে এমন একসঙ্গে বেড়ায়? চেহারা ও রং থেকে তো মনে হয় না যে ভাই বোন!'

সোম বলল, 'আমাকে তো আলাদা ঘর দেয়নি?'

পেগি ধপ করে একটা বিছানায় বসে পড়ে বলল, 'সর্বনাশ!' তার মুখে লজ্জা ভয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

সোম বলল, 'যাব নীচে নেমে? বলব আর একটা ঘর থাকে তো দিতে?'

'থাকলে ওরাই দিত। কেননা দুটো ঘর দিলে প্রায় ডবল লাভ করত।'

এই বলে পেগি দুই হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে কি কাঁদতে কি হাসতে লাগল তা সোম ঠাহর করতে পারল না। এমন সংকটে সে কখনো পড়েনি। তার জীবনে নারীঘটিত সংকট ঘটেছে অনেক। কখনো ট্রেনে কখনো সরাইতে কখনো তীর্থক্ষেত্রের ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু তরুণী নারীর সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিযাপন—তাও সম্ভোগের জন্যে নয়, যে জন্যে কলঙ্কভাগী হয়েও সুখ আছে!

ঢং ঢং করে বারোটা বাজল শুনে পেগির ধ্যান ভাঙল।

পেগি বলল, 'আপনি তো একজন man of honour—কেমন?'

সোম একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'নিশ্চয়।'

'তবে আবার ভয় কাকে? কাফেওয়ালি যা খুশি ভাবুক, যা মুখে আসে রটাক। আপনি তো অশ্রদ্ধা করবেন না, প্রচার করে বেড়াবেন না।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারেন, মিস স্কট। আপনি যে কে এবং কোথায় থাকেন কার কন্যা এবং কী করেন তাই এখনও জানলুম না।'

'হয়তো আমি পেগি স্কটই নই, এলিজাবেথ সিমসন। কিংবা জিনি জোনস।'

'ভগবান জানেন।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ। মাসিমার ওখানে আপনাকে না নিয়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচিয়েছি। না, না, অবিশ্বাস আপনাকে আমি করি নে, কিন্তু আপনিও তো পুরুষ। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য পুরুষেষু।'

পেগি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি একবার ঘরের বাইরে যান যদি তো কাপড় ছেড়ে নিই। দেরি হবে না।'

সোম অভিমান পরিপাক করতে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করল। তার একটুও অভিরুচি ছিল না পেগির সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে। এত ঢং কেন? ন্যাকামির বেহদ্দ! সকাল বেলা যাকে ইয়ংম্যান বলে প্রচার করেছে, যার জন্যে মাসিমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে এসেছে, যার হাতে হাত রেখে সমস্ত গ্রামটাকে সাত পাক দিয়েছে তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে এক ঘরে শুতে হচ্ছে বিভিন্ন বিছানায়। এই নিয়ে এত ফুটানি!

সোম যদি অন্য ঘর পেত নিশ্চয়ই পেগির ঘরে ফিরত না। পেগি সাধলেও না।

ভিতর থেকে পেগির ডাক এল। সোম রাগ করে দু-তিন মিনিট বাইরেই পায়চারি করতে থাকল, ভিতরে গেল না। তখন পেগি দরজা খুলে মুখ বের করে সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, 'মিস্টার সোম।'

সোম গাম্ভীর্যের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ইয়েস?'

‘আছেন তা হলে। আমি ভেবেছিলুম নীচে চলে গেছেন।’

‘নীচে চলে গেলে নিষ্কণ্টক হন?’

‘ছিঃ ছিঃ। দেখুন এসে, আপনার বিছানা কেমন নতুন করে পেতেছি।’

সোম চমৎকৃত হল।

পেগি বলল, ‘এবার আপনাকে প্রাইভেসি দিয়ে আমি চললুম বাইরে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না বলে যাচ্ছি। ক্লান্তিতে আমার পা দু-গাছা ভেঙে পড়ছে মিস্টার সোম।’

সোমের মনে ক্ষোভলেশ রইল না। সে পেগিকে ক্ষমা করল।

৪
আরও আগের দিন

সলসবেরির একটা অতি প্রাচীন হোটেলের অতি আধুনিক ধরনে সাজানো খাবার ঘরে ব্রেকফাস্ট পরিবেশিত হচ্ছিল। কোনো টেবিলই খালি নেই দেখে সোম অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসবে ভাবছে—একজন ওয়েটার এসে তাকে চাপা গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন স্যার।'

ওয়েটার তাকে যেখানে নিয়ে বসতে দিলে সেখানে সে কাল রাত্রে বসে ডিনার খেয়েছিল, সেই সূত্রে জায়গাটা তার হয়ে গেছে। এবং তার সম্মুখে আসনটা মিস স্কটের। মিস স্কট তার আগেই এসেছেন, তাঁর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল।

সোমকে দেখে মিস স্কট খাবার মুখে-থাকা অবস্থায় bow করলেন। সোমও bow করে কী কী খেতে চায় ওয়েটারকে ফরমাশ করল। ওয়েটার চলে গেল।

সোম বিনীতভাবে বলল, 'কাল আপনাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, মিস স্কট।'

'কী কারণে, মিস্টার সোম? এমন কী অপরাধ করেছি যার দরুন ধন্যবাদ আমার পাওনা?'—(কপট আতঙ্কের ভঙ্গিতে।)

'আপনি ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি কি ভুলতে পারি কাল আপনি যে উপকার করেছেন?'

'বটে?'—মিস স্কট মুচকি হেসে রুটির সঙ্গে মার্মালেড মাখাতে লাগলেন।

সোমেরও পরিজ এসে গেছিল। কিছুক্ষণ সোম নীরব রইল। মিস স্কটের খাদ্য শেষ হয়েছিল, পানীয় ঈষৎ বাকি ছিল। তিনি কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'ঘর পছন্দ হয়েছে?'

(খেতে খেতে) 'হুঁ।'

'তা হলে এইখানেই কিছুদিন থেকে যাবেন?'

'উঁহু।'

'উঁহু? তবে ঘর পছন্দ হয়নি?'

'হুঁ।'

'ছিঃ ছিঃ, আমি কী অভদ্র! আপনার খাওয়াতে বাধা দিচ্ছি।'

কথা বলবার সুযোগ পাবার জন্যে সোম এক নিঃশ্বাসে খাওয়া শেষ করল। প্লেট থেকে হাত তুলে নিয়ে ও হাত থেকে চামচ নামিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'না, না, না। বাধা আপনি দিতে যাবেন কেন? দিচ্ছিল ওই পরিজটা। ওকে পরাস্ত করে উদরালয়ে পাঠিয়েছি। এখন আমি শত্রুশূন্য।'

ঠিক এমনি সময়ে ওয়েটার আরেক শত্রুকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ করল নিজে সারথি হয়ে। মিস স্কট মুচকি হাসলেন। সোম অপদস্থের কাষ্ঠ হাসি।

নিজের খাওয়া শেষ হলেও মিস স্কট উঠে গেলেন না। সোমের খাতিরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সোম অনুযোগ জানিয়ে বলল, 'আমার মতো কুঁড়ে মানুষ কতক্ষণে উঠবে তার ঠিক নেই। মিথ্যে কেন একটা ঘণ্টা নষ্ট করবেন?'

মিস স্কট এর উত্তরে বললেন, 'যেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খাচ্ছেন এক ঘণ্টা বসে থাকলে আপনি কড়ি-বরগাও বাকি রাখবেন না। আমি পাহারায় বসলুম।'

'কিন্তু যে মানুষ কড়ি-বরগা খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে যায় সে সামনের মানুষকেও ছাড়বার পাত্র নয়। পাহারাওয়ালা, হুঁশিয়ার।'

মিস স্কট তাঁর নীল নয়নের কটাক্ষ হেনে বললেন, 'ক্যানিবালরাও নারীমাংস খায় না শুনেছি, ওরাও শিভ্যালরি বোঝে।'

সোম বলল, 'কিন্তু একালের নারী যে শিভ্যালরির অযোগ্যা। ট্রেনে ট্রামে বাসে নারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও পুরুষ জায়গা ছাড়ে না, খবরের কাগজের উপর চোখ ফিরিয়ে নেয়।' মিস স্কটের আরক্ত মুখ লক্ষ

করে ‘বরঞ্চ বলতে পারা যায় নারীরা শিভ্যালরি দেখায় পুরুষদের জন্যে ট্রেনের দরজা খোলা রেখে, হোটেলে জায়গা জোগাড় করে দিয়ে।’

মিস স্কট বললেন, ‘নিন, ওটুকু খেয়ে নিন। তাড়াতাড়ির কোনো দরকার নেই। আমি পালাব না।’ (তাঁর মুখভাবে প্রসন্ন মমতা।)

দু-জনে লাউঞ্জে গিয়ে বসল। ঘরটার অস্থিকঙ্কাল পুরোনো কোন যুগের। রক্তমাংস আধুনিক। আরও অনেকে জটলা করছিলেন, কিংবা চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছিলেন, কিংবা চশমা চোখে দিয়ে পঞ্চাশবার সেলাই করা অকেজো মোজাকে অন্যমনস্ক হয়ে রিফু করছিলেন।

সোম সিগারেট কেসটা মিস স্কটের সামনে ধরে নীরব অনুরোধ জানাল। মিস স্কট মৃদু হেসে একটি নিলেন। বললেন, ‘আগেকার যুগে পুরুষরা স্মোক করবার আগে নারীদের অনুমতি ভিক্ষা করতেন। এখন নারীদের ঘুষ দেন।’

‘যাই বলুন, ঘুষ খেতে মিষ্টি লাগে।’

‘খাওয়াতেও।’

‘সকলকে না। তেমন তেমন নারীকে।’

‘খাওয়াবেন তো একটা আধ পেনি দামের সিগারেট। তাও তেমন তেমন নারীকে? আমি হলে charwoman-কে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট এবং এক বাক্স দেশলাই উপহার দিতুম।’

সোম কপট ধিক্কার দিয়ে বলল, ‘মিস স্কট! Charwoman কাকে বলছেন? Charlady। সেও আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দেবার স্পর্দ্ধা রাখে।’

‘ও হো হো। ভুল হয়ে গেছিল। Charlady! শুনবেন একটা গল্প? এক ভদ্রমহিলার বাড়ি এক washer-woman কাপড় নিতে গেছে। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'Maid! maid! house assistant. Is that woman at home? It is the washer-lady calling!'

সোম হাসতে লাগল। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, ‘এ গল্পটা শুনে আরেকটা গল্প মনে পড়ল। বিশ্ববিখ্যাত নর্তকী পাভলোভা নিউ ইয়র্কের কোনো হোটেলে উঠেছেন, খাবার ঘরে খেতে বসেছেন। তাঁর একটু দূরে তাঁর অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টার—কী নাম? মনে পড়ছে না, ধরে নিন Stier—ওয়েটারের জন্যে অপেক্ষা করছেন, ওয়েটার আসেই না। বেশ একটু দেরি করে সেজেগুজে এল, এসে বলল, ‘হ্যালো, ম্যান, কী দিতে হবে তোমাকে?’ Stier লোকটা অস্ট্রিয়ান, ইউরোপের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত দেশের লোক। অবশ্য এখন অস্ট্রিয়া সোশ্যালিস্ট হয়েছে। তখন অস্ট্রিয়ার সম্রাটরা ইউরোপের অভিজাততম।’

মিস স্কট বাধা দিয়ে বললেন, ‘আমাদের রাজাদের চেয়ে!—’

সোম অপ্রতিভ হয়ে বলল, ‘আহা, এমন করে বাধা দিলে গল্প এগোবে কেন?’

মিস স্কট আবার বাধা দিয়ে বললেন, ‘আর এগিয়ে কাজ নেই। অত লম্বা গল্প কে শুনতে চায়?’

গল্পটা সোমের পেটে গজগজ করছিল। মিস স্কটকে শোনাবেই। পুনরায় আরম্ভ করল, ‘তা, Stier তো হতভম্ব। কোথায় তাঁকে ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করবে ও বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—’

মিস স্কট বললেন, ‘আপনি আজ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন?’

‘আপনাকে তো আমি কথা দিইনি অমুক সময় আপনার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব?’

‘তা হলে Stier-কেও সেই ওয়েটার কথা দেয়নি যে অমুক সময়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াবে।’

‘আহা, অমন করলে গল্পটা মাঠে মারা যাবে, মিস স্কট। শুনুন শেষ পর্যন্ত। মজার কথা আছে শেষের দিকে।’

মিস স্কট চোখ বুজে হাত-পা অসাড় করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। যেন প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

সোম বলল, ‘আমি কি আপনার উপর অপারেশন করতে চাইছি?’

‘আমার তন্ময় ভাব নষ্ট করবেন না, মিস্টার সোম। গল্পটা একদৌড়ে বলে যান।’

ওয়েটার তার কার্ডখানা Stier-এর হাতে দিয়ে বলল, 'আমার নাম জেরেমায়া ওয়াশিংটন স্মিথ। যখন আমাকে দরকার হবে তখন কারুর হাতে এই কার্ডটা পাঠিয়ে দিলে আবার আমি আসব'।'

মিস স্কট সকৌতূহলে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি?'

'সত্যি। কিন্তু কার্ডের উপরকার নামটা আমার ঠিক মনে নেই। বানিয়ে বললুম।'

মিস স্কট আবার চোখ বুঁজলেন।

'যাবার সময় ওয়েটার বাবাজি পাভলোভার দিকে আঙুল উঠিয়ে বলল, 'ওই womanটাকে এতগুলো মানুষ ঘিরে বসেছে। Womanটা কেউ হবে টবে?'

মিস স্কট লাফ দিয়ে উঠে বসলেন।

সোম বলল, 'Stier নিজের অপমান সইতে পারেন, কিন্তু মনিবের অপমান। বিশেষত তিনি যখন মহিলা, রানির মতো সম্মানে অভ্যস্তা! তারপর—'

মিস স্কট এবার দাঁড়িয়ে বললেন, 'তারপর যা হল তা কাল শুনব, মিস্টার সোম। আপনি তো এখানে কাল পর্যন্ত থাকছেন।'

সোম চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'কে বলল, মিস স্কট? আমি আজকেই ব্রিস্টল যাচ্ছি।'

'ওমা, তখন যে বললেন থাকছেন।'

'বলেই যদি থাকি, তাই শেষ কথা নয়। এখানে আমার ভালো লাগছে না। বড়ো বেশি মানুষ এ বাড়িতে।'

'ইস্টারের মলয় কোনখানেই বা কম?'

'তবু ব্রিস্টল আমি যাব। ওখানে আমার দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের সমাধি আছে।'

'তিন দিন পরে গেলেও তো থাকবে।'

'তিন দিন কার খাতিরে এখানে কাটাব? আপনার?'

'বেশ! আমার। আমার কি একটা কৃতজ্ঞতার দাবি নেই ভাবছেন?'

সোম পুলকিত হল।

মিস স্কট সোমের পুলক অনুমান করে কথাটা ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গিনীর ঘরটা সঙ্গিনীর অনুপস্থিতি হেতু আপনি পেয়েছেন। আপনি ছেড়ে দিলে ভাড়াটা আমার সঙ্গিনীর ঘাড়ে পড়বে। কাজেই আমার স্বার্থ হচ্ছে আপনাকে আটকানো।'

'এতই সঙ্গিনীর প্রতি দরদ?'

'দরদটা কি অস্বাভাবিক?'

'তবু সর্বদা দরদ সঙ্গিনীটির পাওনা নয়। তিনি অনুপস্থিত যখন হয়েছেন জেনেশুনে, ভাড়াও দিতে প্রস্তুত আছেন। আর আমি বেচারা এক রাত্রি তাঁর স্থানে officiate করেছি বলে আর তিন রাত্রি করতে বাধ্য হব?'

'সে কি আপনার কম সৌভাগ্য?'

'তবে সৌভাগ্যটাকে আরও অপ্রত্যাশিত করুন। আসুন আমার সঙ্গিনী হয়ে ব্রিস্টলে।'

'ব্রিস্টলে আমার এক মাসিমা থাকেন। সে-কথা জানা আছে মশাইয়ের?'

'মাসিমা তো বাঘ ভাল্লুক নয়।'

'সেই-জাতীয়। ছুটিটা মাটি করতে চাই নে, মিস্টার সোম।'

মিস স্কট চলে যাচ্ছিলেন! সোম বলল, 'মাসিমার বাড়ি ফাঁসি যেতে কে আপনাকে বলছে মিস স্কট? ছোটোখাটো হোটেল কি ব্রিস্টলে নেই?'

মিস স্কট উত্যক্ত হয়ে বললেন, 'পারব না আপনার সঙ্গে তর্ক করে। ব্রিস্টলের ট্রেন ওবেলা ধরলেও চলবে। আমার সঙ্গে বেরোবেন দয়া করে, না, এই ঘরে বসে সবাইকে নিউ ইয়র্কের গল্প শোনাবেন? বাড়ি কোথায় আপনার? নিউ ইয়র্কে?'

'ইন্ডিয়ায়।'

‘তা হলে নিগার নন?’

‘নিগার না হই, নিগারের মতো রঙিন। দেখে ঘৃণা হয়?’

‘কখনো না, বরঞ্চ শ্রদ্ধা হয়।’

‘হবেই তো। সূর্যদেব কত যত্নে আমার দেহের চামড়া ট্যান করেছেন, আমি যেন মূর্তিমান সূর্যালোক। লোকে আমাদের বুদ্ধি-বিদ্যার নিন্দা যত খুশি করুক, সভ্যতার অভাব দেখাক, কিন্তু চামড়ার অগৌরব রটায় কেন বলুন তো?’

মিস স্কট হেসে বললেন, ‘লোকগুলো হিংসুটে। আপনাদের বর্ণাঢ্যতা দেখে ওদের গাত্রদাহ হয়।’

‘লাঙুলহীন শৃগাল। নিজেরা শীত বরফের দেশে বাস করে বর্ণসম্পদ খুইয়েছেন। যাদের আছে তাদের বলেন কি না রঙিন মানুষ। গৌরবের কথা নয়, যেন কত বড়ো একটা তামাসার কথা।’

দু-জনেই হাসতে লাগল। সোম জানত কালো রঙের প্রতি মেয়ের সহজ পক্ষপাত। কিন্তু সমাজের চাপে এই পক্ষপাত বিরূপভাবে পরিণত হয়ে থাকে। মিস স্কটের সহজ পক্ষপাতকে পাছে সলসবেরির এই হোটেলের গণ্যমান্যদের সমাজ বিকৃত করে দেয়, পাছে মিস স্কট তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে গিয়ে চোখে চোখে উপহসিত হন, সেই জন্যে সোম তাঁকে নিয়ে ব্রিস্টলের মতো বৃহৎ শহরের জনতায় অলক্ষিতভাবে ফিরতে ও নির্জন বোর্ডিং হাউসে অনিন্দিতভাবে থাকতে চায়।

সলসবেরির ক্যাথিড্রাল কুতবমিনারের সমসাময়িক। ইংল্যাণ্ডের বৃহত্তম ক্যাথিড্রালদের অন্যতম। তার nave, তার choir, তার aisles ইত্যাদি পরিদর্শন করবার সময় মিস স্কটের উচ্ছ্বাস উদ্দাম হয়ে ওঠে—তাঁর স্বদেশের কীর্তি! কালের শাসনকে তুচ্ছ করে এসেছে সাত শত বছর!

সোমও নীরব হয়ে ভাবে। ইংল্যাণ্ড দেশটা ভারতবর্ষকে পেয়ে হঠাৎ বড়ো মানুষ হয়নি। তিন-শো বছর আগে তার শেকসপিয়র ছিল, সাত-শো বছর আগে তার সলসবেরি ও লিংকন ক্যাথিড্রাল ছিল। ভারতবর্ষকে পাবার আগে সে পাবার যোগ্য হয়েছে।

সোম কাব্য করে বলল, ‘মিস স্কট, সলসবেরির নির্মাতারা যে সময় ক্যাথিড্রালের ভিত্তিপাত করছিল নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই সময় সাম্রাজ্যেরও ভিত্তিপাত করছিল। যারা ক্যাথিড্রাল গড়তে শুরু করে তারা সাম্রাজ্য না গড়ে শেষ করে না।’

কথাটা বলে ফেলেই সোম মনে মনে ভ্রম স্বীকার করল। ক্যাথিড্রাল বেলজিয়মও গড়েছে, কই তার সাম্রাজ্য?

মিস স্কট বললেন, ‘এক-শোবার। আমাদের সাম্রাজ্য কি একদিনের সৃষ্টি! এইসব নাম-না-জানা স্থপতি তার পরিকল্পনা আমাদের জাতীয় মনের মধ্যে রোপণ করেছিল, সন্দেহ নেই। বৃহৎ কীর্তির অভিলাষ আমরা চিরকাল মনে রেখে এসেছি, মিস্টার সোম।’

মিস স্কটকে ব্যথা দেবার ইচ্ছা ছিল না সোমের। নতুবা জ্ঞাপন করত যে বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, হিন্দু যুগের মন্দির ও মুসলমান যুগের মসজিদ ভারতবর্ষের অলিতে গলিতে আছে, এবং তাদের মধ্যে অন্তত হাজারটা সলসবেরির ক্যাথিড্রালকে আকারে ও সৌন্দর্যে লজ্জা দিতে পারে। সোমকে মুগ্ধ করছিল ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি। ভারতবর্ষের লোক দিল্লির মসজিদে দাঁড়িয়ে সম্প্রদায়কে স্মরণ করে, কালিদাস বাঙালি কিনা তারই গবেষণায় জীবন ক্ষয় করে। ছোটো ভাবনা ভাবতে ভাবতে মানুষগুলো খর্বকায় বামন হয়ে কুঁড়ে ঘরে বাসা বেঁধেছে। কীর্তিও হয়েছে সেই অনুপাতে ক্ষীণ।

সোম বলল, ‘আসুন মিস স্কট, বেশিক্ষণ দেখলে শুনলে ক্যাথিড্রালের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাবেন। তাহলে পুরুষ জাতটা ঈর্ষায় বুক ফেটে মরবে।’

‘গোটা পুরুষ জাতটা?’

‘গোটা পুরুষ জাতটার প্রতিনিধি হিসেবে কোনো একজন পুরুষ।’

‘বটে?’

‘বটে!’

‘ক্যাথিড্রালের উপর প্রেমিকের ঈর্ষা, এমন অদ্ভুত কথা জন্মে শুনিনি। (কলহাস্য)। আপনি শুধু প্রেম করে বেড়ান, না কাব্যও করে থাকেন?’

(Bow করে) ‘না, ম্যাডাম। আমি অতটা শৌখিন নই। কাজের মানুষ বলে আমার সুখ্যাতি আছে।’

‘আমিও তো কাজের মানুষ। কই আমার তো ওসব আসে না?’

‘কীসব আসে না?’

(সরলতার ভান করে) ‘ওই সব। প্রেম করা। কাব্য করা। ক্যাথিড্রালকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চাওয়া।’

‘আপনি এতই নিরীহ মানুষটি? দেখি, দেখি একবার আপনার মুখখানা? হ্যাঁ, ছেলেমানুষের মুখ বটে।’

‘যান। ছেলেমানুষ বললে আমরা অপমান বোধ করি, জানেন?’

‘আপনারা কারা?’

‘আমরা একেলে মেয়েরা।’

‘তবে কি বুড়োমানুষ বলব?’

‘বুড়োমানুষ বললে খুন করব বলে রাখছি।’

‘তবে—?’

‘বলবেন 'Bright young thing.'

‘তা আপনাকে বলতে রাজি আছি, বললে মিথ্যে বলা হয় না। কিন্তু সবাইকে—!’

‘আপনি দেখছি মিষ্টি কথার ময়রা। চকোলেটের বদলে আপনার compliment খেলেও চলে। আশা করি সবাইকে খাইয়ে থাকেন?’

‘আমি একনিষ্ঠ ময়রা।’

‘আমাকে ছেড়ে ক-জনের কাছে একথা বলেছেন?’

‘মিথ্যা বলব, না, সত্য বলব?’

‘আগে মিথ্যাটা শুনি।’

‘কারুর কাছে না।’

‘এবার সত্যটা।’

‘জন পাঁচেকের কাছে।’

‘আমি তা হলে আপনার ষষ্ঠ?’

‘এবং শ্রেষ্ঠ।’

‘প্রত্যেকবারেই সেটা মনে হয়ে থাকে বটে।’

‘আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন?’

‘যান!’

‘তবে কি এই আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা?’

‘ভারি দুষ্টু তো! নিজের মনের কথা বেফাঁস করে ফেলেছেন। তা বলে আমার মনের কথা কাড়তে পাচ্ছেন না। বুঝলেন?’

‘অনুমান করতে কতক্ষণ?’

‘করুন না অনুমান?’

‘এই করলুম। আমার ছয়, আপনার ছয় ছক ছত্রিশ।’

(উল্লাস গোপন করে) ‘আমি কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় করছি। একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে—বিদেশির সঙ্গে—ইয়ার্কি দিচ্ছি। মা যদি জানতে পান ভয়ানক ঠাট্টা করবেন।’

'আজকালকার মায়েরা রাগ করেন না বুঝি?'
'রাগ করবেন। কেন, আমি কি তাঁর খাই না ধারি? আমি তাঁর কোনো ক্ষতি করছি নে। আমার যথেষ্ট বয়সও হয়েছে।'
'কত বয়স? আঠারো?'
'ভারি বেয়াদব তো? মেয়েমানুষের বয়স জানতে চায়!'
'Sorry, আমার প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'—অভিনয়ের ভঙ্গিতে সোম আবার bow করল।
ততক্ষণে তারা ক্যাথিড্রালের বাইরে এসেছে। বাইরে থেকে ক্যাথিড্রালটিকে কেমন দেখায় দু-জন মিলে তাই দেখতে লাগল। দু-জনের কারুর কাছেই ক্যামেরা ছিল না বলে তারা পরস্পরকে দুষতে লাগল। সোম বলল, 'প্রেমিকের ছবি তুলে নিয়ে গেলেন না। বাড়ি ফিরে টেবিলের উপর কী সাজিয়ে রাখবেন?'
মিস স্কট বললেন, 'আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনারই কর্তব্য ছবি তুলে নিয়ে আয়নার কাছে রাখা এবং তুলনা করে দেখা কে কার চেয়ে সুন্দর।'
'আমি যে ওর চেয়ে সুন্দর এ সম্বন্ধে আমার তো কোনো সন্দেহ নেই। আপনার যদি থাকে আপনার উচিত একসঙ্গে ওর আর আমার ছবি তোলা।'
'বাস্তবিক ছবির পক্ষে আইডিয়াল ব্যাকগ্রাউণ্ড! কে জানত আপনি আসবেন ক্যাথরিনের জায়গায়; ক্যাথরিন হতভাগী শেষকালে প্ল্যান বদলে বসল।'
'তাঁকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তিনি থাকলে আমার কি কোনো আশা থাকত!'—সোম মিস স্কটের দু-টি চোখের সঙ্গে দু-টি চোখ মেলাল।
মিস স্কট চোখ নামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, বলুন দেখি মেয়েরা মেয়েদের এমন করে অপমান করে কেন? ক্যাথরিন কথা দিল আমার সঙ্গে ছুটিটা কাটাবে, দু-জনে কিছু আগাম দিয়ে হোটেলে ঘর বুক করে রাখলুম। পোড়ারমুখী আমাকে আর মুখ দেখায়নি—দেখালে দুই চড় মারতুম—ফোন করে জানিয়েছে আরেকজনের সঙ্গে ব্ল্যাকপুল যাওয়া তার অতি অবশ্য দরকার। (ক্যাথরিনের স্বর অনুকরণ করে) অতি অবশ্য দরকার!'
সোম বলল, 'ক্যাথরিনকে আমি দোষ দিই নে। ধরুন, ক্যাথরিন যদি আপনার ডান হাত ধরে টানে আর আমি টানি আপনার বাঁ-হাত ধরে, তবে আপনিই বলুন না আপনি কার সঙ্গে যাবেন?'
'ক্যাথরিনের সঙ্গে।'
'সত্যি?'
'না, ক্যাথরিনের সঙ্গে আমার জন্মের মতো আড়ি। ওর সঙ্গে যাব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে যাব একথা ভাবলেন কীসে?'
'আমি অন্তর্যামী।'
'কী অহংকার!'
'অহংকার নয়, ম্যাডাম! নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। জানেন আমি একজন Self-made man?'
'আমিও তো self-made.'
'তবে তো আমাকে আপনার ভুল বোঝবার কথা নয়, মিস স্কট।'
'আমি আপনার জীবনের কী জানি বলুন। ওই ক্যাথিড্রালটার সম্বন্ধে যা জানি তার চেয়ে ঢের কম।'
'তা হলে ক্যাথিড্রালেরই জিত?'
'না। ক্যাথিড্রালটা self-made নয়। Self-made man-এর উপর আমার পক্ষপাত আছে।'
'আর আমার পক্ষপাত সুন্দরী নারীর উপর।' (চোখে চোখ মিলিয়ে)
'তা হলে আমার বাঁ-হাত ধরে কেন অকারণে টানবেন?'
'আপনার 'ভ্যানিটি' ব্যাগে যদি আয়না না থাকে তবে আমার চোখে আপনার মুখের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পারেন। নিজের রূপ সম্বন্ধে সংশয় টিকবে না।'

'আপনার ওটা মুখ নয় তো, ময়রার দোকান।'
'ময়রার দোকানে মুখ দেবার নিমন্ত্রণ রইল। যখন আপনার সুবিধে হবে তখন।' (মুখ টিপে টিপে হাসা)।
'যান। আমার সুবিধে কোনোদিন হবে না।'
'তা হলে দোকানদার তার মাল আপনার দ্বারে পৌঁছে দিতে পারবে।'
'পেরে কাজ নেই। মিষ্টি জিনিস প্রায়ই অন্তঃসারশূন্য হয়ে থাকে।'
'Proof of the pudding is in the eating. একবার পরখ করে দেখুন না?'
'দেখে কাজ নেই, মশাই। ধন্যবাদ।'
'আচ্ছা, দেখা যাবে ক-দিন আমার দাবি এড়াতে পারবেন!'
'ক-দিন কী, মশাই! আজকেই না আপনি ব্রিস্টল যাচ্ছেন?'
'নিশ্চয়। কিন্তু একা যাচ্ছি নে।'
'জবরদস্ত মানুষ তো! জোর করে টেনে নিয়ে যাবেন নাকি?'
'বাঁ-হাতখানি বগলে পুরে।'—সোম মিস স্কটের বাঁ-হাতখানি তুলে নিয়ে বগলে পুরল। মিস স্কট বাধা দিলেন না।

ব্রিস্টল যাত্রী ট্রেনে দু-জনে মুখোমুখি বসেছিল। মিস স্কট বলছিলেন, 'এত দূর এসে ব্রিস্টলে না গেলে মাসিমা মন খারাপ করতেন। সেই জন্যেই যাওয়া।'
সোম বলছিল, 'মাসিমা মহারানি কী জয়! আমার জোরের সঙ্গে তাঁর জোর না মিলে থাকলে আমি কি সলসবেরির ক্যাথিড্রালের সঙ্গে পেরে উঠতুম!'
'বহুকাল তাঁকে দেখিনি। বড়ো মন কেমন করছিল।'
'তাঁকে পেয়ে যেন সেই মানুষটিকে ভুলে যাবেন না যে তাঁর পান্ডার কাজ করেছে।'
'পান্ডার কাজ করেছে গুণ্ডার মতো জবরদস্তি করে!'
'বলবেন সে-কথা মাসিমাকে। হয় তো কিছু বখশিশ মিলে যেতে পারে।'
'বখশিশ না কানমলা। মাসিমার হাতের কানমলা খাননি কখনো, না?'
'নাঃ। আমার মাসিমা ছিলেন অত্যন্ত লক্ষ্মী। তাঁর হাতের সন্দেশ মোরব্বা ও ক্ষীরপুলি খাওয়া আজও মনে আছে।'
'আপনার বাড়ির কথা জানতে ইচ্ছে করে। সেই মাসিমা এখনও আছেন?'
সোমের মুখের উপর শোকের ছায়া পড়ল। মিস স্কট বললেন, 'মা আছেন নিশ্চয়ই?'
সোম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।
মিস স্কট সমবেদনায় নির্বাক হয়ে পা দিয়ে সোমের পা স্পর্শ করলেন। পায়ে পায়ে বাণী বিনিময় চলতে লাগল।
কিন্তু কখন একসময় দেখা গেল পায়ে পায়ে লুকোচুরির খেলা চলেছে। দু-জনেরই দৃষ্টি বাতায়নের বাইরে চাষের জমির উপর, চাষার বাড়ির উপর, বার্চ বিচ এলম ওক পাইন গাছের উপর। কিন্তু দু-জনেরই মুখে ও চোখে দুষ্টু হাসি। যেন নিজেদের পাগুলোর জন্যে নিজেরা দায়ী নয়।
গাড়িতে এত লোক ছিল যে সকলে সকলের সঙ্গে গল্প করতে ও ছেলেপুলে সামলাতে ব্যস্ত। দু-টি মানুষ অন্যমনস্কভাবে বাতায়নের বাইরে চেয়ে আছে এই পর্যন্ত তারা দেখল। দু-টি মানুষের অতি মন্থর চরণলীলা তাদের চক্ষু এড়িয়ে গেল।
ব্রিস্টলে যখন গাড়ি দাঁড়াল সোম বুদ্ধি করে মিস স্কটের সুটকেসটার ভার নিল। মিস স্কট ভাবলেন নিছক ভদ্রতা। তিনি ভদ্রতা করে সোমের হাতব্যাগটির ভার নিলেন। সোমের আপত্তিতে কান দিলেন না।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে মিস স্কট বললেন, 'মাসিমার ঠিকানাটা আপনাকে দিই! কাল সকালে একবার দেখা করলে খুশি হব, মিস্টার সোম।' এই বলে তিনি একটা ট্যাক্সিকে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

সোম বলল, 'আমার হাতব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আপনার সুটকেসটি ফিরে পাচ্ছেন না।'

'সে কী মিস্টার সোম! দিনেদুপুরে ডাকাতি?'

'শুধু ডাকাতি করেই ক্ষান্ত হলুম। Abduction-এরও ইচ্ছে ছিল, মিস স্কট।'

'কী ভয়ানক মানুষ! এখন ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি কী বলে ফিরিয়ে দেব?'

'ফিরিয়ে দেবেন কেন? উঠে বসুন। আমিও উঠছি। এই শোনো তো? একটা ছোটো বোর্ডিং হাউসে নিয়ে যেতে পার? আমরা বিদেশি। পার? ধন্যবাদ। বখশিশ পাবে।'

ট্যাক্সিওয়ালা তার বন্ধুদের শুধোল। পুলিশের কনস্টেবল-এর কাছে পরামর্শ চাইল। তারপরে অনতিদূরস্থিত একটি বোর্ডিং হাউসে দু-জনকে পৌঁছে দিয়ে নিজেই এগিয়ে গেল মালিককে ডাকতে।

বোর্ডিং হাউসটি খুব ছোটো নয়। আসলে বোর্ডিং হাউসই নয়। একটা রেসিডেনশিয়াল হোটেল। তার দু-টি ঘরে দু-জনে জায়গা পেল। ইস্টারের মরসুম। তাই ঘর দু-টি কিছু দামি। সস্তা ঘরগুলো খালি নেই।

সোম মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হল। মিস স্কট বিনা ব্যয়ে তাঁর মাসিমার বাড়ি থাকতেন। তাঁকে অপহরণ করে এনে এতটা ব্যয় করানো সোমের উচিত হয়নি।

আহারাদির পর সোম কথাটা পাড়ল। বলল, 'মিস স্কট, আমার প্রতি যদি আপনার কিছুমাত্র প্রীতি থাকে তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার এখানকার খরচটা বহন করি।'

এর উত্তরে মিস স্কট এমন একটা কথা বললেন যা সোমের মাথা ঘুরিয়ে দিল। বললেন, 'মিস্টার সোম, আমি রাস্তার ছুঁড়ি নই, আমাকে কেনা যায় না।'

তারপরে সোম একটিও কথা কইল না। উঠে বিদায় না নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। ভাবল, মেলামেশার একটা সীমা আছে। সেই সীমাটা যে ঠিক কোনখানে কিছুতেই সেটা আমার মালুম হয় না। সেইজন্যে যার সঙ্গে বেশি মিশতে গেছি তার কাছে গলাধাক্কা খেয়েছি। তবু আমার চেতনা হল না।

সোম তার নিজের দুই হাতে নিজের দুই কান মলল, বালিশের উপর নাক ঘষল।

আজকেই সকাল বেলা সে ক্যাথিড্রাল দেখবার সময় মনকে বলছিল, আমার মতো সাকসেসফুল ছেলে ক-জন আছে? জীবনে যখন যে পরীক্ষা দিয়েছি তখন তাতে ফার্স্ট হয়েছি। যখন যে মেয়েকে চেয়েছি তখন তাকে পেয়েছি। এই যে পেগি স্কট মেয়েটি একেও তো প্রায় পেয়েছি বললে হয়। দেখো একে ব্রিস্টলে নিয়ে যাই কি না।

তারপরে সত্যিই যখন ব্রিস্টলের গাড়িতে পেগি স্কটকে তুলল তখন মনকে বলল, দেখলে তো, মিস্টার মন? যা মুখে বলি তা কাজে করি কি না? পেগি স্কটকে তার মাসির বাড়ি যদি যেতে দিয়েছি তবে আমার নাম কল্যাণকুমার সোম নয়।

সোম নিজের ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান হয়ে নিজেকে গালাগালি দিল। মনকে বলল, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? মন বলল, পাচ্ছি। সোম বলল, দেখো, আমার অনুতাপ হচ্ছে। নিজেকে আমি অতিশয় ধূর্ত মনে করেছিলুম! সেটা খারাপ। মন বলল, একটু কাঁদো। সোম বলল, আরেকটা দুর্বলতার কথা তোমাকে বলি। মেয়েটিকে আমার সত্যি সত্যি ভালো লেগে গেছে। বলতে পারব না কেন। সুন্দরী নয়, সুদর্শনা। তার বিশেষত্ব হচ্ছে সে খুব সপ্রতিভ। যেন কত কাল আমার সঙ্গে পরিচয়। অনেক মেয়ে আছে তারা ছ-মাসের পরিচয়কেও যথেষ্ট মনে করে না, ভয়ে ভয়ে কথা বলে, ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে অশ্রদ্ধা পায়। এ মেয়েটি শ্রদ্ধার জন্যে কেয়ার করে না, অশ্রদ্ধা পেলেও কেয়ার করবে না। কেউ একে ভালোবাসুক না বাসুক বিয়ে করুক না করুক তাতে এর কিছুই আসে যায় না। সেই জন্যেই কি একে আমার ভালো লেগে গেছে?

মন জবাব দিল না।

কিন্তু দরজায় কে টোকা মারল বাইরে থেকে। সোম ভাবল, বোধ হয় হোটেলের কেউ হবে। বোধ হয় জিজ্ঞাসা করতে চায় কাল সকালে ঘুম ভাঙাতে হবে কি না। সোম উঠে বসল বলল, 'ভিতরে আসতে পার।'

মিস স্কট।

মিস স্কট আগে জানালার কাচটা তুলে দিলেন। বললেন, 'দিনটা যদিও বেশ উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত ছিল রাতটাও তেমনি হবে এর মানে নেই।'

তারপর সোমের হাতব্যাগটাকে টিপুনি দিয়ে খুলে তার ভিতরকার জিনিসগুলিকে একে একে বের করলেন। মুখ-হাত ধোবার টেবিলের উপর রাখলেন কামাবার সরঞ্জাম, চুলের ব্রাশ ও ক্রিম, দাঁতের ব্রাশ ও পেস্ট। দেরাজের ভিতর রাখলেন শার্ট, গেঞ্জি, মোজা, কলার টাই। নীচে গুঁজে দিলেন স্লিপিং সুট। চটিজোড়াটিকে রাখলেন খাটের কাছে যে স্ট্যাণ্ড থাকে তারই ভিতরে।

তারপর একটি চেয়ার টেনে নিয়ে সোমের দিকে মুখ করে বসলেন।

সোমের রাগ পড়ে গেছিল। রাগের স্থান অধিকার করছিল মমতা। আহা, এই মেয়েটি যদি আমার ঘরনি হত। তবে আমার বইয়ের টেবিলের উপর টাই, বিছানার উপর শার্ট ও মেজের উপর মোজা গড়াগড়ি যেত না, চটিজোড়াটাকে দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যেত। তাহলে আমাকে আমার ল্যাণ্ডলেডি বুড়িকে auntie বলে তোয়াজ করতে হত না।

মিস স্কট বললেন, 'কী ভাবা হচ্ছে!'

সোম অভিমানের সুরে বলল, 'জেনে আপনার লাভ! আরেক দফা অপমান করবেন?'

'কবে আপনাকে অপমান করলুম, মশাই?'

'নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'সত্যি আমি সজ্ঞানে অপমান করিনি। অজ্ঞানে যদি করে থাকি তবে মাফ চাইছি, মিস্টার সোম।'

সোমের অভিমান জল হয়ে গেল। সে বলল, 'ওই যে বললেন আপনাকে কেনা যায় না!'

'সে তো ঠিকই। আমাকেও কেনা যায় না, আপনাকেও না, কেউ কারুর খরচ দেবে কেন?'

'কিন্তু মিস স্কট, আমার জন্যেই যে আপনাকে খরচ করতে হল। নইলে আপনার তো মাসির বাড়ি রয়েছে।'

'খরচ করবার জন্যে ছুটিতে বেরিয়েছি, খরচ হল তো বয়ে গেল। ধরুন আজ যদি সলসবেরিতে থাকতুম।'

'সেখানেও তো ক্যাথরিনকে ও আপনাকে জরিমানা দিতে হয়েছে পুরো দিন রাত থাকলেন না বলে।'

'না গো মশাই, আমরা অত কাঁচা মেয়ে নই। ইস্টারের ভিড়, হোটেলওয়ালাকে জায়গার জন্যে যাত্রীরা চেপে ধরেছে। আমি ওদের মধ্যে দু-জনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললুম, 'আমার বন্ধুর ও আমার দুটো ঘর আমরা আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি আপনারা যদি দু-রাত থাকবেন প্রতিশ্রুতি দেন।' ওরা আবেগের সঙ্গে বলল, 'How kind of you! How noble of you'!'

সোম শেষের কথাগুলি শুনে সশব্দে হেসে উঠল। বললে, 'আমাকে ওকথা আগে বলেননি কেন? সেজন্যে আপনার উপর রাগ করব।'

'করুন রাগ। আমি বসে বসে দেখি।'

সোম বলল, 'এত রাত্রে একজন ব্যাচেলরের ঘরে বসে আছেন, আপনার সাহস কম নয়!'

'কেন, ভয় করব কাকে?'

'যদি বলি, লোকনিন্দাকে?'

'লোকনিন্দার ভিত কাঁচা, যতক্ষণ আমি নিজে খাঁটি আছি।'

'যদি বলি, আমাকে?'

(আতঙ্কের সঙ্গে) 'আপনাকে?'

(কৌতুকের সঙ্গে) 'আমার হাতের কাছে সুইচ। আপনার হাতের কাছে নয়। এই মুহূর্তে ঘর অন্ধকার করে দিতে পারি।'

(সাহস ফিরে পেয়ে) 'চিৎকার করে রাজ্যের লোক জড় করব।'

'ভীরুরাই চিৎকার করে থাকে। ছিঃ ছিঃ, মিস স্কট!'

'আমার গায়ের জোর আপনার থেকে কম নয়, মিস্টার সোম।'

'ছেলেমানুষের মতো কথা হল মিস স্কট। জানেন না যে অতিশয় দুর্বল মানুষও দুর্দান্ত হয়ে ওঠে যদি একতাল সোনা পড়ে রয়েছে দেখে?'

(ফিক করে হেসে) 'আমি কি একতাল সোনা?'

'নিশ্চয়, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে। অপরিসর ঘর, এগারোটা রাত, যুবা পুরুষ। এমন সুযোগ জীবনে এক-আধবার আসে। এ-কথা যখন ভাবা যায় তখন শশকের দেহতেও সিংহের বল সঞ্চার হয়, মিস স্কট।'

'তাহলে আমি এই বেলা পালাই, মিস্টার সোম।'

'না, না, আরেকটু বসুন।'

'না না, আমার আর সাহস থাকছে না।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'কেলেঙ্কারি, মিস স্কট! ঠাট্টাও বোঝেন না!'

'এসব বিষয়ে ঠাট্টা যে গড়াতে গড়াতে কতদূর যায় তার দু-একটা দৃষ্টান্ত জানা আছে, মিস্টার সোম। দুটো দিনের পরিচয়ে আমরা বড়ো বেশি দূরে এগিয়েছি।'

'সে তো শুধু বাক্যে। ফ্রান্সের মতো দেশে যা ধুলোর মতো সস্তা, যা যেকোনো যুবক যেকোনো যুবতীকে দিতে পারে, আপনাকে তাই আমি এ পর্যন্ত দিইনি—আমার এই সংযম, এই আত্মনিগ্রহ যেন আমার উপর আপনার আস্থাকে অটুট রাখে, মিস স্কট।'

(লজ্জারুণ বদনে) 'সেই মূল্যহীন উপঢৌকনটির নাম জানতে পারি কি?'

'আপনিই আন্দাজ করুন না?'

'ফুল?'

'ফুলের তো দাম আছে।'

'তবে কী?'

'চুম্বন।'

মিস স্কট শরমে রাঙা হয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাব ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এর জন্যে এত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা?'

সোম কী বলবে ভেবে পেল না। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মিস স্কট তার পাশটিতে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'আর দেরি না। ঘুম পাচ্ছে। দিন।'

সোম ঘাবড়ে গেল। এতটা প্রসন্নতা প্রত্যাশা করেনি। তার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হচ্ছিল।

মিস স্কট হাসতে হাসতে বললেন, 'দিন, দিন, দিন।'

সোম লজ্জায় জড়সড়। অপ্রস্তুতের একশেষ। চিরকাল যে অযাচিতভাবে দিয়েছে। কদাচিৎ অযাচিতভাবে পেয়েওছে। কিন্তু কোনোদিন কেউ তার কাছে চুম্বন ভিক্ষা করেছে বলে তো মনে পড়ে না।

তখন মিস স্কট স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'গুড নাইট, মিস্টার সোম।' দরজার কাছ অবধি গেছেন এমন সময় সোম দিল সুইচটা টিপে।

সোমের বুক ঢিপ ঢিপ করছে। সে যে কী চায় স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না। তবু মিস স্কটকে সে যেতে দেবে না। অন্ধকারে তার লজ্জা সংকোচ রইল না। সে কাঁপতে কাঁপতে মিস স্কটের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

মিস স্কটের পলায়নের ত্বরা ছিল না। তিনি স্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়ে কী জানি কী ভাবছিলেন। সোম তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে এনে বিছানার উপরে বসাল ও বসল। ঠিক সেই আগের জায়গা দু-টিতে। সুইচ আর টিপল না।

অন্ধকার ঘর। হোটেল নিঃশব্দ। সোম ও মিস স্কট কেউ কোনো কথা বলে না। পরস্পরকে স্পর্শ করে না পর্যন্ত। একজন থরথর করে কাঁপছে, অন্যজন মর্মর-মূর্তির মতো নিঃস্পন্দ। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যেন একটা যুগ।

মিস স্কট উঠে দাঁড়ালেন। তখন সোমও উঠে দাঁড়াল। মিস স্কট দরজার দিকে পা বাড়ালেন। তখন সোম তাঁর গতিরোধ করে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে বাঁধল। তাঁর মাথাটি তার গলার উপর ঢলে পড়ল। সোম তাঁর কেশের উপর চুম্বন বৃষ্টি করে চলল।

অনেকক্ষণ চলে গেলে পর তিনি মুখ তুললেন। 'Have you finished?'

এতক্ষণ যেন একটা বস্তুকে চুম্বন করছিল। মানুষের গলার সুর শুনে মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সোম আবার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হল। তখন তার বাহুপাশ খুলে মিস স্কট প্রশান্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলেন।

৫
সব আগের দিন

নাম তার কল্যাণকুমার সোম। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জলহাওয়ার গুণে তাঁর ইংল্যাণ্ডস্থিত বাঙালি বন্ধুরাও তাঁকে সোম বলে ডাকে। তার বাল্যবন্ধু প্রভাত তার বছরখানেক আগে ইংল্যাণ্ডে এসেছে, সেই এক বছর বন্ধুর নাম ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, তাই স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসে প্রভাত তাকে সম্বোধন করেছে, 'এই যে, সোম।' কাজেই সেও প্রভাতকে ডাকছে দাশগুপ্ত বলে।

দিন কয়েক আগে ইস্টারের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু লণ্ডন ছাড়তে সোমের মায়া করছে। লণ্ডনকে সে ভালোবেসেছে, সেটা একটা কারণ। রোজ সন্ধ্যায় সোহো অঞ্চলে না গেলে তার খেয়ে সুখ হয় না। সেখানে নানাদেশের রকমারি লোকের সঙ্গে তার দোস্তি হয়। ওয়েট্রেসের সঙ্গে সকলের মতো সেও ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে ফ্লার্ট করবার মতো বান্ধবীও পায়। তবে সোম হুঁশিয়ার ছেলে। দশটার আগে বাসায় ফিরবেই, এবং বারোটা অবধি বই-খাতা নিয়ে বসবেই।

সকাল সকাল কলেজে যেতে হয় বলে ঘুমের ঘোরে যেটুকু ফাঁক পড়ে সেটুকু শনিবারে রবিবারে বুজিয়ে দেয়। রাত বারোটার থেকে বেলা বারোটা অবধি ঘুম। শনি ও রবি এই দু-টি বারের নাম 'কুম্ভকর্ণ day'।

সম্প্রতি ইস্টারের ছুটি হয়ে এমন হয়েছে যে প্রত্যেক দিনই 'কুম্ভকর্ণ দিন'। তাতে সোমের তো আনন্দ, কিন্তু তার ল্যাণ্ডলেডির আপত্তি। ল্যাণ্ডলেডি যেদিন থেকে তার আন্টি হয়েছে সেদিন থেকে মায়ের চেয়ে দরদি হয়েছে। সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট না খেলে যে শরীর টিঁকবে না অর্থাৎ ল্যাণ্ডলেডির পক্ষে ব্রেকফাস্টের বাবদ কিছু অর্থপ্রাপ্তি শক্ত হবে সেই জন্যে আন্টি সোমের শোবার ঘরের বাইরের করিডর দিয়ে খট খট করে দু-শো বার চলাফেরা করে তবু ভাগ্নের ঘুম ভাঙে না বারোটার আগে।

সোম রোজই ভাবে ঘুম থেকে উঠে সোজা কোনো রেস্তোরাঁতে গিয়ে লাঞ্চ খাবে, কিন্তু রোজই আন্টির আবদার—'সোম, তোমার ব্রেকফাস্ট কখন থেকে টেবিলের উপর পড়ে। তোমার আজকাল হল কী! বুধ বৃহস্পতিবারকে তুমি শনিবার করে তুললে। তোমার জন্যে তিনবার চায়ের জল গরম করেছি, পরিজ-এর দুধ গরম করেছি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভেবেছি এইবার তুমি উঠবে।'

সোম বলল, 'ধন্যবাদ, আন্টি! কিন্তু কেন এত কষ্ট করলে!'

'করব না? তুমি সকাল বেলাটা উপোস দেবে, তাতে তোমার শরীর টিঁকবে? দুষ্টু ছেলে। থাকত যদি তোমার মা এখানে তোমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলত।'

তারপর বুড়ির আদর শুধু ব্রেকফাস্ট খাইয়ে তৃপ্তি মানে না। বুড়ি বলে, 'অবেলার ব্রেকফাস্ট। রোসো, কিছু রোস্ট কিংবা স্টু দিয়ে যাই। পেটভরে খাও। আর বাজারের লাঞ্চ খেয়ে কাজ নেই।'

অতএব সোমের আর বাইরে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া, আলাপ করা, ফ্লার্ট করা হয়ে ওঠে না। সে কোনোদিন সিনেমায় কোনোদিন আর্ট গ্যালারিতে অপরাহ্ণটা কাটিয়ে দেয়। কোনোদিন বাস-এর মাথায় চড়ে শহর দেখে বেড়ায়।

লণ্ডন ছাড়তে তার মায়া করে।

কিন্তু যেদিন গুডফ্রাইডে এল সেদিনকার ওয়েদারটি হল নিখুঁত। যেন ভারতবর্ষের বসন্ত দিন। সোমের শোবার ঘর রৌদ্রে ঝলমল করল। সোম চোখ বুজে থাকতে পারল না। বাঁ-হাতের রিস্টওয়াচটাতে দেখল তিনটে বেজে দশ মিনিট। কানের কাছে নিয়ে বুঝল, বন্ধ। বেলা যে কটা হতে পারে আন্দাজ করা কঠিন। যেমন রৌদ্র উঠেছে, মনে হয় বারোটা বেজে একটা বেজে গেছে। সোম ঘড়িটাকে বার দুই নাড়া দিল। হাই তুলতে তুলতে বিছানার উপর উঠে বসল।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে নেমে এসে দেখল আন্টি কুকুরসেবা করছে। ওটা তার প্রাতঃকালের প্রথম কর্ম। সোমকে দেখে বলল, 'এ কী অনাসৃষ্টি ব্যাপার! সাড়ে ছ-টার সময় পোশাক পরে কোথায় চললে?'

সোম বলল, 'মোটে সাড়ে ছটা! তোমার ঘড়ি ঠিক চলছে তো আন্টি?'

আন্টির ঘড়ি অবশ্য সর্বদা আধ ঘণ্টা পেছিয়ে চলে। ওটা আন্টির পলিসি। ঠিক সময়ে খাবার দিতে পারে না, ঘড়ি দেখিয়ে বলে, 'আমার অপরাধ কী! ঘড়িতে এখনও ঠিক সময় হয়নি।' তখন সোম বলে, 'তা হলে কাল থেকে আমাকে আধ ঘণ্টা আগে খাবার দিয়ো।' তার ফলে বুড়ি ঘড়িটাকে এক ঘণ্টা পেছিয়ে রাখে। সোম বলে, 'আন্টি, রক্ষা করো। যদি বলি কাল থেকে আরও আধ ঘণ্টা আগে খাব তা হলে তুমি ঘড়িটাকে আরও আধ ঘণ্টা পেছিয়ে দেবে। শেষে একদিন আটটার সময় উঠে দেখব তোমার ঘড়িতে দুটো বেজেছে, আড়াইটে না বাজলে তুমি খাবার দেবে না।' অগত্যা সোম আধঘণ্টা আগে উঠতে ও উঠে বুড়িকে তাড়া দিতে অভ্যাস করল।

এ গেল ঘড়ির ইতিহাস।

বুড়ি বলল, 'সাড়ে ছটার সময় কাজের দিনেও তোমার ঘুম ভাঙে না, এই ছুটির দিনে তুমি চললে কোথায়?'

সোম চট করে বানিয়ে বলল, 'তোমাকে বলিনি বুঝি, আন্টি? অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে তোমার লোকসান হবে না। আমি যে পনেরো দিন বাইরে থাকব সে ক-দিনের বাসা ভাড়া ঠিক এমনি দিতে থাকব।'

বুড়ি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'যাচ্ছ বাইরে পনেরো দিনের মতো। না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে ফিরবে সাবধান করে দিচ্ছি, সোম।'

সোম বলল, 'ব্রেকফাস্টের দামও যেমন দিচ্ছিলুম তেমনি দেব, আন্টি।'—বুঝতে পেরেছিল কী নিগূঢ় কারণে বুড়ি উত্তেজিত।

মোটে সাতটা বেজেছে। কুকুর-সেবা শেষ হলে বুড়ি ব্রেকফাস্টের উদ্যোগ করবে। সোম ততক্ষণ কুকুরের সঙ্গে বল নিয়ে লোফালুফি খেলতে থাকল।

কোথায় যাবে সে-কথা সোম বুড়িকে বলেনি। কারণ, সে নিজেই জানে না। একটা হাতব্যাগে গোটা কয়েক জিনিস পুরে বেরিয়ে পড়ল। আগে পথ, তারপরে পথের চিন্তা। চলতে চলতে চলার লক্ষ্য স্থির করা যাবে।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে মার্বল আর্চ পর্যন্ত এল। তারপর হাইড পার্কে ঢুকল। তখন ইচ্ছা হল সার্পেনটাইনে কিছুকাল বোটিং করে। যেখানে বোট ভাড়া করতে হয় সেখানে ভিড় জমেছে। যারা আগে এসেছে তাদের দাবি আগে। সোম ভিড়ের পিছনে ভিড়ে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে দেখা গেল পাশের লোকের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে।

তারা দু-জনে মিলে একটি বোট ভাড়া করল। সার্পেনটাইনে নৌকা চালিয়ে সুখ নেই যদি না নৌকাতে কোনো বান্ধবী থাকে। তবু সুখ না হোক, অর্ধ সুখ, যদি নব পরিচিত বান্ধব থাকে ও সামনে দাঁড় টানে। ঘণ্টা দুই দাঁড় টেনে যখন রীতিমতো শ্রান্ত হল তখন পথিকবন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে সোম আবার পথ ধরল।

হাঁটতে হাঁটতে কখন একসময় ভিক্টোরিয়ায় এসে পড়ল। স্টেশন দেখলেই মনটা বিবাগী হয়ে যায়। বিশেষত ভিক্টোরিয়া স্টেশন, সেখান থেকে ফ্রান্স জার্মানি ইটালি অভিমুখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেন ছাড়ছে।

সোমের পকেটে যে টাকা ছিল তাতে প্যারিসে গিয়ে দশ দিন থাকা যায়, সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে ছ-দিন, ভিয়েনাতে তিন দিন। কিন্তু বুড়িকে বলেছে পনেরো দিনের জন্যে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের কোনো পল্লিতে দিন পনেরো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবার নির্ঝঞ্ঝাট আরাম তাকে প্রলুব্ধ করছিল। লণ্ডন থেকে দূরে নয়, অথচ বেশ নিরিবিলি। এমন কোনো জায়গা পাওয়া যায় কি না তল্লাশ করবার জন্যে সাদার্ন রেলওয়ে কোম্পানির গাইড বই চেয়ে নিয়ে স্টেশন রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খেতে বসল।

গিল্ডফোর্ড নামটি ভালো, ঐতিহাসিক স্মৃতিতে মুখর। ওই স্থানটিকে রাত্রিকালের কেন্দ্র করে প্রতিদিন নতুন পথে নিষ্ক্রমণ করা যাবে। কোনোদিন Waverly Abbey, কোনোদিন Holt Forest, কোনোদিন Leith Hill.

মানচিত্র খুলে দেখল গিল্ডফোর্ড থেকে দিকে দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

সোম মনস্থির করে ফেলল। গিল্ডফোর্ডের টিকিট কিনল। যে প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়ে ও যে সময়ে ছাড়ে সেসব কথা স্টেশনে উত্তোলিত ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ছিল, কিন্তু এতগুলো নাম পাশাপাশি ছিল যে সোম ভুল পড়ল। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করবার সময় টিকিট দেখে রেলের কর্মচারী বলল, 'গিল্ডফোর্ড? এ গাড়ি তো সোজা গিল্ডফোর্ড যাবে না। এক কাজ করতে পারেন। Woking-এ নেমে অন্য ট্রেন ধরতে পারেন।'

সোম বলল, 'ধন্যবাদ।'

তখন ট্রেন ছেড়ে দেবার মুখে। লোকটি বলল, 'দৌড়োন। আধ মিনিট বাকি।' সোম দৌড়োল। কিন্তু যে কামরায় ঢুকতে যায় সে কামরায় গুডফ্রাইডের জনতা। ট্রেন ফেল করতে তার অনিচ্ছা ছিল না, আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ট্রেন আছে। কিন্তু একবার প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বিফল হয়ে বেরিয়ে যাওয়া বড়ো লজ্জার কথা! সোম হাঁপাতে হাঁপাতে ইঞ্জিনের কাছের কামরাগুলোকে লক্ষ করে ছুটল। তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সোম হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই বৃহৎ সরীসৃপটির গতিলীলা নিরীক্ষণ করছে এমন সময় একটি দরজা খুলে দিয়ে একটি তরুণী হাতছানি দিল। সোম কালক্ষেপ না করে হাতব্যাগটা ট্রেনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলল এবং দুই হাতে দুই পাশের লোহার শিক ধরে করিডরের উপর লাফ দিয়ে পড়ল। সেই বগিটিতে একটি কামরায় একটি জায়গা খালি ছিল। তরুণীটির পশ্চাদনুসরণ করে সোম সেই জায়গার সন্ধান ও অধিকার পেল। তখনও তার হৃৎকম্পন রহিত হয়নি। একটু বেকায়দায় পড়লে কাটা পড়ত। যাক একটা ফাঁড়া গেছে।

মেয়েটি সোমের সম্মুখের সারিতে বসেছিল। একটি ব্রাউন রঙের হ্যাট তার মাথায়, একটা ব্রাউন রঙের ওভারকোট তার গায়। নীল নয়ন, উন্নত নাসা, নিটোল গাল, রক্তিম অধর। ত্বক এত পাতলা যে তুলনা দিতে হয় আঙুরের সঙ্গে। সে আঙুর সাদা হওয়া চাই—রক্তাভ শুভ্র।

ইংরেজরা যাকে blonde বলে মেয়েটি তাই। আমরা যাকে ফর্সা কিংবা সুন্দর বলি তা নয়। তার কারণ আমরা ফর্সাই হই আর শ্যামলাই হই আমাদের গায়ের রং আমাদের চামড়ার নীচের রং নয়, চামড়ার উপরের রং। অর্থাৎ সূর্যদেব আমাদের চামড়ার উপর রং মাখিয়েছেন, সে রং দুধে-আলতাই হোক আর হাঁড়ির কালিই হোক। অপরপক্ষে ইংরেজের গায়ের রং তার চামড়ার নীচের রং। তার চামড়া হচ্ছে জলের মতো আলোর মতো বর্ণহীন। তাই চামড়া ফুটে রক্ত মাংসেরই রং বাইরে থেকে দেখা যায়।

মেয়েটি তার বয়সের মেয়েদের তুলনায় গম্ভীর। নতুবা হাসত কিংবা হাসির ভান করত কিংবা হাসির ছল খুঁজত। হাতে মুখ রেখে চুপ করে কী যেন ভাবছে, মাঝে মাঝে একবার সোমকে চুরি করে দেখছে। চোখাচোখি হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সোমের হাসি পাচ্ছে, সোম সে হাসি চাপছে। সোমের গাম্ভীর্য মেয়েটির গাম্ভীর্যকে খোঁচা দিচ্ছে।

কামরাটিতে আরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছিল, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে আলাপ শুরু করতে সাহস পাচ্ছিল না। বোবার মেলা। সোম জানত একবার যদি একজন একটি কথা বলে সকলের মৌন ভঙ্গ হয়। কিন্তু সেই প্রথম কথাটি কে কাকে সাহস করে বলবে?

একজন আমতা আমতা করে বললে, 'আমার মনে হয় আজ বৃষ্টি হবে না।'

আরেকজন তার উত্তরে বললেন, 'আমার তো মনে হয় না। আপনার?' (তৃতীয় একজনের প্রতি)।

তৃতীয় জন বললেন, 'বলা ভারি কঠিন। কখন কোথা থেকে একখানা মেঘ উড়ে আসবে—'

একজন বৃদ্ধা কথাটিকে সমাপ্ত করবার ভার নিলেন। বললেন, 'আর এমন সুন্দর দিনটা মাটি করে দেবে।'

কামরার সবাই একে একে কথাবার্তায় যোগ দিল; দিল না কেবল সেই মেয়েটি ও সোম। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে কখন একসময় চাপা হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল কামরার অন্য সকলের ভাব দেখে। কামরার সকলেই তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি এ যুগের বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রচ্ছন্ন উপহাস ও অনুকম্পা যেকোনো দু-জন অপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠকে নিকট করে তোলে। যেন ওই কামরাটিতে দু-টি দল—বয়োজ্যেষ্ঠদের ও বয়ঃকনিষ্ঠদের।

মজা হল যখন জ্যেষ্ঠদের একজন সোমকে বললেন, 'আরেকটু হলেই আপনি ট্রেনটা মিস করছিলেন, না?'

সোম বলল, 'শুধু ট্রেনটা নয়, প্রাণটাও'। (সোম সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসল।)

যাঁরা সোমকে লাফ দিতে দেখেছিল তারা শিউরে উঠল। যারা দেখেনি তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সোম বলল, 'আমি ভাবছি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব, না ব্যক্তিবিশেষকে ধন্যবাদ দেব।' (মেয়েটির বুকের রক্ত মুখে সঞ্চারিত হওয়ায় তাকে রক্ত গোলাপের মতো দেখাল।)

তখন সকলের দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির উপরে। এতক্ষণ তার অস্তিত্ব সকলে অবচেতনার মধ্যে অনুভব করছিল, একটি ছোটো কামরায় আটজন থাকলে যেমন হয়ে থাকে। আমরা ক-জনা একসঙ্গে আছি, মনকে এ সত্য হয় তো রাঙায় না, কেননা অনেকের মন সুদূরস্থিত প্রিয়জনের সঙ্গ পেতে থাকে। কিন্তু দেহের নৈকট্য দেহের ফোটোপ্লেটের উপর ছাপ রাখবেই। যদিও সে ছাপকে অনেকে ডেভেলপ করে না, সে সম্বন্ধে সচেতন হয় না।

একসঙ্গে সকলের দৃষ্টি তার উপরে পড়ায় মেয়েটি অপ্রতিভ হয়ে সোমের উদ্দেশে বলল, 'ব্যক্তিবিশেষটি যদি আমি হয়ে থাকি তবে ধন্যবাদটা আমাকে দিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ নিজেকে দিন শিম্পাঞ্জির মতো লাফ দিতে পারেন বলে।'

মেয়েটির প্রথম সম্ভাষণ এই। প্রথম সম্ভাষণেই তাকে শিম্পাঞ্জির সঙ্গে তুলনা করায় সোমের ভারি রাগ হচ্ছিল। কিন্তু Woking-এর দেরি নেই, এখুনি নেমে যেতে হবে। সোম মনে মনে অনেকগুলি জবাব তৈরি করতে লাগল। কিন্তু কোনোটাই যথেষ্ট কড়া অথচ রসালো হয় না। তাই সোম রাগটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

সোম এক অদ্ভুত সংকল্প করে বসল। Woking-এ নামবে না। মেয়েটি যে স্টেশনে নামবে সেই স্টেশনে নামবে। এ জন্যে যদি ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমের শেষ সীমায় যেতে হয় তবু সোম যাবে। মেয়েটিকে সে সহজে ছাড়বে না। মনকে জিজ্ঞাসা করল, কী শাস্তি দিলে শোধবোধ হয়? মন বলল, শাস্তির সেরা শাস্তি চুম্বন। কিন্তু বহু ধৈর্যে বহু ভাগ্যে সম্ভব হয়। সোম বলল, পনেরো দিনেও সম্ভব হয় না? মন বলল, হয়। যদি তোমার মান অপমান অভিমান বোধটা কম হয়। যদি বুলডগের মতো গোঁ থাকে তোমার।

Woking-এ সোম নামল না। জন দুয়েক নেমে গেল ও জন দুয়েক তাদের জায়গা দখল করল।

তারপরেই সোম পড়ল মুশকিলে। টিকিটচেকার এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাঁকল, 'টিকিট! টিকিট।'

মেয়েটি কোন স্টেশনে নামবে সোম যদি তা জানত তবে নির্ভাবনায় বলত, 'মত বদলেছি। গিল্ডফোর্ড যাব না। অমুক স্টেশনের ভাড়া নিয়ে রসিদ দাও।' ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জরিমানা দিতে হয় না, ১০ মাইলের টিকিট কিনে ১০০ মাইল গেলে ৯০ মাইলের অতিরিক্ত দাম দিলেই গোলমাল চুকে গেল।

সোম ভাবল, জিজ্ঞাসা করি ওঁকে কোন স্টেশনে উনি নামবেন। কিন্তু চরম অভদ্রতা হবে।

টিকিটচেকারকে বলল, 'শোনো। আমি গিল্ডফোর্ড যাব না ঠিক করলুম, কিন্তু কোথায় যে যাব ঠিক করিনি। দরকার হলে Penzance-ও যেতে পারি, আবার কাছেই কোথাও নেমে পড়তেও পারি। তুমি এক কাজ করো, তুমি আবার যেখানে চেক করতে আসবে সেইখানকার ভাড়া নিয়ে রসিদ দাও।'

চেকার বলল, 'সে অনেক দূর। Axminster.'

সোম বলল, 'কুছ পরোয়া নেই।'

চেকার বলল, 'আচ্ছা, আপনার জন্যে আমি মাঝখানে দু-একবার আসব। আপাতত ভাড়া দিতে হবে Whitchurch পর্যন্ত।'

সোম বলল, 'তথাস্তু।'

বিদেশি মানুষের কাছে অদ্ভুত কিছু সকলেই প্রত্যাশা করে। সোমের কান্ড দেখে সকলেই একবার গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কাশল। সেই মেয়েটিও।

সোম খুশি হল এই ভেবে যে মেয়েটি তার গোপন সংকল্প টের পায়নি। পরে যখন এক স্টেশনে দু-জনে নামবে তখন মেয়েটিকে সোম চমকে দিয়ে অনুরোধ করবে, 'আমাকে একটা হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?' তারপরে বলবে, 'কাল যদি আমার হোটেলে একবার পায়ের ধুলো দেন?'

এইসব কাল্পনিক কথোপকথন বানাতে বানাতে সোমের সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠছিলও। সোম মাঝে মাঝে মেয়েটির চোখে চোখ রেখে তার মনের কথা ধরবার চেষ্টা করছিল। এখন আর মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল না, বরঞ্চ সকৌতুকে সোমকে অধ্যয়ন করছিল, যেন সোম চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জি।

সোমের যতই রাগ হচ্ছিল ততই জেদ বাড়ছিল। এতগুলো লোকের সাক্ষাতে অপরিচিত মেয়েকে ফস করে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না যে কেন আমাকে গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত করলেন? শিম্পাঞ্জির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আমোদ পাবেন বলে।

Whitchurch এল। সেই সঙ্গে এল সোমের পূর্বপরিচিত টিকিটচেকার। বলল, 'কী ঠিক করলেন, স্যার?'

সোম লক্ষ করল মেয়েটি নামবার উদ্যোগ করছে না। তার সুটকেস নামানো হয়নি, ওভারকোটের বোতাম আঁটা হয়নি। সোম বলল, 'কিছুই ঠিক করিনি, চেকার। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

চেকার আপ্যায়িত হয়ে তাকে সলসবেরির রসিদ দিল। তখন সোম লক্ষ করল মেয়েটির মনের চমক মুখে ব্যক্ত হল। তবে কি মেয়েটি সলসবেরি যাচ্ছে? সোম ভাবল, যেখানেই যাক আমাকে এড়াবার জো নেই। শিম্পাঞ্জিকে শেষপর্যন্ত সাথিরূপে পাবে।

এখনও মেয়েটি সোমের সংকল্প অনুমান করতে পারেনি ভেবে সোমের হাসি চেপে রাখা শক্ত হচ্ছিল। সে আরেকবার মনে মনে রিহার্সাল দিতে লাগল মেয়েটির পিছন পিছন নেমে গিয়ে কী ভাষায় ও কেমন ভদ্রতার সঙ্গে সে তার অনুরোধটি জানাবে। মৃদু হেসে বলবে, Excuse me, এখানকার কোনো হোটেলের সঙ্গে কি আপনার জানাশোনা আছে?...আছে?...ধন্যবাদ। কী নাম বললেন? অমুক হোটেল?...কিছু না মনে করেন যদি তো একটি অনুরোধ পেশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করব।...অনুমতি মঞ্জুর করেছেন? ধন্যবাদ। কাল যদি আপনার সময় ও সুবিধে থাকে আমার সঙ্গে চা খেয়ে আমাকে অনুগৃহীত করবেন কি?...না? বড়ো দুঃখিত হলুম! অন্য কোনোদিন? অন্য কোনো সময়?...অত্যন্ত সুখী হলুম।

এমনি ভাবতে ভাবতে সলসবেরি এল। তার আগেই মেয়েটি সুটকেস নামিয়েছিল। একবার কোটটা ঝেড়ে নিয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে মুখের উপর দু-বার রুমাল বুলিয়ে মেয়েটি করিডরে গিয়ে দাঁড়াল এক জানালা দিয়ে দূর থেকে সলসবেরির ক্যাথিড্রাল অন্বেষণ করল।

সোম নামছে। টিকিটচেকারের সঙ্গে মুখোমুখি। 'কী স্যার, এইখানে নামছেন?'

'এইখানেই নামছি।'

'অত তাড়াতাড়ি কীসের? একটু গল্প করা যাক। সলসবেরি এই প্রথম দেখবেন?'

'এই প্রথম দেখব। (সোমের ভারি অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মেয়েটি অনেক দূর চলে গেছে। এদিকে এ লোকটাও ছাড়ে না।) ভালো কথা, চেকার। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই শিলিংটি তার নিদর্শন।'

সোম জানত লোকটা হঠাৎ গল্প করবার জন্যে এতটা উদগ্রীব হল কেন। শিলিংটা পেয়ে তার গল্প করবার সাধ মিটল। সে সেলাম করে সরে গেল।

সোম মেয়েটির গতিবিধির খেই হারিয়ে ফেলেছিল। চেকারকে অভিশাপ দিতে দিতে দৌড়োল। আরেক গেরো স্টেশনের গেট-এ। সেখানে ওরা সোমের রসিদ দুটোকে ও টিকিটটাকে বারংবার উলটেপালটে দেখে। গিল্ডফোর্ডের যাত্রী সলসবেরি এসেছে, ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত তেমনি সন্দেহাত্মক।

কোনোমতে ছাড়া পেল। কিন্তু কোথায় সেই মেয়েটি? সোম দু-হাতে ট্যাক্সিওয়ালাদের ঠেলে সরিয়ে নিরাশ হয়ে মেয়েটির সন্ধানে চারিদিকে চাউনির চর পাঠাল।

অকস্মাৎ দেখল মেয়েটি একটা ট্যাক্সিতে বসে তারই দিকে চেয়ে আছে। সোম তিরের মতো ছুটে গেল মেয়েটির কাছে। সোমের রিহার্সাল দেওয়া ভূমিকার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছল। সে বলল, 'আমাকে কোনো একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে পারেন?'

মেয়েটি বলল, 'আসুন। আমিও একটা হোটেলে যাচ্ছি।'

সোম ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেল। মেয়েটির পাশে জায়গা করে নিল। বলে ফেলল, 'ইস! আপনাকে কত খুঁজেছি।'

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাকে।'

'হ্যাঁ, আপনাকেই। আপনার জন্যেই তো সলসবেরি আসা।'

'সত্যি?'

'আশ্চর্যের কী আছে; ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি। আমার পক্ষে গিল্ডফোর্ড যা, সলসবেরিও তাই। অধিকন্তু সলসবেরিতে একজন চেনা মানুষ পাব, যে মানুষ ট্রেনে উঠতে সাহায্য করেছেন, যাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

মেয়েটি নীরব রইল। সোম এক নিঃশ্বাসে কত কথা বলে চলল। সমস্ত পথ সে যত কিছু ভেবেছে ও মনে মনে বলেছে, সেইসব। কিন্তু ট্যাক্সিটা বেরসিকের মতো দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেল।

হোটেলের অফিসে গিয়ে মেয়েটি বলল, 'আমার বন্ধু ক্যাথরিন ব্রাউন আসতে পারেননি। আমার এই বন্ধুটি তাঁর বদলে এসেছেন।'

মেয়ে-কেরানি বলল, 'কী নাম?'

মেয়েটি সোমের মুখের দিকে তাকাল।

সোম বলল, 'সোম।'

তখন মেয়ে-কেরানি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম মিস পেগি স্কট। কেমন ঠিক তো?'

মেয়েটি বলল, 'ঠিক'।

তখন সোমকে ও মিস স্কটকে নিজ নিজ ঘরের চাবি দিয়ে একটি চাকরের সঙ্গে উপরতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

হোটেলটি প্রথম শ্রেণির। পরন্তু ঐতিহাসিক। সোম এমন হোটেলে স্থান পেয়ে খুশি হয়েছিল। এই হোটেলে অন্তত এক শতাব্দী ধরে কত লোক এসেছে গেছে, সম্ভবত তারই ঘরে বাস করেছে। কত পুরুষ, কত নারী।

সোম মুখ-হাত ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ঠিক Lady-killer না হোক সুপুরুষ বটে। বেশ একটু কালো। ভালোই তো। সাদা মানুষের দেশে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই যে মিস স্কট আজ তাকে ট্রেনে উঠবার ইঙ্গিত করলেন, কোনো সাদা মানুষকে তা করতেন কি?

দেশে থাকবার সময় গোঁফ কামাতো। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসে দেখল, সকলেই গোঁফ কামায়। তখন সোম অতি যত্নে গোঁফের চাষ করল, জার্মান কাইজারকে হার মানাবার মতো স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক গোঁফ। ভাবছিল দাড়িও রাখবে, কিন্তু কাইজার-মার্কা গোঁফের সঙ্গে কেমন দাড়ি মানায় সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না, কেননা, স্বয়ং কাইজারের দাড়ি নেই। আর জার্মান দার্শনিক কাইজারলিং-এর দাড়িটা চটকদার বটে, কিন্তু কাইজারলিং-এর দাড়ি রামছাগলের দাড়ির মতো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সোম তার গোঁফের প্রসাধন করল। তার ভয় হচ্ছিল চেহারাটা ক্রমশ টিপু সুলতানের মতো হয়ে উঠছে মনে করে। ইংল্যাণ্ডে বেশ আছে, কিন্তু দেশে তো একদিন ফিরতেই হবে, তখন আত্মীয় বন্ধুরা ছি ছি করবে। গোঁফটি যতই পুষ্ট হচ্ছে চুলগুলি ততই খাটো হচ্ছে। প্রায় জার্মানদের মতো। ইংল্যাণ্ডে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সেটাও একটা সংকেত।

চায়ের জন্য সোম নীচের তলায় নেমে এল। দেখল মিস স্কট তখনও আসেননি। তিনি যে আসবেনই সে-কথা সোমকে বলেননি। বস্তুত তিনি হোটেলে উঠে অবধি সোমকে একটিও কথা বলেননি। ট্যাক্সিতে ও ট্রেনে যা বলেছিলেন তা এত স্বল্প যে সোমের মুখস্থ হয়ে গেছিল।

তবু সোম tea for two ফরমাস করল। এবং চাকরকে বলল, 'যাও দেখি, আমার বন্ধুনিটিকে খবর দাও।' তারপর ভাবল চাকরের কাছে 'বন্ধুনি' বলাটা কি সঙ্গত হয়েছে; 'বন্ধুনি' কথাটিতে কত যে রহস্য, কথাটি কত যে aesthetic, নিম্নশ্রেণির লোক তার কীই-বা বুঝবে? বরঞ্চ একটা moral প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে কতকটা বুঝত। 'Friend' না বলে বলা উচিত ছিল 'fiancee' অর্থাৎ ভাবী বধূ।

মিস স্কট চায়ের আয়োজন দেখে বললেন, 'আমি তো চা দিতে বলিনি।'

সোম বলল, 'আপনার হয়ে আমি বলেছি ধরে নিন।'

'অন্যায়! বড়ো অন্যায়!'

'সেজন্যে আমার উপর অবসর মতো রাগ করবেন, কিন্তু এখন দয়া করে mother হোন দেখি।' (ইংরেজ পরিবারে মা সবাইকে খাবার বেঁটে দেন। সেই থেকে mother কথাটার এক্ষেত্রে অর্থ, যিনি চা তৈরি করে দেন।)

মিস স্কট সোমের পেয়ালা টেনে নিয়ে বললেন, 'চিনি খান?'

'খুব খাই। না, না, দুটোতে আমার কুলোবে না, চারটে দিন। ও কী! পাঁচটা—সাতটা! (মিস স্কটের হাত চেপে ধরে) মাফ করবেন। সত্যি এত চিনি আমি খাই নে।'

মিস স্কট হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোমের পেয়ালার ভিতর চামচ পুরে গোটা তিন চিনির ঢেলা তুললেন ও কেটলি থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন।

সোম বলল, 'থাক, থাক, ওই থাক। আধ পেয়ালা চা আধ পেয়ালা দুধ। হাসছেন? কিন্তু কখনো খেয়ে দেখেননি কী উপাদেয় পানীয়। অবশ্য লোকে এ জিনিসকে চা বলে না। সেইজন্যে আমি এর নাম দিয়েছি, 'Tilk'। তার মানে Tea আর Milk; ব্যাকরণ মানি নে, হয়ে গেল 'Tilk' কেমনে তা জানি নে।'

মিস স্কট বললেন, 'যেমন Joynson-Hicks থেকে Jix!'

দু-জনে হাসতে লাগল!

সোম বলল, 'আপনি চিনি নিলেন না?'

মিস স্কট বললেন, 'আমার চিনির দরকার করে না।'

'সে-কথা সত্যি। যে নিজে মিষ্টি তার পক্ষে মিষ্টি বাহুল্য।'

মিস স্কট কোনো দিকে না চেয়ে আপন মনে মৃদু হাসলেন।

সোম তাঁর দিকে রুটি মাখন কেক ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আজ্ঞা করুন।'

তিনি তেমনি মৃদু হেসে একখানি crumpet নিলেন ও ছুরি দিয়ে সেটিকে কাটলেন। বললেন, 'ধন্যবাদ, মিস্টার সোম।'

সোম বলল, 'আমার নাম কী করে জানলেন?'

মিস স্কট বললেন, 'আপনার নিজ মুখে শুনে।'

'আপনি বেশ মনে রাখতে পারেন।'

'আপনি বেশ compliment দিতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা খাওয়া এগোতে লাগল। কিন্তু চুপ করে থাকা সোমের স্বভাবে নেই। সোম বলল, 'Trumpet খানা কেমন লাগছে?'

মিস স্কট সবিস্ময়ে বললেন, 'Trumpet!'

সোম বলল, 'Crumpet-কে আমি Trumpet বলি।'

'ওঃ!'

আবার নীরবতা। সোম বাক্যালাপের উপলক্ষ খুঁজল। বলল, 'আরেকখানা Trumpet নিন।'
মিস স্কট বললেন, 'ধন্যবাদ।' তার মানে, 'না।'
সোম একটু আহত বোধ করল। তখন তার মনে পড়ে গেল মান অপমান অভিমান বোধটা এরূপ ক্ষেত্রে কম থাকা ভালো। কেননা মেয়েরা পুরুষদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিয়ে থাকে। বাজিয়ে নিতে ভালোবাসে।
সোম নকল হাসি হেসে বলল, 'Trumpet ভালো লাগল না। তবে কিছু Kiss-Fake নিয়ে দেখুন।'
মিস স্কট আসল নামটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কিন্তু সোম যখন জিনিসটা বাড়িয়ে দিল তখন জোরে হেসে বললেন, 'ওঃ! বুঝেছি! Fish-Cake। হা হা হা।'
সোম বলল, 'এই যে Fish-Cake-কে বললুম Kiss-Fake এ ধরনের উলটোপালটা কথাকে বলে Spoonerism। ডক্টর স্পুনারের গল্প শুনেছেন?'
মিস স্কট সকৌতূহলে বললেন, 'কই? নাঃ।'
'তবে শুনুন। ডক্টর স্পুনার তাঁর Well-oiled bicycle চড়ে কলেজে পড়াতে যেতেন। ছেলেরা একবার জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আপনি কীসে করে কলেজে আসেন?' তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমার একটি Well boiled icicle আছে'।'
মিস স্কটের উচ্চহাস্য।
সোম বলল, 'তখন থেকে ছেলেরা মজার মজার কথা বানিয়ে তাঁর নামে চালাতে থাকল। 'Three cheers for the dear old Queen' বলতে গিয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, Three cheers for the Queen old Dean.'
মিস স্কটের উচ্চতর হাস্য। সোমের যোগদান।
যে ঘরে বসে তারা চা খাচ্ছিল সে-ঘরে অনেকে ছিল। হাসির শব্দ শুনে তারা কালো মানুষটির দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সোম জানত ওটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য। কৌতূহলকে চেপে রাখার নামান্তর। কিন্তু মিস স্কট সম্ভবত ভাবলেন যে কালো মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়াটা সাদা মহাপ্রভুদের পছন্দ হচ্ছে না।
তিনি তাঁর মুখের হাসির সুইচ টিপে দিলেন। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। পাছে সোম কিছু মনে করে এই বিবেচনায় বললেন, 'আরেক পেয়ালা দিই?'
সোম বলল, 'ধন্যবাদ।' অর্থাৎ, 'না।' সোমও 'না' বলতে জানে।
এরপরে মিস স্কট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যাই। আমাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে।'
সোম নাছোড়বান্দার মতো সঙ্গে সঙ্গে চলল। বলল, 'আমাকেও।'
লাউঞ্জে চিঠি লেখার সরঞ্জাম ছিল। মিস স্কট ও সোম দু-জনেই কিছু খাম ও কাগজ নিয়ে কলম কামড়াতে লাগল। চিঠি লেখা শেষ করে উঠতে তারা ঘণ্টাখানেক সময় নিল। সোম লিখল তার বন্ধু প্রভাতকে। মিস স্কটের সঙ্গে তার পরিচয় ও সম্বন্ধকে বাড়িয়ে লিখল। যেন সে ইস্টারের ছুটিতে দিগবিজয়ে বেরিয়েছে। প্রথম দিনেই একটি রাজ্যজয়।
মিস স্কট লিখলেন তাঁর বন্ধুনি ক্যাথরিনকে। কী লিখলেন বোঝা গেল না। কিন্তু লিখতে লিখতে হাসছিলেন। তাই দেখে সোমের মনে হচ্ছিল সোমের মুখ থেকে শোনা হাসির কথাগুলি টুকছিলেন। কিংবা হয়তো লিখছিলেন একটি শিম্পাঞ্জি আমার সঙ্গ নিয়েছে।
মিস স্কট বললেন, 'এবার চিঠি দু-খানা ডাকে দিয়ে আসা দরকার। দিন, আমি দিয়ে আসি।'
সোম বলল, 'ধন্যবাদ! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে চিঠির বাক্সটা চিনে রেখে আসি।'
চিঠি দু-খানা হোটেলের চাকরকে দিলেই চলত। কিন্তু তারা একটু বেড়িয়ে আসতে উৎসুক হয়েছিল। নতুন শহরে এসে পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভারি ইচ্ছে করে। মিস স্কট উপরে গেলেন তাঁর হ্যাট ও কোট পরে আসতে। সোম ততক্ষণ নীচের তলায় পায়চারি করতে থাকল।
চিঠির বাক্স কাছেই ছিল, তবু তারা ডাকঘরের বাক্সে চিঠি দেবে স্থির করে এগিয়ে চলল। শহরটিতে একটি ছোটো খালের মতো নদী—ইংল্যাণ্ডের বহুতর নদীর মতো এরও নাম Avon। শহরটি ছোটো, রাস্তাগুলির

কাটাকুটি শহরটিকে দাবা খেলার ছকের মতো করেছে।

সোম খুশি হয়ে বলল, 'লণ্ডনে থেকে আমার হাঁফ ধরে গেছে, মিস স্কট—যদিও লণ্ডন আমার কাছে স্বদেশের মতো প্রিয়। সলসবেরিতে যদি আমার বাড়ি থাকত, আমি রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ে লণ্ডন যাতায়াত করতুম।'

মিস স্কট বললেন, 'আমি হলে পারতুম না। বড্ড সকালে উঠতে হত।'

'বেশি রাত করে ঘুমোতে যান বুঝি?'

'না, এগারোটায়।'

'তা হলে আরেকটু সকাল সকাল ঘুমোতেন।'

'সলসবেরিতে থাকলে? হা হা। বাড়ি পৌঁছোতেই ন-টা বাজত। কাজ আর কাজ করতে যাওয়া, আর কাজ করে ফেরা। নিজের বলে একটু সময় থাকত না।'

'খুব খাটুনি বুঝি?'

'খুব। কিন্তু খাটতে আমার ভালোই লাগে। আবার মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে পালাতেও সাধ যায়। কিন্তু রোজ ট্রেনে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘেন্না ধরে যাবে বুঝি!'

'আজকেও ঘেন্না ধরে গেছে বুঝি!'

'বিলক্ষণ। ক্যাথরিনটা এমন করে দাগা দেবে কে জানত, বলুন। একসঙ্গে আসার সমস্ত ঠিকঠাক। আমি এলুম সলসবেরি, ও গেল ব্ল্যাকপুল।'

'বড়ো ভাবনার কথা বটে!'

'ঠাট্টা করছেন।'

'কে, আমি? না। আমি ভাবছিলুম আপনি কেন ব্ল্যাকপুল গেলেন না। সেও তো একসঙ্গে যাওয়া হত।'

'বা রে, আমি কী করতে ওদের সঙ্গে যাব?'

'বুঝেছি। ক্যাথরিন নেহাত নিঃসঙ্গ ছিল না। মাঝখান থেকে আপনিই নিঃসঙ্গ হলেন। কেমন?'

মিস স্কট এর উত্তরে নতমুখী হলেন। বললেন, 'আজ তো নিঃসঙ্গ নই। কাল কী হবে বলা যায় না।'

সোম কোমল কণ্ঠে বলল, 'বলা যায়। কালও নিঃসঙ্গ হবেন না।'

মিস স্কট নীরব। সোম বলল, 'ভালো কথা, আপনার উপর আমি রাগ করেছি।'

(চমকে উঠে) 'কেন?'

'অনুমান করুন।'

'করতে পারছি নে। সত্যি বলছি।'

'আমাকে শিম্পাঞ্জি বলেছেন।'

'শিম্পাঞ্জি বলেছি। কখন?'

'মাত্র একটিবার আপনি কথা বলেছেন ট্রেনে। মনে পড়ে না?'

'সত্যি আমার স্মরণশক্তি ভালো নয়। যদি ওকথা বলে থাকি তো ক্ষমা চাইছি।'

'আপনি বড্ড ভালোমানুষ। আমি হলে ক্ষমা চাইতুম না, বলতুম, শিম্পাঞ্জির মতো লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠা মানুষের পক্ষে প্রশংসার কথা।'

'বাস্তবিক। আপনার সাহসের সুখ্যাতি করতে হয়।'

'আবার ভালোমানুষি করলেন! আমি হলে সুখ্যাতি করতুম না। বলতুম ওটা একটা বেআইনি কাজ। চোর-ডাকাতের যোগ্য।'

'তাই তো। অন্যায় করে ফেলেছেন।'

'অন্যায় কীসের? প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সময় আমাকে একমিনিট আটকে রেখেছিল কেন? তারপর আমাকে দৌড়োতে বলেছিল কেন? ট্রেনেরই উচিত ছিল আমার জন্য দাঁড়ানো।'

‘আমারও তাই মনে হয়।’

‘কিন্তু তাতে অন্যান্য যাত্রীদের সময় নষ্ট হয়। তারা punctual হয়েও পস্তাবে, এটা কি ন্যায়সংগত?’

‘না, ন্যায়সংগত নয়।’

‘ন্যায়সংগত না হলেও ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে এক আধটা ব্যতিক্রম মন্দ নয়। ধরুন আমি যদি একজন স্থূলকায়া মহিলা হয়ে থাকতুম।’

মিস স্কট ভীষণ হাসতে লাগলেন। সোম তাঁকে আরেকটু হাসাবার জন্য বলল, ‘কিংবা ধরুন সত্যিকারের শিম্পাঞ্জি।’

মিস স্কট ক্লান্ত হয়ে বললেন, 'Oh, dear!'

ডিনারের পরেই কেউ শোবার ঘরে যায় না। অতএব ওরা বসবার ঘরে গিয়ে তাসখেলা দেখতে বসল। ওরাও খেলায় যোগ দিত, কিন্তু মিস স্কট ভালো খেলতে পারেন না বলে রাজি হলেন না এবং সোম এত ভালো খেলতে পারে যে খেলা জিতে অনেক টাকা পেত—সেটাও একজন বিদেশির পক্ষে ভালো দেখায় না।

কাজেই তারা নিঃশব্দে অন্যান্যদের ব্রিজ খেলার দর্শক হল। সোম একজনের হাত চেয়ে নিয়ে দেখলে ও তাঁর পরামর্শদাতা হল। মিস স্কট যে মেয়েটির dummy হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে প্রবৃত্ত হলেন।

খেলার সময় সময়জ্ঞান থাকে না। সোমের নেশা লেগে গেছিল। সে মিস স্কটের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়েছিল। প্রতিপক্ষের হাতে ক-টা ও কোন কোন রং আছে সেই কল্পনায় সে বিভোর। পরামর্শগ্রহীতার উৎসাহকেও তার উৎসাহ ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাঁর হার-জিত যেন তার নিজের হার-জিতেরও বেশি। তিনি হারলে সোমের মুখ দেখানো কঠিন হয়, সে যে পরামর্শ দিয়েছে। তিনি জিতলে সোম সবাইকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। বলে, ‘নিতে আজ্ঞা হোক।’

অবশেষে একসময় খেলার ব্যবধানে মিস স্কট সকলকে একসঙ্গে বললেন, ‘গুড নাইট।’ সকলে সবিনয়ে বলল, ‘গুড নাইট।’ দুটো একটা ভদ্রতার কথাও বলা হল। যেমন, ‘কালকে তো আপনাকে আমরা এই হোটেলে পাচ্ছি।’

মিস স্কট বিশেষ করে সোমকে ‘গুড নাইট’ না বলে চলে গেলেন। এটা সোমের মর্মে বিঁধল। তার আর খেলায় মন বসল না; রাত্রে মিস স্কটের সঙ্গে এই শেষ দেখা, একথা ভাবতে তার মন কেমন করছিল। অথচ সাড়ে দশটা বেজে গেছে, দেখা হবার সুযোগও আর ঘটবে না!

কিছুক্ষণ যাব কি যাব না করে সোমও বিদায় নিল। তার পরামর্শগ্রহীতা তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং প্রতিপক্ষের ভদ্রলোক ও মহিলা বললেন, ‘কাল আপনাকে সম্মুখ সমরে নামতে হবে কিন্তু।’ আর সেই যে মহিলাটি dummy হয়েছিলেন তিনি বললেন, ‘শুধু আপনাকে নয়, আপনার বন্ধুনিকেও।’

আমার বন্ধুনি! সোম দুঃখের হাসি হাসল! উপরে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, মুখ হাত ধুলো, চুলে বুরুশ লাগাল, পা মুছল। তারপর বিছানায় উঠে আলোটা নিভিয়ে দিল, অত্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল বলে তার বেশ ঘুম পেয়েছিল।

সোম চোখ বুজে ঘুমের প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ শুনল কে যেন টোকা মারছে—টুক টুক টুক। দরজায়, না দেওয়ালে? দেওয়ালে। কোন দেওয়ালে? সোম কান খাড়া করল। বিছানার পাশের দেওয়ালেই। টুক টুক টুক।

ওপাশের ঘরটা মিস স্কটের। মিস স্কট এখনও ঘুমোননি। দুষ্টু মেয়ে। আমাকে ফেলে পালিয়ে আসার কী দরকারটা ছিল! এতক্ষণ বুঝি আমার জন্যে জেগে থাকা গেছে?

সোম উত্তর দিল—ঠক ঠক ঠক। তার তো মেয়েমানুষের হাত নয়। তার আঙুলের আওয়াজ ঠক ঠক ঠক।

তার উত্তরে দেওয়ালের ওপরে শুধু যে টুক টুক টুক বেজে উঠল তাই নয়, দরজার ফাঁক দিয়ে হাসির শব্দ এল, খিল খিল খিল!

দুষ্টু মেয়ে। সারাদিন মুখে রা ছিল না। কী কপট গাম্ভীর্য! ট্রেনে সেই যে শিম্পাঞ্জি বলা তার পরে আর কথা নেই। হোটেলে ও পথে আমি যত কথা বলেছি উনি তার সিকিও বলেননি।

সোম কী উপায়ে আনন্দজ্ঞাপন করবে ভেবে পেল না। কতবার ঠক ঠক ঠক করতে থাকবে? জোরে হেসে উঠতে তার সাহস হচ্ছিল না। কেননা তার ঘরের একদিকে যেমন মিস স্কটের ঘর অপরদিকে তেমনি কোনো এক অপরিচিত জনের। মিস স্কটের ঘরটাই হোটেলের এই দিকের শেষ ঘর বলে মিস স্কটের ভয় ছিল না।

বিছানা ছেড়ে মিস স্কটের দরজায় টোকা মেরে তাঁকে ডাকবে? করিডরে কিছুক্ষণ পায়চারি করবে তাঁকে নিয়ে?

হায় রে দুর্ভাগ্য! সোম ড্রেসিং গাউন আনেনি। এই কাপড়ে বাইরে যাওয়া যায় না, বেড়ানো যায় না। মিস স্কট দেখলে নেহাত যদি মূর্ছা না যান একেলে মেয়ে বলে, তবু অন্য লোক দেখে ফেললে কী ভাববে, ভেবে 'দুর' 'দুর' করে তাড়িয়ে দেবেন।

বিছানার থেকে জানালা খুব কাছেই। এঘরের জানালা থেকে ওঘরের জানালাও খুব কাছে। সোম বিছানা ছেড়ে জানালার চৌকাঠের উপর বসল। বসে মিস স্কটের জানালার কাচের গায়ে টোকা মারল।

মিস স্কট ধড়ফড়িয়ে জানালার কাছে এলেন। সভয়ে বললেন, 'কে?'

উত্তর হল, 'শিম্পাঞ্জি।'

'শিম্পাঞ্জি? লাফ দিয়ে আসবেন না তো?'

'যদি আসি?'

'না, না' (মিনতির স্বরে)

'ভয় নেই, আমি চেষ্টা করলেও পারব না।'

মিস স্কট নীরব।

সোম ডাকল, 'মিস স্কট?'

উত্তর হল, 'ইয়েস?'

'পালিয়ে এলেন কেন?'

'ঘুম পাচ্ছিল বলে।'

'ঘুম আসেনি কেন?'

'ভাবছিলুম বলে।'

'কী ভাবছিলেন?'

'একজনের কথা।'

'ক্যাথরিনের কথা?'

'না।'

'আপনার boy-এর কথা?'

'Boy আমার নেই।'

'তবে কার কথা?'

'শিম্পাঞ্জির।'

'শিম্পাঞ্জির এত ভাগ্য!'

'ভাবছিলুম আজকের দিনটা কী অদ্ভুত।'

'আমিও তাই ভাবছিলুম।'

'আপনি খেলা ছেড়ে উঠে এলেন কেন?'

‘আপনি উঠে এলেন কেন?’
‘ওই যে বললুম ঘুম পাচ্ছিল।’
‘আমারও। আমি আজ ভোরে উঠেছি কিনা।’
‘আপনার কোথায় যেন যাবার কথা ছিল?’
‘গিল্ডফোর্ড।’
‘গেলেন না কেন?’
‘আপনিই বলুন।’
‘সলসবেরিতে নামলেন কেন?’
‘আপনাকে ওকথা ট্যাক্সিতে বলেছি?’
‘আপনি ভারি খারাপ লোক।’
‘আমাকে আপনার ভয় করছে?’
‘কারুকে আমার ভয় করে না।’
‘ধরুন যদি আমি লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকি?’
‘চীৎকার করে পাড়া মাথায় করব।’
‘যদি মুখ চেপে ধরি?’
‘কামড়াব।’
‘তবে তো আপনি শিম্পাঞ্জিকেও ছাড়িয়ে যান।’
‘আমি সব পারি।’
‘লাফ দিয়ে এঘরে আসতে পারেন?’
‘পারি। কিন্তু তার দরকার নেই।’
‘তবে আর রাত জাগেন কেন? ঘুমোতে যান।’
‘তাই যাই।’
‘যাবার আগে একবার হাতটা বাড়িয়ে দিন, বিদায় ঝাঁকুনি দিন।’

মিস স্কট হাত বাড়িয়ে দিলেন। সোম খপ করে মুখের কাছে টেনে নিল। সোম চুম্বন করতেই মিস স্কট অগ্নিপৃষ্ঠের মতো ঝপ করে কেড়ে নিলেন।

সোমের সংকল্প অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হল। সে মেয়েটির সঙ্গে শেষপর্যন্ত এল, মেয়েটিকে প্রকারান্তরে চুম্বনও করল। সে আজ উঠে কার মুখ দেখেছিল? তখন কি ভাবতে পেরেছিল দিনটি এমন সুখের হবে? সোম সাধারণত যা করে না তাই করল। সেই ভগবানকে স্মরণ করল যিনি সুখীর ভগবান, সার্থকের ভগবান। দুঃখের দিনে আমিই আমার বন্ধু, সুখের দিনে তিনি আমার অতিথি।

৬
শেষের দিনের শেষ

কফি খাওয়া আর ফুরোয় না। একবার চুমুক দেয় তো দশ মিনিট ভাবে। থেকে থেকে মুচকি হাসি হাসে। যেন শক্ত চাল চেলেছে। তবু কোনো চালেই কিস্তিমাত হয় না। নতুন করে চাল চালতে হয়।

এমনি করে সময় যায়! কফিও জুড়িয়ে কাদা। দু-জনের ধ্যান ভাঙিয়ে দিয়ে হিল ঘরে ঢুকে বলে, 'আরও কিছু দিয়ে যেতে হবে, ম্যাডাম?'

পেগি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়।

'স্যার?'

সোম বলে, 'না, ধন্যবাদ।'

তখন কফির ভুক্তাবশেষ স্থানান্তরিত করে হিল বলে, 'তবে কি আমরা বিশ্রাম করতে যেতে পারি?'

সোম পেগির মুখে তাকায়!

পেগি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কথা বললে যদি তার ভাবনার খেই হারিয়ে যায়।

হিল bow করে বলে, 'গুড নাইট, ম্যাডাম। গুড নাইট, স্যার।'

অগত্যা পেগিকেও বলতে হয়, 'গুড নাইট, মিস্টার হিল।' সোম তো বলেই।

বাড়ির সকলে ঘুমোতে গেল। পাড়ার সকলে ঘুমিয়ে। এগারোটা বেজে গেছে। ছোটো গ্রামের পক্ষে সেটা অনেক রাত। চারিদিক নিঝুম।

সামনে যে ছোটো টেবিলটা ছিল তার উপর দুই হাতে মুখ ঢেকে পেগি নিদ্রার আয়োজন করল। তার চোখ দু-টি ঢুলুঢুলু, তবু হাসি হাসি। তার চুলগুলি আলুথালু, গালের উপর মুখের উপর পড়েছে। ডান হাত দিয়ে বাম বাহুকে ও বাম-হাত দিয়ে ডান বাহুকে জড়িয়ে ধরে পেগি মাথা গুঁজল।

এই তার রণকৌশল। এই তার ব্যূহরচনা। সোমের সাধ্য কী যে তাকে স্থানচ্যুত করে!

যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারের সামনে দুটো পায়াকে পেগি দুই পা দিয়ে লতার মতো করে জড়াল। সোম যদি তার হাত ধরে টানাটানি করে কৃতকার্য হয় তবু চেয়ারকে উলটে না ফেলে বিকট আওয়াজ না করে কার্পেটে আঁচড় না লাগিয়ে তাকে নড়াতে পারবে না। তার আগে হিল-দম্পতির ঘুম ভাঙবে, বাড়িতে চোর পড়েছে ভেবে তারা পাড়ার লোককে ডাক দিয়ে জাগাবে, সোমের অবস্থা হবে সঙিন এবং পেগির মুখ হবে রঙিন। তখন যা হয় একটা মিথ্যে ঘটনা বানিয়ে বলা যাবে।

পেগির তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় সোম আচমকা উঠে দাঁড়াল এবং পেগির উদ্দেশে 'গুড নাইট' বলে লঘু পদপাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপরতলায় তাদের ঘর। সোম মোমবাতিটা জ্বেলে দিয়ে ম্যান্টলপিসের উপর রাখল। এসব অঞ্চলে ইলেকট্রিকের চলন হয়নি।

হঠাৎ বিছানার দিকে চেয়ে তার চক্ষু চড়কগাছ। একটিমাত্র খাট—তাতে দু-জনের চারটে বালিশ। দুপুর বেলা ঘর দেখতে এসে সোম হিলকে বলেছিল, 'এই বড়ো খাটটা বের করে নিয়ে এর জায়গায় দুটো ছোটো খাট পেতে দিতে পারবে?' হিল বলেছিল, 'এত বড়ো খাটকে দরজা দিয়ে বের করা যায় না, স্যার। মিস্ত্রি ডেকে পায়াগুলো খোলাতে হবে।' সোম বলেছিল, 'তা হলে এই সোফাটাকে সরিয়ে এর জায়গায় একটা ছোটো খাট পাততে হবে।'

হিল কথা রাখেনি। হিলের বউ দু-জনের বিছানা একসঙ্গে করা সোজা এবং স্বাভাবিক বলে তাই করে রেখেছে। সোম অতি কষ্টে বিরক্তি দমন করে সোফার উপর গোটা দুই বালিশ ও একখানা চাদর সহযোগে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র শয্যা রচনা করল। নতুবা পেগির কাছে মুখ দেখানো যায় না। পেগি ভাববে, বিশ্বাসঘাতক! কুচক্রী!

সোম কাপড় ছেড়ে মুখ ও মাথা ধুয়ে চুলে ব্রাশ দিয়ে সংকীর্ণ সোফাটিতে কায়ক্লেশে গা এলিয়ে দিল। মোমবাতিটি নিভিয়ে দিল না। যদি পেগি এসে অন্ধকারে দেশলাই না খুঁজে পায়।

সোমের ঘুম আসছিল না। তার দেহমন পেগির আসার অপেক্ষা করছিল এবং পেগির দেহমনকে আয়ত্তের মধ্যে পাবার উপায় উদ্ভাবন করছিল। তার কামনা বাগ মানছিল না, তবু তার আত্মসম্মানবোধ তীব্রতর হয়েছিল। পেগিকে সে আততায়ীর মতো আক্রমণ করবে না, বাঞ্ছিতের মতো অধিকার করবে—এই তার মনস্কামনা। কিন্তু পেগি এত বিমুখ কেন? আনন্দটা কি পেগির ভাগে কিছু কম পড়বে? কিংবা পেগি একটু খোশামোদ চায়, হাতে-পায়ে ধরে রাজি করানো, আত্মহত্যার ভয় দেখানো—সাধারণ কামুকদের যত কিছু উপচার?

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ? পেগির? সোম চট করে চোখ বুজল, গভীর নিদ্রার অভিনয় করতে হবে, পেগি জানুক যে সোম তার জন্যে কেয়ার করে না, পেশাদার প্রেমিকের মতো জাগে না।

পেগি কপাটে দু-বার টোকা মারল। সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকল, জানালাটাতে ফাঁক ছিল, সযত্নে বন্ধ করে দিল। তখনও মোমবাতি মিটমিট করছিল। তার নির্বাণোন্মুখ অবস্থা। তারই আলোয় দেখল সোম সোফায় শুয়ে। খাটের দিকে চেয়ে দেখে বিরাট খাট। তাতে অনায়াসে দু-জনকে ধরে। এত বড়ো প্রলোভনকে উপেক্ষা করে সোম সোফায় কোনোমতে আড়ষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে।

ঠিক ঘুমিয়ে তো? পেগি দুষ্টুমি করে মোমবাতিটি সোমের মুখের উপর তুলে ধরল। এক ফোঁটা গলানো মোম সোমের কপালের উপর টলে পড়ল, সোম একটুও 'উঁহু' করে উঠল না। কেবল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করল। পেগি সযত্নে ও সখেদে ওটুকু জমাট মোম সোমের কপাল থেকে নখ দিয়ে খুঁটে নিল।

বাতি যথাস্থানে রেখে সে সসংকোচে কাপড় ছাড়তে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল পাছে সোম খসখস শব্দ শুনে চোখ মেলে চায়, দেখে ফেলে।

সোম দু-বার খক খক করে কাশল। পেগি ত্রস্ত হয়ে এক ফুঁয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিল। সোম পাশ ফিরল। তার ঘুম ভাঙবার মুখে। পেগি শশব্যস্ত হয়ে কাপড় ছাড়া শেষ করল।

সোম সহজ সুরে বলল, 'বাতিটা নিবিয়ে ভালো করনি, পেগ। আমার চোখ তোমাকে দেখছে, তোমার চোখ টের পাচ্ছে না।'

পেগি লজ্জায় মরে গিয়ে বলল, 'তুমি ঘুমোওনি?'

'না।'

'আমি যখন এলুম জানতে পেরেছিলে?'

'নিশ্চয়।'

'তবে তোমার কপালে মোমের ফোঁটা পড়ে যাওয়াও অনুভব করেছ?'

'ভাবছিলুম তুমি ইচ্ছে করে ফেলেছ।'

'না গো, সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে ফেলিনি।'

'ইচ্ছে করে ফেলেছ ভেবে আমি কত খুশি হয়েছিলুম পেগ। আমার দেশে বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেয়। আমার যদি এদেশে একটি বোন থাকত।'

'বেশ তো! আমিই তোমার বোন হব।'

'কখনো না।'

'তবে কী হব?'

'স্ত্রী।'

'এখনও তোমার সেই খেয়াল আছে?'

'প্রবলভাবে আছে, পেগ।'

পেগি এতক্ষণে বিছানায় আরাম করে শুয়েছিল। লেপটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে সোমকে বলল, 'বেচারা সোম। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

সোম বলল, 'হঠাৎ?'

'তুমি সোফায় শুয়ে কষ্ট পাচ্ছ। একটা মোটা কম্বলও নেই গায়ে দেবার। শীতে কাঁপবে।'

'তা বলে তুমি তো তোমার সুখশয্যায় ঠাঁই দেবে না।'

'দিতুম, যদি ভাই হতে।'

'চাইনে ঠাঁই, যদি ভাই হতে হয়।'

'সারারাত কষ্ট পাবে?'

'সারারাত কষ্ট পাব আর ভাবব মিথ্যা সম্বন্ধ পাতিয়ে সত্য সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করিনি।'

'একটা রাতের জন্যে এত সত্যসন্ধ হবে? কাল এতক্ষণে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়, সোম?'

'ভগবান জানেন। আমি আশা ছাড়ব না।'

'নিজেকে ভোলাতে চাও তো ভোলাও। কিন্তু নির্বোধ তুমি, এমন গরম এবং নরম বিছানা হারালে!'

সোম কথা কইল না।

পেগি বলল, 'ঘুমোলে?'

'না।'

'আমারও ঘুম আসছে না।'

'আমার ভয়ে? আমি অভয় দিচ্ছি পেগ, নিদ্রিতা নারীকে আমি আক্রমণ করব না।'

'সোম।'

'কী?'

'আমার মাথার কাছে বোসো এসে।'

'হঠাৎ?'

'এমনি।'

'পূর্বরাগ বুঝি?'

'দূর।'

'তবে আমি যাব না।'

'এসো, লক্ষ্মীটি।'

সোম সোফা ছেড়ে পেগির শিয়রে বসল। পেগি তার একটি হাত টেনে নিয়ে মুখে ছোঁয়াল। বলল, 'ডারলিং।' কিছুক্ষণ কেটে গেল। তখন পেগি বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবে?'

'তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারি?'

'বলো আমার ওপরে তোমার শ্রদ্ধার কণামাত্র বাকি আছে?'

'কেন ওকথা জিজ্ঞাসা করলে?'

'তুমি বলো আগে।'

'তুমি আগে বলো।'

'এই ধরো তুমি আমাকে কাপড় ছাড়তে দেখলে। (লজ্জায় মুখ ঢেকে) ছি ছি ছি।'

'তার জন্যে যদি অশ্রদ্ধা করতে হয় তবে বলতে হয় কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করে না।'

'করে না, সে তো জানা কথা।'

'আমি এমন অনেক স্বামীর নাম করতে পারি যারা তাদের স্ত্রীদের দেবতার মতো ভক্তি করে।'

'তা হলে বলতে হবে তারা এক ঘরে রাত কাটায়নি।'

'Silly! তাদের ছেলেপুলে আছে।'

'তা হলে দেবতার মতো ভক্তি করাটা লোক দেখানো।'

'না গো, তা নয়। সমুদ্রে আমরা সাঁতার কাটি বলে, সমুদ্রকে কম ভক্তি করি নে। দেহও সমুদ্রের মতো প্রাকৃতিক বিস্ময়। তাকে দেখে আনন্দ, স্পর্শ করে আনন্দ, সর্বাঙ্গে অনুভব করে আনন্দ।'

'আমার বিশ্বাস হয় না। ধরো আজ যদি আমি নিজেকে দিই কাল তুমি ভাববে ওর মধ্যে রহস্য কী আছে! রহস্য না থাকে তো শ্রদ্ধা করবে কেন?'

'এক দিনে কি একজনকে নিঃশেষ করতে পারা যায়?'

'এক দিনে না হোক দশ দিনে, বিশ দিনে, এক বছরে, দু-বছরে?'

'দু-বছর আমার ভক্তি পেয়েও তোমার তৃপ্তি হবে না, পেগ?'

'না, সোম। আমার দাবি সারাজীবন।'

'দু-বছর পরে দেখবে আমার ভক্তি পাও বা না পাও তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তখন তোমার অন্য কোনো ভক্ত পাওয়া গেছে যার ভক্তি পেয়ে স্বর্গসুখ, না পেলে যন্ত্রণা।'

'তবু আমি জীবনে একবারমাত্র বিয়ে করব, দু-বছর অন্তর একবার না।'

'ওটা তোমার জেদ। যুক্তিসহ নয়।'

'কিন্তু থাক, এ নিয়ে তর্ক করব না। তুমি যখন সেই মানুষ নও যে আমাকে চিরকালের মতো বিয়ে করবে ও শ্রদ্ধা করবে তখন আমি সেই মানুষের খাতিরে আজ তোমার হাত থেকে আত্মরক্ষা করব।'

সোম এতক্ষণ পেগির চুলগুলি নিয়ে খেলা করছিল। কঠিন হয়ে বললে, 'এই তোমার মনের কথা?'

'এই আমার মনের কথা।'

'আমার মনের কথা তোমাকে বলি। আমি গভীরভাবে প্রগাঢ়ভাবে সত্য করে ভালোবাসতেও পারি, এবং ভালোবাসার ধনকে ভক্তি না করে পারিনে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি দু-বছর পরে না থাকে গভীরতা না থাকে গাঢ়তা। ভক্তি থাকে, মমতা থাকে, শুভকামনা থাকে। আমার ভূতপূর্ব প্রেমিকারা প্রত্যেকে আমার প্রিয় বন্ধু।

'কখনো কারুকে সর্বস্ব দিয়েছ?'

'দিতে চেয়েছি।'

'দেওয়া এবং দিতে চাওয়া এক জিনিস নয়, সোম। যদি দিতে তবে দেখতে জীবনে যেমন একবারমাত্র প্রাণ দেওয়া যায় তেমনি একবারমাত্র প্রেম দেওয়া যায়। দিয়ে বড়ো কিছু বাকি থাকে না সোম, যে দু-বার করে দেবে।'

সোম পেগির গালের উপর গাল রাখল। বলল, 'এ তত্ত্ব ঠেকে শেখা না দেখে শেখা?'

'দেখে শেখা নিশ্চয়ই নয়। কেননা সংসারে প্রাণ যদিও দিতে পারে লাখ জন, প্রেম দিতে পারে—সর্বস্ব দিতে পারে—লাখে এক জন। ঠেকে শেখাও নয়। এখনও আমার জীবনের পরম লগ্ন আসেনি।'

'কখনো কাউকে ভালোবাসোনি, পেগ?'

'কতবার কতজনকে ভালোবেসেছি। এই যেমন তোমাকে আজ ভালোবেসেছি। কিন্তু কখনো এমন প্রেরণা পাইনি যে ভালোবাসার জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেব—ভালোবাসার জনের কাছে সাড়া পাই বা না পাই। আজ যেমন তোমার কাছে শ্রদ্ধা পাবার কথাটাই বড়ো হয়ে মনে জাগছে এমনি কিছু-না-কিছু একটা পাবার কথাই প্রত্যেক বার বড়ো হয়ে মনে জেগেছে, সোম।'

সোমের কামনা ইতিমধ্যে মন্দ হয়ে এসেছিল। সে অভিভূত হয়ে পেগির মনের কথা শুনছিল। বলল, 'প্রার্থনা করি পেগ, তোমার জীবনে সেই পরম লগ্নটি যেন আসে। আমরা তোমার অকালের প্রেমিকরা তোমাকে তালিম করে রেখে গেলুম, যিনি যথাকালে আসবেন তিনি তৈরি জিনিসটি পাবেন।'

পেগি বলল, 'এখন থেকে তা হলে ভাই হবে?'

সোম বলল, 'এখন থেকে তা হলে ভাই হব।'

পেগি সোমের গালে ঠোনা মেরে বলল, ‘ওঠো, যাও, বালিশ দুটো সোফা থেকে নিয়ে এসো।’

এক বিছানায় শোওয়ার উত্তেজনায় দু-জনের কারুরই ঘুম আসছিল না। বারংবার পাশ ফেরা, উশখুশ করা। একজন লেপটাকে পা অবধি নামাতে চায়, অন্যজন বুক অবধি উঠোতে চায়। সোম বলে, ‘বড়ো গরম।’ পেগি বলে, ‘বড়ো শীত।’ আসল কারণ অবশ্য সোমের হৃদয়ের তাপাধিক্য, পেগির নারীসুলভ লজ্জা।

পেগি বলল, ‘সোম ডিয়ার, তোমার মনে কি বড়ো কষ্ট হয়েছে?’

সোম বলল, ‘অত্যন্ত। তুমি তো জানতে না, ডারলিং, আমার মনের আকাশে কত কত কুসুম ফুটিয়েছিলে। জীবনে আমি কারুকে প্রাণ ভরে পাইনি, পেগ, তোমাকেও পেলুম না!’

পেগি সোমের গোঁফের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘বেচারা সোম!’

সোম বলল, ‘শুনে রাগ কোরো না, পেগ। তোমার স্পর্শ এখন বিষের মতো লাগছে। যদিও তুমি আমার বোন।’

পেগি হাত সরিয়ে নিল না। আরও নরম সুরে বলল, ‘দু-একদিন বিষের মতো লাগবেই, সোম। কিন্তু তারপর থেকে সহজ লাগবে। তোমাকে আমি রান্না করে খাওয়াব, বনভোজনে নিয়ে যাব, তোমার বাসায় এসে তোমার ঘর সাজিয়ে দেব, জিনিস গুছিয়ে দেব। তুমি আমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে, তোমার টাকাকড়ির হিসাব দেবে, তোমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা শোনাবে।’

সোম বলল, ‘স্ত্রীর সাধ বোনে মেটে না। বোন তো আমার কিছু না হোক বিশটি আছে।’

(সাশ্চর্যে) ‘বিশটি!’

(সহাস্যে) ‘সহোদরা গুটি তিনেক। তোমরা যাকে কাজিন বল আমরা তাকে সহোদরার সামিল জ্ঞান করি। তেমন বোন ডজন খানেক। তারপর পাতানো বোন রাশি রাশি। তাদের মধ্যে বাছা বাছা জন পাঁচেক সহোদরার মতো প্রিয়।’

‘তবে আমি তোমার একবিংশতমা। তোমার ষষ্ঠী নই।’ এই বলে পেগি হাসল।

‘ষষ্ঠী হলে তোমার সপত্নী থাকত না, অদ্বিতীয়া হতে। একবিংশতমা হয়ে অন্য বিশজনের চেয়ে একটুও বেশি পাবে না স্নেহ।’

এই বলে সোম গলাটা পরিষ্কার করল।

পেগি বলল, ‘ঘুম তো আজ হবে না, সোম। তোমার পঞ্চকন্যার কাহিনি বলো।’

সোম বলল, ‘তাহলে সত্যি সত্যি রাত পোহাবে।’

‘পোহাক। এই রাতটি সারাজীবন তোমার মনে থাকবে, আমারও। এই নিয়ে একদিন তুমি একটা গল্প লিখতেও পার।’

‘গল্প আমি লিখতে ভালোবসি নে, পেগ, live করতে ভালোবাসি। আমি জীবনশিল্পী, অপরে আমার জীবনীকার হোক।’

‘আবার সেই অহংকার?’

‘অহংকার যার নেই সে হয় ভন্ড, নয় ক্লীব। তবে অহংকারকে মেরুদন্ডের মতো ঢাকা দিতে হয়। নইলে কঙ্কালসার দেখায়।’

পেগি সোমের বুকের পরে মাথা রেখে বলল, ‘এবার তোমার গল্প বলো।...লাগছে?’

সোম বলল, ‘লাগবে না? হাড় যে। তোমাদের মতো মাংস নয় তো।’

পেগি লজ্জায় শিউরে উঠে একটি বালিশ নিয়ে নিজের মাথার নীচে ও সোমের বুকের উপরে রাখল। বলল, ‘এখন কেমন লাগছে?’

‘এখন লাগছে রামমূর্তি পালোয়ানের মতো।’

‘বেশ এবার বলো তোমার প্রথম প্রেমের গল্প।’

'কোনটা যে প্রথম প্রেম তা ঠিক বলতে পারব না, পেগ। কেননা প্রথম প্রেম মানুষের অনেকগুলোই হয়ে থাকে। পাঁচ বছর বয়সেও আমার একটি প্রেমিকা ছিল। freud না পড়লে জানতুম না যে ও আমার প্রেমিকা।'

পেগি বলল, 'Freud একজন দৈবজ্ঞ বুঝি? তোমার হাত দেখে বলে দিলেন ও তোমার প্রেমিকা।'

সোম তার কান মলে দিয়ে বলল, 'মুখখু! Freud-এর নাম শোননি।'

পেগি বলল, 'আমি যে বিদুষী নই সে তো বলেইছি। লণ্ডনে গিয়ে তোমার ছাত্রী হব। কী বল?'

সোম বলল, 'গল্পটা বলতে দাও। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স আমার জীবনের প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ও-যুগের প্রেমগুলো গবেষণার বিষয়। আমার জীবনীকারের জন্য তোলা রইল। প্রেম করেছি এই যথেষ্ট, তাকে মনে রাখবার মতো অধ্যবসায় আমার নেই। যে প্রেমিকাটিকে অনায়াসে মনে পড়ছে তাকে ছোটোবেলায় অজস্র মার দিয়েছি, তাকে নিয়ে শখের মাস্টারি করেছিলুম কিন্তু সে যখন বারোয় পড়ল তখন আমাদের গরম দেশের প্রকৃতির চক্রান্তে সেই হয়ে উঠল অপূর্ব লোভনীয়।'

পেগি বলল, 'ওমা, বারো বছর বয়সে?'

সোম বলল, 'গরম দেশের দস্তুর ওই। ও দেশের হাওয়াতে মদ, আকাশে জাদু। তুমি আমি এক বিছানায় শুয়েও নিষ্পাপ আছি একথা যদি ওদেশের কাউকে বলি সে বলবে, 'আমাকে গাঁজাখোর ঠাওরেছ?'

পেগি বলল, 'অকারণে নিজেদের দেশের নিন্দা কোরো না, সোম। এদেশেও ঠিক ওই কথাই বলবে। নেহাত অন্যায়ও বলবে না, কেননা তোমার মতো ক-টা পুরুষ এদেশে আছে যে তোমার মতো জিতেন্দ্রিয়? এদেশের পুরুষগুলো সুন্দরী নারী দেখলে ভারি অনুগত হয়ে পড়ে, সোম। এত অনুগত হয়ে পড়ে যে যতক্ষণ না মিষ্টান্নের মতো মুখে পুরছে ততক্ষণ ছাড়ে না। অবশ্য এও মানতে হবে যে ভদ্রতার খাতিরে বিয়ে করেও বিয়ে করবার পরে বুনো না হওয়া অবধি অবিশ্বাসীও হয় না।' তার শেষ কথাগুলিতে শ্লেষের আমেজ ছিল। সোম হাসল।

সোম বলল, 'তোমার পাঁঠা তুমি যেমন করেই কাট, আমি কিছু বলব না। তোমার দেশ সম্বন্ধে তোমার মত হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার ওই ধারণাটা ভুল যে আমি স্বভাবত জিতেন্দ্রিয়। আমার চতুর্থ প্রেমের গল্পটা আগে বলব কি?'

'না, না, না, পরে বোলো।'

'তবে আমার সেই দ্বাদশবর্ষীয়া প্রিয়ার কথা বলে শেষ করি। সে যখন লোভনীয়রকম সুন্দরী হয়ে উঠল তখন আমার কাছে আসা ছেড়ে দিল। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের স্বভাবত ভয় আছে বলেই হোক কিংবা দূরত্বের দরুনই হোক আমি যখন তাকে মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে তার বন্ধুনির বাড়ি যাওয়া-আসা করতে দেখতুম তখন আমার প্রথম বয়সের দুষ্টু ক্ষুধা বোবা হয়ে থাকত, আমি তার সঙ্গে কথা কইবার সাহস খুঁজে পেতুম না, পাছে কী বলতে কী বলে ফেলি।'

পেগি রঙ্গ করে বলল, 'এদিকে আমার সঙ্গে তো তর্কপঞ্চানন বাক্যবারিধি।'

সোম বলল, 'কতবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার অপেক্ষায়। ভেবেছি আজ সে যখন তার সইয়ের বাড়ি থেকে ফিরবে, আমি বলব, 'একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে?' কিন্তু সে পাশ দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেছে, আমি পাষাণের মতো নির্বাক। তারপরে ঘরে ফিরে এসে পরদিনের বক্তৃতা তৈরি করে রেখেছি।'

পেগি বলল, 'আমার জন্যে তৈরি করেছ?'

সোম বলল, 'করেছি বই কী। যে-দিন প্রথম দেখা হয় সে-দিন। কিন্তু গল্পটা শোনো। একদিন আমি কপাল ঠুকে প্রতিজ্ঞা করে ফেললুম যে আজ তাকে মনের কথা বলবই। সেদিন সত্যি সত্যিই সে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনল। বললুম, 'তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর। আমার বোনগুলো তোমার তুলনায় পেতনির মতো দেখতে।' (পেগির হাস্য) এখন, তার সঙ্গে আমার বোনদের রেষারেষির ভাব স্বভাবতই ছিল। আমার একটি বোন তো আক্ষেপ করে বলতই, 'দাদা নিজের বোনদের দেখতে পারে না, পরের

বোনদের আদর করে।' (পেগির হেসে গড়িয়ে পড়া) যাক, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করল। একটু যদি ধৈর্য ধারণ করতুম তবে সেদিনকার ঘটনা ও আমার জীবন অন্যরকম হত। কিন্তু সৌভাগ্যে অস্থির হয়ে তাকে যেই বুকে টেনে এনেছি সে ভাবল আমি তাকে কাতুকুতু দিতে যাচ্ছি। সে 'মা গো' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিল এক দৌড়।'

পেগি হাসির চোটে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ও ডিয়ার!' তার চোখের কোণে জল জমে উঠেছিল।

সোম বলল, 'তার পরে আমি প্রেমে পড়া ছেড়ে দিয়ে বই পড়া নিয়ে খেপে গেলুম। ও বয়সে মানুষের হাজারো দিকে আকর্ষণ। ভাঙা হৃদয় ও ভাঙা হাড় দু-দিনে জোড়া লাগে। আর ওটা তো হৃদয়গত ব্যাপার ছিল না, ছিল শৌখিন দেহগত। (থেমে) দেহগত বলে এখন মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তখন কি তাই ছিল? কী জানি। অতীতকাল সম্বন্ধে আমরা অসংকোচে অবিচার করে থাকি, পেগ।'

পেগি বলল, 'আমার তো অতীতকালই নেই। আমার কাল নিত্য প্রবৃত্ত বর্তমান।'

'তুমি তাহলে একটা গোরু কি গাধা।'

'অমন কথা বললে তো তোমাকে আস্ত খেয়ে ফেলব।'

'কী দিয়ে খাবে? দাঁত দিয়ে তো? তোমার ওগুলো আসল দাঁত, না বাঁধানো দাঁত?'

'কয়েকটা বাঁধানো। সত্যি, সোম, তোমার দাঁতের মতো দাঁত এদেশে হয় না। প্রথম দিনেই তোমার দাঁত দেখে আকৃষ্ট হয়েছি।'

'কিন্তু এমন একসময় ছিল যখন আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছিল। চুল পড়ে যাচ্ছিল, দু-একটা পাকা চুলও দেখা দিয়েছিল। চোখে জ্যোতি ছিল না, দেহ ছিল অবসাদগ্রস্ত। সেই সময় আমার জীবনে এলেন আমার দ্বিতীয় বাঞ্ছিতা। দেহে এতটা শক্তি ছিল না যে তাঁকে দেহ দিয়ে কামনা করব। তাই স্বভাবত আমি হলুম অশরীরী প্রেমিক—যাকে পন্ডিতেরা বলেন platonic lover, তা-ছাড়া উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলেরা কেন কী জানি দেহের নাম শুনলে কানে আঙুল দেয়।'

পেগি রঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি?'

'হাঁ গো, তাই। কোন এক কাল্পনিক মানসীর পায়ে তাদের জীবন-মরণ বাঁধা। আমার মানসী একদিন তাঁর মার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এলেন। তাঁরও তেমনি মুমূর্ষুর চেহারা! রোগের পান্ডুরতাকে আমি মনে করলুম অন্তরের আভা। পরিচয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি তাঁর সঙ্গে Rossetti-র কবিতা Blessed Damozel পড়লুম! জান কবিতাটা?'

'আমি কবিতা ভালোবাসি নে।'

'কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রিয়া ভালোবাসতেন। স্বয়ং মিসেস ব্রাউনিঙের মতো চেহারা তাঁর। নিজেও কিছু ছাইপাঁশ লিখেছিলেন। কাজেই কাব্যচর্চাটা মন্দ জমল না। তারপরে তিনি চলে গেলেন আমাকে বেকার করে দিয়ে। আমার চিঠির জবাবে যেদিন তিনি আমার মাকে চিঠি লিখলেন আমার উল্লেখ করে সেদিন আমার সাধ গেল সে চিঠিখানাকে ছবির মতো বাঁধিয়ে রাখি। পরে তিনি আমাকে পোস্টকার্ড লিখে দাঁতের ব্যথায় সহানুভূতি জানিয়েছিলেন, তাই নিয়ে আমি এত উত্তেজিত হয়েছিলুম যে পাছে চিঠিতে জানালে তাঁর আত্মীয়দের হাতে পড়বে তাই মাসিকপত্রে কবিতায় জানালুম। সে কবিতা তাঁর চোখে পড়ল কি না জানিনে, মনে অশরীরী উন্মাদনা সঞ্চার করল কি না তাও জানিনে। কিন্তু একথা জানি তাই পড়ে আরেকটি মেয়ে আমার প্রেমে পড়ে গেল।'

পেগি বলল, 'কী রোমান্টিক! কিন্তু সত্যি তো?'

সোম বলল, 'সত্যি। মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখে এমন শ্রদ্ধা জানাল যেমনটি আমাকে কেউ কোনোদিন জানায়নি। শ্রদ্ধা দাঁড়াল প্রেমে। চেহারা না দেখে প্রেম—তবু যেন সে আমাকে জন্মজন্মান্তরে দেখে এসেছে। আমি যত জানাই আমার রং কালো, আমার শরীর জীর্ণ, আমার দাঁত কনকন করে, আমার টাক পড়তে

আরম্ভ করেছে, তার প্রেম তত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে কী বিনয়, কী মহত্ত্ব, দেহের প্রতি কবি-তপস্বীর কী অনাস্থাভাব! আমি যতই বলি আমার হৃদয় আমার মানসীকে দেওয়া, আমার সেই চোখে দেখা মুমূর্ষু মানসীকে, ততই আমার তৃতীয় প্রিয়া আমাকে রূপ দিয়ে জয় করতে বদ্ধপরিকর হয়। তার ফোটো আসতে লাগল প্রত্যেক ডাকে। রূপসি বটে। কিন্তু আমি কি দেহের রূপে ভুলি? আমি বলি 'আর কাউকে দেহ দান করো, আমাকে ধ্যানভ্রষ্ট কোরো না।' তার উত্তরে সে তার প্রতিজ্ঞা জানায়। 'তোমাকেই দেব, অপরকে না'।'

পেগি রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলল, 'তার পরে?'

'তারপরে এই আলোছায়ার খেলা চলল প্রতিদিনের ডাকে। আমি পালাই, সে পিছু নেয়। আমি ঘৃণা করি, সে শ্রদ্ধার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। সে এক মজার খেলা, তার তুলনায় ফুটবল হকি টেনিস কিছু নয়। আমার যেটুকু শারীরিক সামর্থ্য ছিল সেটুকু গেল। আমি একজনের উদ্দেশে লিখি কাঁদুনি-কবিতা, অপরজনকে লিখি উপদেশাত্মক চিঠি। ক্লাস পালিয়ে অপথে বেড়াই, রোজ রাত্রে ফুল তুলে বিছানায় ছড়াই, রামধনু রঙের পোশাক পরি, বাবরি চুল রাখি। বন্ধুদের সঙ্গে মিশি নে, সবাইকে ভাবি ঘোরতর সংসারী, শেলির পক্ষ নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্তদের সঙ্গে লড়াই করি। সে এক বয়স গেছে!'—এই বলে সোম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

পেগি বলল, 'বেশি দিন আগে তো নয়, মাত্র কয়েক বছর আগে।'

সোম বলল, 'মাত্র কয়েক বছর? যুগান্তর! এক একটি মাসে এক একটি বছর বাড়ে। সেই দু-টি বছরের আমি নিজেকে ক্রমে ক্রমে সকলের সমবয়সি ভেবেছি—যুবকের, প্রৌঢ়ের, বর্ষীয়ানের। সকলের সম্বন্ধে ভেবেছি—রবীন্দ্রনাথের, গ্যেটের, শেক্সপিয়রের। হয়তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর সেই দু-টি। তোমার তেমন কোনো বছর নেই?'

'আমার শ্রেষ্ঠ বছর প্রতিবছর, শ্রেষ্ঠ দিন প্রতিদিন।'

সোম বলল, 'পাখিদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও সেই কথা বলত। তুমি একটা নাইটিংগেল কি লার্ক।'

পেগি পুলকিত হয়ে বললে, 'যাও!'

সোম বলল, 'গোরু কি গাধা বললে রাগ কর, নাইটিংগেল কি লার্ক বললে খুশি হয়ে ওঠ—পশুর চেয়ে পাখি বড়ো হল কীসে? পন্ডিতেরা বলেন পাখিদের তুলনায় পশুরা আমাদের নিকটতর কুটুম্ব।'

'তা বলুন। পশুদের মধ্যে কুকুরই যা মানুষের মতো, সিংহকেও শ্রদ্ধা হয়, বাকিগুলো নিতান্তই জানোয়ার।'

'তোমাকে কুকুর বললে তুমি খুশি হবে?'

'যদি বল 'terrier' কি 'greyhound' কি 'sheep dog' তা হলে খুশি হব। এমনকী যদি 'pekinese' বল তাহলেও কিছু মনে করব না, যদিও অত ছোটো কুকুর আমার পছন্দ হয় না। যে কুকুর বল সেই কুকুর হতে রাজি আছি কিন্তু পুরুষ কুকুর। মেয়ে কুকুর না।'

'স্বজাতির প্রতি এত অবজ্ঞা?'

'লুকিয়ে কী হবে বল? পুরুষরা আমাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য যে মহিমা যে সুধা দেখে আমাদের তা নেই। বরঞ্চ পুরুষদের মধ্যে তা থাকতে পারে।'

'আমার মধ্যেও?'

'তুমি কারুর চেয়ে ছোটো নও, সোম।'

'তবু তো তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে।'

'তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি। আমি তোমার সব লোকসান পুষিয়ে দেব, এদেশে যতদিন থাকবে তোমার সঙ্গিনী হব, ঘরনি হব, সোম। তুমি আমাদের বাড়ি উঠে এসো এবার, তোমার ওই ল্যাণ্ডলেডিকে ইস্তফা দিয়ে! মা তোমাকে পেয়ে খুশিই হবেন।'

'তোমার বাবা নেই?'

‘না। যুদ্ধে মারা যান।’
‘ভাই নেই?’
‘না। যুদ্ধে মারা যায়।’
‘তোমার মনকেমন করে না?’
‘বছর বারো আগের কথা। তখন আমার বয়স মোটে দশ। মনে থাকলে তো মনকেমন করবে?’
‘বোন আছে?’
‘না।’
‘Poor darling!’
‘Poor কীসের, সোম? আমার স্বাস্থ্য আছে, চেহারাও নেহাত বিশ্রী নয় বোধ হয়, হলে তুমি প্রেমে পড়তে না। আমার চাকরিটাও ভালো, উন্নতির আশা আছে—’
‘কী চাকরি, পেগ?’
‘Selfridgeদের খেলনা বিভাগে কাজ করি। একদিন ওই বিভাগের ম্যানেজার হব। যেয়ো একদিন, তোমাকে দেশে পাঠাবার মতো পুতুল কিনিয়ে দেব। Gamageদের সঙ্গে আমাদের জোর প্রতিযোগিতা চলছে।...কিন্তু কোন কথার থেকে কোন কথায় এলুম? তোমার গল্পের খেই হারিয়ে গেল যে?’
সোম বলল, ‘থামো, ভেবে দেখি।...আমার তৃতীয়ার কাহিনি শুরু করেছি কি? করেছি? তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছি কি?...দিইনি? তাই শোনো। যেদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ সেদিন যাঁর সঙ্গে গেছিলুম তিনি তাঁর ও আমার উভয়েরই প্রিয় বন্ধু। আমার প্রিয়তম বন্ধু। দেখা হবার পর একটি ঘণ্টা আমরা পরস্পরের সঙ্গে কইবার মতো কথা খুঁজে পেলুম না, তিনিও বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে সংকোচ কাটান, আমিও বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে সংকোচ কাটিয়ে উঠি। এমনি করে সংকোচ যখন কতকটা কাটল তখন বন্ধুও ছিলেন চতুর, বললেন, আমি একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি, খানিক পরে আসব।’ একটি ঘরে দু-টি মানুষ, আট ন-মাস ধরে তারা চিঠিপত্রে পরস্পরের অন্তরাত্মা পর্যন্ত দেখেছে, দু-জনের জীবনের সকল কথা দু-জনে জানে—বুঝতে পারছ, পেগ? তারা অপরিচিত নয় যে প্রথম দেখায় স্বভাবত সংকোচ বোধ করবে। চিঠিতে একজন আরেকজনকে ‘প্রিয়তম’ বলে সম্বোধন করে আসছে! তবু মুখোমুখি ‘আপনি’ বলবে, না ‘তুমি’ বলবে ঠিক করতে পারছে না। অদ্ভুত নয়?’
‘ভাগ্যিস আমাদের ভাষায় ‘আপনি-তুমি’র ভেদ নেই। নইলে পর্থকওলের সেই সকালটিতে দ্বিধায় পড়া যেত।’
‘সত্যিই!...আমাদের প্রথম কথাগুলি আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা একখানি তক্তপোষের উপর খুব কাছে কাছে বসেছিলুম। অন্ধকার হল। ঝি বলল, ‘আলো দিয়ে যাব?’ সে বলল, ‘না।’ আমি বললুম, ‘হ্যাঁ।’ বেশ মনে পড়ে সে আমাকে ছোটো ছেলেটির মতন করে খেজুর খাইয়ে দিয়েছিল। তেমন খেজুর তোমরা ইংল্যাণ্ডে পাও না, পেগ।’
‘যদি কোনোদিন পাই তোমাকে তেমনি করে খাইয়ে দেব, সোম।’
‘দিয়ো। কিন্তু সে আনন্দ আর ফিরে পাব না। তাকে যে প্রথম দর্শনেই কামনা করেছিলুম স্ত্রীর মতো করে। আর মজা এই যে প্রথম দর্শনেই সে আমাকে স্বামীর মতো করে কামনা করা ছাড়ল। তার রূপ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল, আমার কুরূপ তার কল্পনাকে ধূলিসাৎ করল। তারপর থেকে আমাদের সম্বন্ধ গেল উলটে। সে পালায়, আমি ধরতে ছুটে যাই। সে আলোছায়ার খেলা। কিন্তু যে ছিল আলো সে হল ছায়া, যে ছিল ছায়া সে হল আলো। আমি বলি, ‘প্রিয়তমা’; সে বলে, ‘বন্ধু’। অভিমানে আমার দেহ থেকে প্রাণ চলে যায়। আমি তার দেহ দাবি করি, সে আমারই শেখানো platonism আওড়ায়। বলে, মনের মিলনই হচ্ছে স্থায়ী মিলন, দেহের মিলনে কেবল গ্লানি ও অবসাদ।’
পেগি বলল, ‘কেমন জব্দ?’

সোম বলল, ‘আমারই শিল আমারই নোড়া, আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। আমার মানসী হয়ে আমার কবিতার নায়িকা হতে চায়, আমার বনিতা হয়ে আমার শুষ্ক জীবন মুঞ্জরিত করতে বললে কান দেয় না। আমার স্তুতি তার ভালো লেগেছে, আমার স্পর্শ তাকে উদ্দীপিত করেনি। আমার কাব্যে অমর হবার লোভ আছে, আমার বংশকে অমর করবার বাঞ্ছা নেই। এ খেলা ক-দিন চালানো যায় বল? আমি ক্ষান্তি দিলুম।’

‘সে কী ভাবল?’

‘কাঁদল। মুক্তি দিতে অনিচ্ছুক হল। তার নেশা লেগেছিল।’

‘সে নেশা ভাঙিয়ে ভালোই করলে। ফ্লার্ট করা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে।’

‘আমি কিন্তু ফ্লার্ট করাকে একটা আর্ট মনে করে থাকি। আজকাল তো আমি কাব্য লেখা ছেড়ে দিয়ে তার বদলে ফ্লার্ট করা অভ্যাস করেছি।’

‘আমি ও-অভ্যাস ছাড়াব।’

‘সে দেখা যাবে। কিন্তু আমার চতুর্থ প্রেমের কাহিনিটা একবার শোনো। আমার উপর তোমার ঘৃণা হয় কি না বলো।’

‘ঘৃণা তোমার উপর যদি হয় তবে আমি তোমার কেমনতরো বোন? না, ঘৃণা হবে না।’

‘আচ্ছা গো আচ্ছা। আগে শোনো। তৃতীয়কে যখন ত্যাগ করলুম তখন আমার চেতনা হয়েছে যে শরীরের সামর্থ্য থাকাটা প্রেমের বেশ একটা বড়ো উপাদান। আমরা মুখে যাই বলি না কেন কায়মনে সম্ভোগপিপাসু। মশারা যেমন রক্তপিপাসু। এ বিষয়ে আমি স্পষ্টবাদী হতে শিখেছি অনেক দুঃখে, পেগ। ছিলুম গোঁড়া নিরাকারবাদী, এখন যে গোঁড়া সাকারবাদী হয়েছি তা নয়, এখন আমি উদারতম সমন্বয়বাদী।’

পেগ মাথা নেড়ে বলল, ‘ওসব আমার মাথায় ঢুকবে না, সোম।’

সোম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘তোমাকে আমি বিদুষী করে তুলব, পেগ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আমার মেয়াদ আর একটি বছর।’

‘মোটে?’

‘দুঃখ কী পেগ? আবার আমি আসব। হয়তো আবার ওই হোটেলে এসে এই ঘরে শোব।’

‘ভবিতব্যই জানে।’

‘ভবিতব্যকে আমরাই হওয়াই। ভগবানের প্রতিভূ আমরা।’

‘ভগবান আছেন কি না তাই ভালো জানিনে।’

‘তা হলে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, পেগ। ভগবান আছেন কি না এ নিয়ে অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে পন্ডিতেরা কথা কাটাকাটি করে আসছে। অতএব ভালোবাসার গল্পই চলুক যদিও রাত এখন তিনটে।’

‘তিনটে!’

‘তিনটে! এখন ঘুমোলে কাল ট্রেন পাবে না।’

‘গল্পই চলুক। কিন্তু ঘুম যা পাচ্ছে তোমাকে কী বলব!’

‘তুমি ঘুমোও, আমি জাগি।’

‘সে হয় না, ডিয়ার।’

‘এখনও অবিশ্বাস?’

‘ছি। তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারি?’

‘এই দেখ, প্রমাণ হয়ে গেল যে আমার নখ দন্ত নেই, প্রত্যেক পুরুষসিংহের যা থাকা আবশ্যক। পুরুষকে নারী বিশ্বাস করবে এইটেই তো প্রকৃতির ইচ্ছাবিরুদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ হচ্ছে শত্রুতার। বিকৃত সম্বন্ধ হচ্ছে বন্ধুতার।’

‘তর্ক রাখো। তর্ক করলে আমি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ব। গল্প করে আমাকে জাগিয়ে রাখো, সোম।’

'আচ্ছা তবে আমার দেহতন্ত্র প্রেমের গল্প বলি। কিন্তু আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিই, প্রেম কথাটা এই ক্ষেত্রে কাম কথাটার সমর্থক। একটি মেয়ে আমাকে seduce করল। মেয়েমানুষে কখনো seduce করে শুনেছ?'

'অমন মেয়ে এদেশে অগণ্য আছে।'

'কিন্তু আমি এত ছেলেমানুষ ছিলুম যে একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তাই নিয়ে হাতাহাতি করেছি, বাক্যালাপ বন্ধ করেছি। তাকে বলেছি মিথ্যাবাদী, নারীদ্বেষী। তার অপরাধ সে বলেছিল যে পুরুষদের প্রস্তাবে মেয়েদের সায় থাকে বলেই আমাদের দেশে এত নারীহরণ হয়।'

'এদেশে হয় পুরুষহরণ। তোমাকে কেউ একদিন পকেটে পুরবে, সাবধানে থেকো।'

'আমি তো তা হলে কৃতার্থ হয়ে যাই। তবে নেহাত বেশ্যা-টেশ্যা হলে আমি নারাজ। ইংল্যাণ্ডে অবশ্য পুলিশের ভয়ে হাত ধরে টানে না, কিন্তু কন্টিনেন্টে ধস্তাধস্তি করেছে, তবু সায় দিইনি।'

'সে তুমি বলে পারলে।'

'আবার প্রমাণ হল যে আমার নখ-দন্ত নেই। আমি কাপুরুষ।'

'ও ক্ষেত্রে কাপুরুষতাই পৌরুষ।'

'যাক, আমার গল্পটা কতদূরে ফেলে এলুম। ...যে আমাকে seduce করেছিল সে রূপসি ছিল না বলে তখন তার উপর রাগ করেছি। চরিত্রটি গেল, অথচ aesthetic আনন্দও পেলুম না—এ আমার জীবনের ছোটোখাটো একটা ট্র্যাজেডি।'

'চরিত্রটি গেল, সোম!' পেগি কাতর সুরে বলল।

'যাবে না? তবে seduce করা বলতে কি তুমি একটা নিরামিষ ব্যাপার বুঝেছিলে?'

'ছি ছি ছি ছি।'—পেগি সোমের কাছ থেকে সরে গেল।

সোম কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'ঘৃণা করলে তো?'

পেগি কাতর সুরে বলল, 'তুচ্ছ একটা মুহূর্তের শখ, তারই জন্যে বিলিয়ে দিলে নিজেকে?'

'নিজেকে নয়, পেগ। নিজেকে বিলোনো যায় না। আমার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন ছিল, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া সত্যিকারের চরিত্র কখনো ক্ষুধা মেটালে যায় না। ভূরিভোজন করলে যায়, তা মানি। আবার অনশন করলেও যায়। লোকে বলে সংযম করো। কিন্তু অনশনে তো সংযম নেই, সংযম ভোজনে। অসম্ভোগে তো সংযমের কথা উঠতে পারে না, সংযম সম্ভোগে। একথা লোকেও মানে, কিন্তু মন্ত্রপড়া স্ত্রী-পুরুষের বেলা। যারা মন্ত্র পড়েনি তাদের প্রতি ব্যবস্থা নিরম্বু একাদশী। অথচ একবার মন্ত্র পড়লে বাপ-মা বলেন, 'নাতি চাই, নইলে মরতে পারছি নে।' পাড়াপড়শিরা অন্নপ্রাশনের দিন গুনতে থাকে বিয়ের পরদিন থেকে, তারা চায় আরেক দফা ভোজ। Population ঠিক মতো বাড়ছে না বলে তোমার নিজের দেশের মাতব্বররা কেমন অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, খবর রাখ?'

পেগি বালিশে মুখ গুঁজে বোধ করি চোখের জল ঠেকিয়ে রাখছিল। উত্তর দিল না। সোমের ইচ্ছা করছিল তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়—কিন্তু তাকে স্পর্শ করলে সে যদি আরও দূরে সরে যায়? সোম তাহলে কী উপায় করবে? যুক্তিতথ্য দিয়ে তো পেগির অশ্রু রোধ করা যায় না।

সোম প্রসঙ্গটাকে করুণ করে তুলল। অশ্রু দিয়ে অশ্রু রোধ করবে।

বলল, 'সতী মেয়েদের দ্বার আমার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল, পেগ। একে আমি একটা ছোটো খাটো ট্র্যাজেডি বলে উপহাস করেছি একটু আগে, কিন্তু এই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি।'

পেগির ভাব দেখে মনে হল সে কুতূহলী। কিন্তু সে তেমনি নীরব রইল।

সোম বলল, 'আমার দেশে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে অনেকবার। আমার দেশের বিবাহ-প্রথা তোমার দেশের মতো নয়। বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাবা বিবাহযোগ্য ছেলের বাবাকে আবেদন জানান। ছেলের বাবা

ছেলের মত জিজ্ঞাসা করেন। ছেলে একবার মাত্র মেয়েটিকে দেখে কিংবা একবারও না দেখে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে।'

পেগি ক্রমে ক্রমে আগের মতো সোমের কাছটিতে সরে আসছিল। তেমনি করে সোমের বুকের ওপরে বালিশ ও বালিশের ওপরে মাথা রেখে বলল, 'দক্ষিণ সমুদ্রের অসভ্যদের মধ্যে অমন প্রথা আছে শুনেছিলুম।'

সোম বলল, 'তোমার দেশের সুসভ্য রাজবংশেও অমন প্রথা ছিল, পেগ। ইউরোপে যখন আভিজাত্যের যুগ ছিল তখন ওই প্রথাই ছিল, অসভ্যতার নয়, আভিজাত্যের লক্ষণ।'

পেগি বলল, 'মেয়ের বাবা মেয়ের মত জিজ্ঞাসা করেন?'

সোম বলল, 'মেয়ে সাধারণত নাবালিকা। তার মত চাইলে সে লজ্জায় 'না' বলবেই তো। ও বয়সে 'না' মানে 'হ্যাঁ।' বাপ জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন, জোর করে ওষুধ খাওয়ানোর মতো। ফলে মেয়ের শরীর মন ভালো থাকে, যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বারংবার সন্তান হয়।'

পেগি বলল, 'মা গো, আমি যদি তোমার ভারতবর্ষীয়া বোন হয়ে থাকতুম এতদিনে আমার তিন চারটি খোকা-খুকি হয়ে থাকত! ইস!'

'হয়তো একটিও হবার আগে তুমি বিধবা হতে। বিধবার বিয়ে আমরা দিই নে, দিতে চাইলেও বর পাওয়া যায় না, সারাজীবন নিঃসন্তান হতে।'

'এও কি আভিজাত্যের লক্ষণ, সোম? না নির্জলা অসভ্যতার?'

'না গো, ওটা হল আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। কিন্তু ওকথা আজ থাক। কেননা তুমি খুব সম্ভব তর্ক করতে, 'এক তরফা আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী। বিপত্নীকরা তো নিঃসন্তান থাকেন না।'...বলছিলুম আমার দেশে সকলের বউ জুটবে, আমার কোনোদিন জুটবে না!'

'কেন, সোম?'

'আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে? যাদের বিয়ে হয় তারা বিয়ের আগে প্রাণ খুলে কথা কইবার সুযোগ পায় না। তারা বড়ো জোর একবার চোখে দেখে পরস্পরকে; বাক্যালাপ যা করে তা বহু লোকের উপস্থিতিতে। কাজেই আমার জীবনের সকল কথা বিয়ের পরে বলতে হয়। তখন যদি আমার স্ত্রী বলেন, ''কেন তুমি আমাকে false pretence-এ বিয়ে করলে। কোনো সতী মেয়েকে বিয়ে না করাই তোমার উচিত ছিল'' আমি তার উত্তরে কী বলে আত্মসমর্থন করব? কাপুরুষের মতো বলব, ''রানি আমার'' একটা পাপ করে ফেলেছি বলে অনুতাপে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে, তোমার ক্ষমাসলিল সেচনে শীতল করো?' কখনো না। আমি অন্যায় করিনি যে অনুতপ্ত হব। যা করেছি on principle করেছি।'

আবার পেগি বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু এবার সোমের বুকের উপরকার বালিশে।

সোম বলে চলল, 'নিজের উপর যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে সে বড়োজোর বলে, 'একটা ভুলচাল দিয়েছি' কিন্তু অনুতাপ করে মরে আত্মনিন্দুক আত্মঘাতীরা। আমার গায়ের চামড়ায় হাত দিয়ে দেখতে পার, পেগ, গণ্ডারের মতো মোটা। লোকনিন্দা আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তা বলে নিজের নিরীহ স্ত্রীটিকে আমি ঠকাতে পারব না। ওইটেই আসল দুর্নীতি। স্ত্রীকে ঠকিয়ে তার দেহ-মন গ্রহণ করাটাই প্রকৃত ব্যাভিচার।'

পেগ মুখ তুলে বলল, 'যাক, তা হলে বিয়ে তুমি করছ না কোনোদিন?'

সোম হেসে বলল, 'ওকথা কি আমি বলেছি পেগ? আমি বলেছি সতী মেয়েরা আমাকে বিয়ে করবে না জেনে-শুনে। কিন্তু অসতী মেয়েরা প্রায়ই অনুদার হয় না। প্রায়ই বললুম—কারণ সন্ন্যাসীদের উপর অসতীদের পক্ষপাত আমি অনেক স্থলে লক্ষ করেছি।'

পেগির হৃৎস্পন্দন রহিত হয়েছিল বুঝি-বা। সোমটা যে এমন সর্বনেশে ছেলে, তাকে উদ্ধার করবার যে একেবারে আশা নেই, পেগি বোধ করি সেই কথা ভেবে মুহ্যমান হয়েছিল। সব মেয়ের মতো পেগির প্রচ্ছন্ন

অভিলাষ ছিল যে সে কোনো একজন বা একাধিক পুরুষের Guardian Angel হবে। ফ্লার্ট করা একটা নিরীহ অপরাধ, সোম তা যত খুশি করুক। কিন্তু সেই অনুচ্চারণীয় পাপটা! ছি ছি ছি!

সোম কতকটা অনুমান করে বলল, 'ভয় নেই, পেগ। আমার মন পাবার মতো অসতীও এত বড়ো পৃথিবীতে দুর্লভ। আর মন যাকে দিতে পারব না দেহও যে তাকে দেব না এও আমার পণ। ব্যতিক্রম হয়েছিল সেই মেয়েটির বেলা, কিন্তু তখনকার সেটা ছিল প্রতিক্রিয়ামূলক—Platonic love-এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। তখন যদি অমনটি না ঘটত তবে আজকে রাত্রে এমনটি ঘটত না, পেগ। তোমার সতীত্বকে আমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে সেই অসতী মেয়েটা।'

পেগি বলল, 'তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।'

সোম বলল, 'এবার আমার পঞ্চম প্রেমের বৃত্তান্ত বলে শেষ করি। পাঁচটা বাজে। একটু পরে হিলরা উঠবে!'

পেগি কান পেতে রইল।

সোম বলল, 'তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে সাক্ষাৎ। এক বন্ধুনির বাড়িতে। সেদিন আমি ভারতীয় পরিচ্ছদ পরে আগুন পোহাচ্ছি, কেননা ভারতীয় পরিচ্ছদ শীতের দেশের উপযুক্ত নয়।'

পেগি কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কেমন দেখতে?'

সোম বলল, 'দেখাব তোমাকে একদিন। কিন্তু দেখে মূর্ছা যেয়ো না। তাতে শরীরে সবটা ভালো করে ঢাকে না।'

পেগি বলল, 'না ঢাকে তো ভারি আসে যায়।'

সোম বলল, 'আগুন পোহাচ্ছি এমন সময় তিনি এসে আমাদের কাছে একটি কবিতা পড়ে শোনালেন, কবিতাটি একটি খুব অল্পবয়সি গরিবের মেয়ের লেখা, তার বাপ তার মাকে কি তার মা তার বাপকে ছেড়ে গেছে আমার মনে নেই। কবিতাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছিল। কিন্তু কবিতাটির চেয়ে আমাকে আকৃষ্ট করছিল কবিতার পাঠিকাটি স্বয়ং। তাঁর চোখের চাউনি এ সংসারের নয়, তাঁর গলার সুর অন্য জগতের। তিনি যখন টুপিটা খুলে একপাশে রেখে দিলেন তখন দেখলুম তাঁর কেশ অবিন্যস্ত। তিনি যখন তাঁর কোট খুলে ফেললেন তখন দেখলুম তাঁর বেশ বিস্রস্ত। আমি বিস্মিত হচ্ছিলুম, কিন্তু সাহস করে ভাবতে পারছিলুম না যে তিনি হয় একটি জিনিয়াস নয় একটি পাগল; ওঘর থেকে অন্যেরা চলে গেলে পরে তিনি আমার কাছে সরে এসে আগুন পোহাতে লাগলেন। বললেন, 'আপনি ইংরেজি কবিতা পছন্দ করেন কি?' আমি বললুম 'এক-শো বার'। বললেন, 'আপনাদের Tagore-কে আমার ভালো লাগে। আচ্ছা Tagore-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় না?' বললুম, 'হয় বই কী। যদি কখনো ভারতবর্ষে যান। কিংবা Tagore এদেশে কবে আসবেন সে খবর রাখেন।' তিনি যে কেন Tagore-এর সঙ্গে দেখা করতে ব্যগ্র আমি আন্দাজ করতে পারিনি। তিনি বললেন, 'কেউ না বুঝুক Tagore নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমি ভগবানের খোঁজ পেয়েছি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে।' আমি বললুম, 'সে কীরকম?' তখন তিনি কাগজ পেনসিল নিয়ে Chart এঁকে অতি প্রাঞ্জল করে বোঝাতে লাগলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বললেন, 'লিখে উঠতে পারছি নে। লিখে উঠলে আপনাকে পড়তে দেব, দেখবেন অতীব সরল। অথচ এই নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে এত চিন্তা এত অন্বেষণ এত তর্ক এত রক্তপাত!' তারপরে সংবাদ পেলুম তিনি কিছুদিন পাগলাগারদে ছিলেন, তার আগে তাঁর fiance মারা যান, তার আগে তাঁর মা-বাবা। কবি যশ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল, কিন্তু কাব্যে মন দিতে পারেননি, একখানাও দর্শন, বিজ্ঞানের বই না পড়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভগবানকে আবিষ্কার করে চলেছেন। সেদিন যখন তিনি বিদায় নিলেন লক্ষ করলুম তাঁর কাপড় খুলে পড়ছে, সে দিকে লক্ষ নেই।'

পেগি বলল, 'এমন ভোলা মানুষকে গারদ থেকে ছেড়ে দেওয়াই ওদের অন্যায় হয়েছিল।'

সোম বলল, 'তার কারণ গারদের লোক তাঁর উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিল। পাগলের মতো তাঁর স্বভাবে রাগ ছিল না, তিনি জিনিসপত্র ভাঙতেন না। কথাবার্তা কইতেন প্রকৃতিস্থ মানুষের মতো, তাঁর ভাব দেখে বোধ

হত অতবড়ো যুক্তিশীল মানুষটার উপর সমাজ অবিচার করে পাগলত্ব আরোপ করেছে।'

পেগি বলল, 'সে-কথা যাক। তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কতদূর গড়াল?'

সোম বলল, 'আমি দিন কয়েক বাস্তবিক ভেবেছিলুম তাঁর ভার নেব কি না। প্রেম পেলে ও দিলে তাঁর পাগলামি সারত, তিনি আবার আগের মতো কাব্যচর্চা করতেন, তাঁর chartখানা আমি পুড়িয়ে ফেলতুম। কিন্তু দিন কয়েক পরে কী ঘটল জান? তিনি তাঁর উপরতলার ঘরের জানালা দিয়ে গলে পড়লেন নীচের বাগানে। তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল প্রথমে হাসপাতালে ও পরে পাগলাগারদে। কাজেই আমার প্রেমের হল অকালমৃত্যু। গভীর আঘাত পেলুম, কিন্তু তা বলে নিত্যকার ফ্লার্ট করা বন্ধ রইল না।'

পেগি বলল, 'তুমি খুব বেঁচে গেছ। পাগলের সঙ্গে থেকে পাগল হয়ে যেতে। আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই সোম।'

সোম বলল, 'কিন্তু পেগ, প্রেম মাত্রেই আগুন নিয়ে খেলা। সে আগুন স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলে দাঁড়াতে পারে যেকোনো মানুষের জীবনে। ধন, মান, কুলমর্যাদা, পারিবারিক সামঞ্জস্য, জীবনের কাজ, সকলই সে পুড়িয়ে ছারখার করতে পারে। কিন্তু হাজার পুড়লেও যা সোনার মতো ঝকঝক করে তা আমাদের আত্মা। কোনো যুগে কোনো দেশে কোনো মানুষের প্রেম তার আত্মাকে ক্ষুদ্র করেনি, পেগ—হোক না কেন সে জিনিস প্রেম নামের অযোগ্য পাশবিক কাম।'

পেগি শান্তভাবে সোমের চোখে চোখ রাখল। দুই হাতে সে সোমের বুকের উপরকার বালিশটাকে জড়িয়েছে। তার সোনালি চুল, তার শুভ্র মুখখানি সচিত্র করেছে। তার চোখের কোলে অনিদ্রার চিহ্ন।

তখন ভোরের প্রথম আলো দেওয়ালজোড়া কাচের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

সোম পেগির চুলগুলিকে হাত দিয়ে ব্রাশ করে দিল। পেগি চোখ বুজে সোহাগ সহ্য করল। সোম হাত সরিয়ে নিলে আবার চোখ মেলল।

সোম হেসে বলল, 'আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে? তুমি আমার নও। আমার কালকের সন্ধ্যার সব চাল বেচাল হল, তুমিই জিতলে। এসো আমরা জানালার কাছে বসে ভোর হওয়া দেখি।'

আলস্য ভাঙতে পেগির খানিকক্ষণ লাগল। সে নৈশ পরিচ্ছদটাকে সম্বৃত করে চুলের ক্লিপদুটোকে খুলে ও এঁটে চোখে আঙুল বুলোতে বুলোতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, জানালার স্ক্রিন তুলে দিল এবং জানালার কাচে বাতাসের পথ করে দিল।

সোম বলল, 'বুকে মাথা রেখে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছ। বাইরে ব্যথা, ভিতরে ব্যথা, যেন একটা অপরটার সিম্বল!'

পেগি কথা বলল না। আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

তখন পুব আকাশে রং ধরবার দেরি আছে। ছবি আঁকবার আগে ছবিকার তাঁর ক্যানভাসকে যেমন নির্বর্ণ করেন আকাশের দেবতা আকাশকে করেছেন তেমনি।

পেগি আনমনে সোমের একটি হাতকে নিজের কোলের উপর অতি ধীরে ধীরে টেনে নিল।

পুতুল নিয়ে খেলা

১
পুর্ণিয়া প্যাক্ট

'আগুন নিয়ে খেলা'র নটোরিয়াস সোম ব্যালার্ড পিয়ারে জাহাজ ভিড়লে তল্লাস করে দেখল তার নামে এসেছে একখানা তার ও তিনখানা চিঠি।

তার করেছে কুণাল-ললিতা-কল্যাণ। 'Welcome to India and us.' বিলেত যাওয়ার আগে সোম কুণাল-ললিতার বিয়ে দিয়ে গেছল। ইতিমধ্যে তাদের একটি ছেলে হয়েছে আর তারা সেই ছেলের নাম রেখেছে বন্ধুর নামানুসারে 'কল্যাণ'। বন্ধুপ্রীতির এহেন নিদর্শন দুর্লভ বলে সোমের চোখ সিক্ত করলে সুখে।

একখানা চিঠি কোনো এক লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানির, সোম ওখানা কোপদৃষ্টিতে ভস্ম করল। অন্য একখানা চিঠি তার তৃতীয়া প্রিয়ার, সেই যিনি বলতেন মনের মিলনই হচ্ছে স্থায়ী মিলন, দেহের মিলনে কেবল গ্লানি ও অবসাদ। তাঁর স্বভাব বদলায়নি, অভিজ্ঞতাও বাড়েনি। মণীন্দ্রলাল বসুর 'মায়াপুরী' থেকে চুরি করা ভাব ও চোরাই ভাষা দিয়ে তিনি পূর্ণ পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে এই কথাটি বিশদ করেছেন যে বেলা জানে তার তরুণ তার কাছে একদিন ফিরবে, লালমণি রাজপুত্র আনবে রাজকন্যা পদ্মাবতীর বাঞ্ছিত পদ্ম, রাজকন্যার কানে কানে বলবে, 'তুমি যে পদ্ম চেয়েছিলে, রাজকন্যা, সে পদ্ম আমার বুকেই ফুটে আছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তবে তার সন্ধান পেলুম।'

শেষ চিঠিখানা পড়ে তার ক্রোধ ও অপমানের পরিসীমা রইল না। লিখেছে তার বিধবা বোন সুমিত্রা।

'দাদা, সুদীর্ঘ তিন বছর পরে সুদূর বিদেশ থেকে জয়ী হয়ে তুমি ফিরেছ, ভগবান তোমাকে নীরোগ ও নিরাপদ রেখে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে এখন সেটা দিন গুণে বলা যায়, আশা করি পথে কোথাও নামবে না, সোজা এখানে চলে আসবে, সোমবার পৌঁছানো চাই।

পৌঁছে যা দেখবে তার জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে সাহায্য করা আমার উচিত। সেইজন্য লিখছি যে একখানা বেনামি চিঠি পেয়ে বাবা যারপরনাই লজ্জিত, বিমর্ষ ও বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। চিঠিখানা আমাকে পড়তে দিলেন না, ছোটো মা-কেও না। গম্ভীর ভাবে বললেন, খারাপ চিঠি। আমরা তাঁকে কত বুঝিয়ে বললুম যে দাদার কোনো শত্রু তার নামে কলঙ্ক আরোপ করেছে, নইলে বেনামি লিখল কেন? বাবা বললেন, যেসব খুঁটিনাটি দিয়েছে, সেসব কখনো বানানো হতে পারে না, তার এক আনাও যদি সত্য হয় তবে অমন ছেলের মুখদর্শন করলে পাপ হবে।

চিঠিখানা তিনি তাঁর দুই একজন উকিল বন্ধুকে দেখিয়ে পরামর্শ চাইলেন। কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে তুমি কাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছলে। এতে অন্যায়টা যে কী ঘটল আমি তো তা স্থির করতে পারলুম না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চাল আমাদের কল্পনার বাইরে, তাই আমরা তার কদর্থ করে থাকি। ওরাও তো আমাদের বৈধব্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে কলুষিত দেখে, আমাদের পক্ষে যা সহজ ওদের চক্ষে তা কুটিল!

কার পরামর্শে জানিনে, বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা না করে কাগজে এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বসেছেন। তার কাটিং তোমাকে পাঠালুম। তার উত্তরে রোজ তিন-চারখানা করে চিঠি আসছে। গোষ্ঠবাবু বলে দিনাজপুরের এক ভদ্রলোক তো সশরীরে ও সবান্ধবে এসে শহরে কোথায় বাসা নিয়ে দুবেলা বাড়িতে হাজিরা দিচ্ছেন। অধম আমিও দু-চারখানি চিঠি পেয়েছি এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। আমাদের থার্ড মুন্সেফের স্ত্রী সেদিন ছোটো মা-কে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তোমার একচোট নিন্দা শুনিয়ে দিলেন ও দিব্যি সপ্রতিভভাবে প্রস্তাব করলেন যে তাঁর মেজ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে চরিত্র শোধরাতে পারে।

বিজ্ঞাপনটি এই :—

Wanted A Handsome, Educated and

accomplished Kayastha bride for a graduate educated in London University, aged 25, of excellent health and very fair complexion being the eldest son of a District Judge.

For details write to :—

J.K. shome, esq.,

District Judge. Purnea.

সোম একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল। বাবা কি ভুলে গেছেন যে তার রংটা বেশ একটু কালো। না ধরে নিয়েছেন যে তিনবছর বিলাতবাসের পুণ্যে কালো রং কটা হয়। স্বাস্থ্য অবশ্য তার গর্ব করবার মতো, কিন্তু বরের স্বাস্থ্যের জন্য কোন মেয়ের বাপ মাথা ঘামান? আর কী ইংরাজি জ্ঞান! Being কথাটা ওখানে বসিয়ে দেওয়ার ফলে মানে দাঁড়ায় এই যে, ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো ও রং ধবধবে, যেহেতু সে একজন জেলা জজের প্রথম কুমার।

সোম চটবে কি হাসবে ঠিক করতে পারল না। বিয়ে করতে তার অনিচ্ছা নেই, কিন্তু বিয়ের আগে সে তার ভাবী বধূকে তার জীবনের আদি পর্ব নিরালায় শোনাতে চায়—এই তার ন্যূনতম দাবি। শুনে যদি মেয়েটি বলে, অন্যায় কিছুমাত্র হয়নি, অমন অবস্থায় পড়লে আমিও তাই করতুম, তবে সোম মেয়েটির রূপ, বিদ্যা ও গুণীত্ব নিয়ে চুল চিরবে না, মেয়েটি কায়স্থ না হয়ে কলু কিংবা কামার হলেও সোমের দিক থেকে আপত্তি থাকবে না। মোট কথা, বাবা যদি তার ন্যূনতম দাবি স্বীকার করে তাকে ওই দাবি পেশ করবার স্বাধীনতা দেন তবে সে রূপ গুণ জাতি ইত্যাদি বিবেচনা বাবার উপর ছেড়ে দেবে।

তিন বছর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে প্রেম সম্বন্ধে সে এই সিদ্ধান্ত করেছিল যে ওটা অন্য দশটা ধুয়ার মতো একটা ধুয়া। Liberty, equality, world peace, disarmament, ইত্যাদির মতো ওটাও একটা তরুণ-ভুলানো বুলি। আগে ষাট মণ ঘি পুড়বে তারপর রাধা নাচবেন। প্রথমত, ব্যাংকে সুযথেষ্ট সঞ্চয়, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর পল্লিতে বাড়ি না হোক বাসা, তৃতীয় মূল্যবান আসবাব ও বাসন—ন্যূনপক্ষে এতখানি ঘি পুড়লে বিবাহের যজ্ঞানল জ্বলবে। আর যে-প্রেম বিবাহান্ত নয় সে-প্রেম হয় একপ্রকার শখ, নয় একটা মনোবিকার। সাবধানী ইংরাজ ও-দুটোকে চল্লিশ হাত দূরে রেখে পথ চলে। অলসধনী ও মাথা পাগলা বোহিমিয়ান এই দুই মন্ডলীতে ওই দুই শৃঙ্গী আবদ্ধ। এ ছাড়া একটা নতুন মন্ডলীর উদ্ভব হয়েছে, তাতে প্রেম হচ্ছে শনি রবিবারের খেলাধুলার শামিল, প্রসাধনের অঙ্গ। ওকে প্রেম বললে মানে হয় না, ও হচ্ছে পরিমিত দেহচর্চা। মন্ডলীটা ব্যবসায়-ব্যস্ত নাগরিক নাগরিকার। ওদের মস্ত গুণ এই যে ওরা ধুয়া ধরে নিজেদের ভোলায় না, বুলি আওড়ে পরকে ভোলায় না। ওরা বোঝে না তত্ত্ব, বোঝে তথ্য। সোম এই মন্ডলীকে আপনার করেছিল। এরা কাজের সময় করে কাজ, উদবৃত্ত সময়ে করে পরস্পর বিনোদন। অন্তরে এরা কেউ কারুর নয়, অন্তর্মুখী হতে এরা নারাজ। এদেরই জন্যে মহাকবি *‘ক্ষণিকা’* রচনা করেছেন।

টিপ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই বাবা তার মাথায় হাতে বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রু। মুখে সুগম্ভীর হাস্য। কত কী জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, কিন্তু প্রবল আনন্দের বেলায় তুচ্ছ কথাই মুখে আসে।—‘পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?’

সোম বলল, ‘অসুবিধা যা হবার তার এখনও বহু বাকি। এত বড়ো দেশে একটানা রেলপথ যাত্রা শেষ হয়েও শ্রান্তির তৃষ্ণা রেখে যায়। কী গরম!’

‘ওমা, গরম কাকে বলছ, দাদা,’ সুমিত্রা প্রণাম করে বলল, ‘এখন তো শীত পড়তে আরম্ভ করেছে।’

‘বিলেতফেরতাদের,’ জাহ্নবীবাবু সবজান্তার ভঙ্গিতে বললেন, ‘প্রথম-প্রথম তাপবোধটা কিছু বেশি হয়ে থাকে, মা।’

বাবার অসাক্ষাতে সুমিত্রা বলল, ‘কই আমার জন্যে কী এনেছ, দেখি বাক্সের চাবি।’

তেমনি পাগলিই আছে। ওর জন্যে সোমের অন্তরে সমব্যথার অন্তঃস্রোত চক্রাকারে ঘুরছিল, মোহানা পাচ্ছিল না! ওকে খুশি করে ওর ব্যথা ভোলানোর জন্যে সোম বলল, ‘তোর জন্যে এনেছি একটা নতুন রকমের ফাউন্টেন পেন। তা দিয়ে অন্য কিছু লিখতে নেই, লিখতে হয় শুধু প্রেমপত্র।’

‘যাও,’ বলে সুমিত্রা নিজেই গেল পালিয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এসে সোমের পায়ের কাছে একতাড়া চিঠি ঝুপ করে ফেলে দিল। তার কাছে লেখা সোমের বিয়ের প্রস্তাব। বলল, ‘দাও না, দাদা, চাবিটা। দেখি আমার বিলিতি বউদিদির ফোটো।’

এইবার সোমকে বলতে হল, ‘যা,’ কিন্তু না ভাই না বোন কেউ ওখান থেকে নড়বার নাম করল না। মাঝখান থেকে হাজির হলেন তাদের বিমাতা—কানাই-বলাইয়ের মা। তিনি এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিলেন, সেখানে যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিলেন তার চিহ্ন ছিল তাঁর কপোলে। কল্যাণ ফিরে এল কোনো অচিন্তনীয় বিদেশ থেকে, কিন্তু তাঁর কানাই আর ফিরবে না, সে গেছে বি-জগতে।

সোম তাঁকে প্রণাম করলে তিনি ‘বাবা কল্যাণ—’ বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারপর এলেন সস্ত্রীক ও ত্রিকন্যক গোষ্ঠবাবু। সোম আড়চোখে একবার মেয়ে তিনটিকে দেখে নিল। না রূপসী, না স্বাস্থ্যবতী, না সবাক, না সপ্রতিভ। ওই ভীতসন্ত্রস্ত মূঢ় মেয়ের পালকে সর্বদা তাদের মায়ের মুখপানে নিবদ্ধদৃষ্টি দেখে সোমের হাসি পেয়ে গেল। সে-হাসি আরও দুর্দম হল মা-টির স্বভাবকোপনতা গোপন করবার আয়াস দেখে। আর গোষ্ঠবাবুর চক্ষুতারকা এমন যে মানুষকে দৃষ্টিসূত্রে সুড়সুড়ি দেয় আর তাঁর কথাগুলি যেন কাতুকুতু। এঁরা এতদিন জাহ্নবীবাবুকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর কন্যাকে, তাঁর পুরাতন ভৃত্য নিধিরামকে, তৎপত্নী মোক্ষদাকে তোষামোদ করে প্রলোভন দেখিয়ে সোমের বৈলাতিক লীলারহস্য উদঘাটন করবেন বলে শাসিয়ে কিছুতেই কার্যোদ্ধার করতে পারেননি, কারণ মেয়েগুলি বিজ্ঞাপনমাফিক ‘handsome, educated and accomplished’ নয়, তাদের একমাত্র যোগ্যতা—তারা কায়স্থকন্যা।

সোম কোনোমতে হাসি চেপে বহুকষ্টে বলতে পারল, ‘দেখুন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বাবা, দেশশুদ্ধ লোক জেনেছে যে তিনিই মালিক, আইনত যদিও আমি চার বছর থেকে সাবালক। আর ওদেশে আমি হয়তো রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিলুম, এদেশে আমি পুনর্মূষিক। আমার কাছে আবেদন পেশ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।’

গোষ্ঠবাবু তখন নাক-মুখ ঘুরিয়ে ঢোক গিলতে গিলতে বললেন, ‘আ-আ-আমি স-স-সব স-অ-ব জ-জজ-আনি। আ-আ-আ—’

গোষ্ঠগৃহিণী স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সগর্বে বললেন, ‘প্রদ্যোত আমার ভাই।’

চমক দমন করে সোম শুধাল, ‘কোন প্রদ্যোত? প্রদ্যোত সিং?’

‘সেই।’

সোমের মনে পড়ছিল পেগি ও সে যেদিন ম্যানরবিয়ের থেকে লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করে সেদিন আয়ারল্যাণ্ড থেকে প্রদ্যোত সিং ফিরছিল। সেই যে সোমের বাবাকে বেনামি চিঠি লিখেছে ও গোষ্ঠবাবুর গোষ্ঠে গল্প করেছে সোমের এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কিন্তু দু-বছর আগের ঘটনা মাস খানেক আগে জানানোর কী কারণ ঘটল? কারণটা সম্ভবত এই যে শিকারকে বন্দুকের গুলির গতিসীমার মধ্যে আনতে হলে চারিদিকে তুমুল শোরগোল করে তাকে খেদিয়ে নিয়ে আসতে হয়। সোমের প্রত্যাবর্তন প্রাক্কালে জাহ্নবীবাবুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা উপস্থিত হলে সোমের প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গোষ্ঠবাবু হানবেন প্রাজাপত্য বাণ, এক এক করে তিন গুলি, তার একটা-না-একটা লাগবেই। জন্তুর প্রতি কী উদারতা! তার যে গুলিটাতে খুশি সেই গুলিটাতে মরবে—তার সামনে wide choice।

জাহ্নবীবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম ধাক্কা সামলে উঠেছিলেন। বিজ্ঞাপনের সাড়া পাওয়া গেছল আসমুদ্র হিমাচল থেকে। ভারতবর্ষে যে এমন সব জায়গা আছে আর এসব জায়গায় যে বাঙালি কায়স্থ আছে, পূর্ণিয়ার জেলা জজ অত জানতেন না। কুস্তোড় কলিয়ারি, মঙ্গলদই, রেহাবাড়ী, মৌলবী বাজার, মহেঞ্জোদরো, তেজগাঁও, নওগাঁ, আকিয়াব, পোর্ট ব্লেয়ার, কোলাবা, নেলোর, ভূসাওল, খাণ্ডোয়া। যেসব জায়গার নাম

জানতেন সেগুলিও সংখ্যায় কম নয়। কলকাতা থেকে এসেছে উনপঞ্চাশখানা দরখাস্ত। কাজেই হাজার দুর্নাম রটলেও ছেলের পাত্রীর অভাব নেই, এর জন্য তিনি নিজেকেই অভিনন্দন করলেন। কেমন লোকের ছেলে!

পাত্রী দেখতে বেরোলে ওর সঙ্গে দেশ দেখাও হয়, তীর্থ করাও হয়। কিন্তু জাহ্নবীবাবুর ছুটি ছিল না। তিনি ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'তুমি তো দেশভ্রমণ ভালোবাসো বলে জানতুম। পরের দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলে। এবার নিজের দেশটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। চাকরির নিকট সম্ভাবনা তো নেই, ঘরে বসে বসে করবে কী!'

ততদিনে সোমেরও শ্রান্তি মোচন হয়েছিল। করবার মতো কাজও ছিল না হাতে। বলল, 'যে আজ্ঞে।'

জাহ্নবীবাবু আলবোলার নল মুখে পুরে খানিক ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় আওয়াজ করলেন। বললেন, 'কুস্তোড় কলিয়ারি, মঙ্গলদই, নান্দিয়ার পাড়া, ভাওয়ালী, মাউ জংসন, কুকিচেরা, ঢেঙ্কানাল, মেমিও, তুলসীয়া—এসব না দেখলে ভারতবর্ষের দেখলে কী!'

সোম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'তা তো বটেই।'

'ডিব্রুগড় থেকে পন্ডিচেরী পর্যন্ত একটা দৌড় দাও।' জাহ্নবীবাবু যেন নিজে অমন একটা দৌড় দিয়ে অভিজ্ঞ হয়েছেন এইরূপ ভঙ্গিতে বললেন, 'তারপর পন্ডিচেরী থেকে রাওলপিন্ডি।' পিন্ডির কথায় মনে পড়ল গয়া। 'তারপর রাওলপিন্ডি থেকে গয়া হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।'

সোম বলল, 'একখানা Indian Bradshaw কেনা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ওইসব প্রসিদ্ধ স্থানে—কুস্তোড় কলিয়ারিতে, মাউ জংসনে, ঢেঙ্কানালে—কোন কোন হোটেলে উঠতে হবে তাদের ঠিকানা—'

'হোটেলে উঠতে হবে না,' জাহ্নবীবাবু আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থা ছেড়ে ছিন্ন-গুণ ধনুকের মতো পিঠ সোজা করে বসে বললেন, 'ওসব জায়গায় আমাদের স্বজাতীয় ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁদের বাড়ি আতিথ্য স্বীকার করাতে লজ্জার কিছু নেই।'

সোম ভাবল মন্দ না। রেলের পাথেয় জোটাতে পারলে বছর খানেকের মতো অন্নের ভাবনা থেকে মুক্তি।

সব আগে কোন খানে যাবে স্থির করতে না পেরে সোম দিনের পর দিন টাইমটেবল ও মানচিত্র অধ্যয়ন করে কাটাল। তার ছোটোমা একদিন তার কাছে এসে বসে সেই শীতাদ্য কালে তাকে পাখা করতে লাগলেন।

সোম বলল, 'মা, তুমি কি কিছু বলবে?'

তিনি বললেন, 'মানুষের জীবন। কোন দিন আছে, কোন দিন নেই। নলিনীদলগত জলের মতো তরল। কানাই—' তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আর একবার বললেন, 'কানাই', তারপর কাপড়ে মুখ ঢাকলেন।

সোম সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সাত বছর হয়ে গেল, কানাই কি এতদিন অন্য কোনো মায়ের কোলে জন্ম নেয়নি ভাবছ? ও কি তোমার কান্নার জন্যে কেয়ার করে? যারা কেয়ার করে তাদের কথা ভাবো—আমার কথা, বলাইয়ের কথা।'

'বলাই,' ছোটোমা চোখ মুছে বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চেয়েছিল, কলেজের কর্তারা আসতে দিল না, টেস্ট এগজামিনের আর দেরি নেই বলে।'

'তা হোক, আমিই ওর সঙ্গে দেখা করব এখন।' সোম বলল।

'মানুষের জীবন,' ছোটোমা আবার শুরু করলেন, 'মানুষের জীবন অতিশয় চপল। তোমার বাবা তাই আমাকে বলছিলেন যে, আসছে বছর যখন তিনি পেনশন নেবেন তাঁর সময় কাটবে কেমন করে। নাতি-নাতনির সঙ্গে খেলা করার বয়স হল, কিন্তু কই নাতি-নাতনি?'

সোম বুঝল। যেন বোঝেনি এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'কেন? আমার দুই দিদির সাত ছেলে-মেয়ে। তাদের দুই একটিকে আনিয়ে নিতে বাধা কী?'

‘পাগল ছেলে!’ মা বললেন, ‘তা কি কখনো হয়! ওদের নিজেদের বাড়ি আছে, ওদের ঠাকুমা-ঠাকুরদাদারা ছেড়ে দেবে কেন?’

‘তা তো বটেই।’ সোম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘তা তো বটেই। তাহলে আমাকেই নাতি-নাতনি তৈরি করবার ফরমাশ নিতে হয় দেখছি। এদিকে যে বাবা আমাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কুস্তোড়-কলিয়ারি-ডিব্রুগড়-ফরাক্কাবাদ পাঠাচ্ছেন।’

‘তুমি বাবা আমার কথা শোনো,’ মা বললেন, ‘অত ঘুরতে হবে না। উনি কেবলই খুঁত খুঁত করছেন, কোনো পাত্রীই ওঁর বউমা হবার যোগ্য বলে ওঁর মনে হচ্ছে না, তাই ওইসব সৃষ্টিছাড়া জায়গায় পাওয়া গেলেও যেতে পারে ভাবছেন। অত বাছলে তুষের সঙ্গে সঙ্গে ধানও যাবে ফেলা। আমি বলি তুমি দুটি-কি-তিনটি মেয়ে দেখো—কাশীরটি, শ্যামবাজারেরটি আর ওই দেওঘরেরটি। ও নাকি সুন্দর বীণা বাজায়, সাক্ষাৎ বীণাপাণি।’

‘আর কাশীর মেয়েটি।’

‘কাশীরটি হল ওঁর বন্ধু দাশরথি মিত্তির মশাইয়ের ভাইঝি। উনিও ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ, এখন পেনশন নিয়ে কাশীবাস করছেন। এঁরও ইচ্ছা কাশীতে বাড়ি করেন। দুই বন্ধুর দু-বেলা দেখাশোনা হবে বিশ্বনাথের মন্দিরে আর দশাশ্বমেধ ঘাটে!’

‘দাশরথিবাবুর নাম শুনেছি। শ্যামবাজারের মেয়েটি কার ভাইঝি?’

‘কার ভাইঝি জানিনে, কিন্তু ভূষণবাবুর মেয়ে, বি-এ পাস, কোন বিষয়ে নাকি ফার্স্ট হয়েছে। ভূষণবাবু তাকে এম-এ পড়াতে চান না, বলেন এম-এ পাস মেয়ের বর পাওয়া যাবে না, এক আই-সি-এস ছাড়া। আর আই-সি-এসই বা এত আসে কোত্থেকে।’

‘তা আমিও তো বি-এ-র চেয়ে বড়ো নই। আমাকে ভূষণবাবু মেয়ে দিতে যাবেন কেন?’

‘পাগল ছেলে! কীসে আর কীসে! বিলেতের বি-এ আর এদেশের বি-এ। তোমাকে পাবার জন্যে তাঁর কত আগ্রহ।’

বিলেতফেরত কৃতী পুত্রকে জাহ্নবীবাবু মনে মনে ভয় করতেন। সে যদি বেঁকে বসে সেইজন্যে সোজাসুজি তাকে আদেশ করতে পারেন না। অনুরোধ করতেও তাঁর পিতৃসম্মানে বাধে। মনোগত অভিপ্রায় সংকেতে বোঝানো ছাড়া কী উপায়। এসব বিষয়ে গৃহিণীর সাহায্য নিতেও তিনি কুণ্ঠিত। পাছে কেউ ফস করে ঠাওরায় যে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন, তিনি স্ত্রৈণ, সেইজন্যে তিনি সে বেচারির সঙ্গে ভালো করে কথাই কন না। পাছে এমন অপবাদ রটে যে তিনি প্রথমার চেয়ে দ্বিতীয়াতে অধিক অনুরক্ত সেই আশঙ্কায় তিনি সে-বেচারির সঙ্গে লোকদেখানো কঠোর ব্যবহার করেন। বিধবা কন্যাকে যতসব বাহারে শাড়ি কিনে দেন, সধবা স্ত্রীকে কিনতে দেন তার সাদাসিধে সংস্করণ। সে বেচারির যদি কোনো শখ থাকে সেটা মেটে সুমিত্রার সৌজন্যে। তিনি সুমিত্রার কোনো কিছুর তারিফ করলে সুমিত্রা তখনি প্রস্তাব করে, ‘মা, তোমাকে এটা দিই?’ তিনি আপত্তি করেন, ‘না, না, তা কি হয়? আমি বুড়ো মানুষ, আমার গায়ে এটা মানাবে কেন?’ সুমিত্রা তাঁকে জোর করে পরিয়ে দিয়ে বলে, ‘চমৎকার মানিয়েছে; আজ আমরা মুনসেফ বাবুদের বাড়ি বেড়াতে যাব।’

সোম এসব জানত। তাই ছোটো মা তাকে যা বলেছেন তা যেন তার বাবার বক্তব্য নয় এই ভান করে বাবার সামনে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

জাহ্নবীবাবু চোখের চশমা নাকে নামিয়ে তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন।

সোম বলল, ‘ভারি ভাবনায় পড়ে গেছি। কোনখান থেকে যাত্রারম্ভ করি স্থির করতে পারছিনে। আগে যাব পূব-মুখে লালমণির হাট, না আগে যাব পশ্চিম-মুখে লাহেরিয়া সরাই—একেই বলে উভয়সংকট।’

'হুঁ।' কিছুক্ষণ চিন্তার ভান করে জাহ্নবীবাবু বললেন, 'সর্বসিদ্ধিপ্রদ কাশীধাম। সেইখান থেকে যাত্রারম্ভ হলে শুভ। দেওঘরও পুণ্য পীঠ। যিনি বিশ্বেশ্বর তিনিই বৈদ্যনাথ। কালীঘাটের কালীও জাগ্রত দেবতা। তোমরা তো প্রায়শ্চিত্ত করবে না। দেবদর্শনে প্রায়শ্চিত্ত আপনা থেকে হয় তাও করবে না?'

সোম শশব্যস্তে বলল, 'নিশ্চয় করব। কেন করব না? তবে শুনছি দেবদর্শনের সঙ্গে আরও কী দর্শন করতে হবে।'

'আমিও তোমাকে তাই বলব-বলব করছিলুম।'

'আমার অনিচ্ছা নেই! তবে আমার একটি ব্রত আছে।'

'ব্রত আছে!'

'আজ্ঞে হাঁ। ব্রত আছে। আমার নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই, আপনারা যাকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই বিয়ে করব। কিন্তু—'

জাহ্নবীবাবু কান খাড়া করে রইলেন।

'কিন্তু বিয়ের আগে তাকে আমি গোপনে কিছু বলতে চাইব।'

'কী বলবে?'

'বলব আমার নিজের ইতিহাস।'

'না, না, না, না।' তিনি ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকলেন দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো, আর গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো তাঁর মুখ থেকে ছুটতে থাকল, না, না, না, না।

'বেশ। আমি বিয়ে করব না।'

'আহা, আমাকে বলতে দাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি গোপনে কিছু বলবে, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু সেটা বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরে।'

'না, বাবা।'

'কেন, অন্যায় কী বললুম?'

'অন্যায় এই যে, বিয়ের পরে যদি ওকথা শোনাই তবে সে হয়তো বলবে, আগে শুনলে আমি বিয়েই করতুম না।'

'হা-হা-হা-হা। অমন কথা কোনো হিন্দু স্ত্রী বলতে পারে? বিলেত গিয়ে তুমি ক্রিশ্চান হয়ে এসেছ দেখছি।'

'বেশ। আমি বিয়ে করব না।'

''হুঁ।'' তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাদেরই দোষ। ভালো চাকরির মোহে ছেলেগুলোকে বিলেত পাঠাই, চাকরিও আর হয় না, হয় শুধু শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর।'

সোমের ইচ্ছা হল বলে, আমি তো স্কলারশিপ নিয়ে গেছি, কিন্তু ওই আগুনে ইন্ধন দিয়ে কী হবে!

'এখন বুঝতে পারছি,' জাহ্নবীবাবু আবিষ্কার গৌরবে বললেন, 'কেন লোকে ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে বিয়ে দিয়ে রাখে। দাশরথি তাই করেছেন, দৈবকীও তাই বলেছেন। আমি আমাদের সিবিলিয়ান কবির ভাষায় ভাবলুম, 'চাকরি না করে বিয়ে করা গোরু ভেড়ার ধর্ম'। এখন দেখছি চাকরিও হল না, ধর্মও গেল।'

সোম আর সেখানে দাঁড়াল না। শ্রোতার অভাবে জাহ্নবীবাবু অগত্যা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

দাদাকে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে দেখে সুমিত্রা সকৌতূহলে শুধাল, 'কোথায় আগে যাওয়া স্থির করলে?'

সোম বলল, 'রাজপুতানায়। সেখানে এতগুলো মহারাজা মহারাণা মহারাও আছে, কেউ-না-কেউ আমাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখবে। চাকরি যার উপজীবিকা সরকারি প্রোফেসারি ছাড়া কি তার নাস্তি গতিরন্যথা?'

'সে কী, দাদা,' সুমিত্রা বলল, 'আমরা যে আশা করেছিলুম তুমি বউ আনতে যাবে।'

সোম হেসে বলল, ‘আমি কি দিব্যি দিয়ে বলছি যে রাজপুতানায় বউ পেলে আনব না? কে জানে কোন রাজপুতানি আমার শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ম্বরা হবে।’

‘বা কী মজা! রাজপুতানি বউদি আসবে। নাম তার মীরাবাঈ কি তারাবাঈ। দাদার শ্বশুরের পাকানো গোঁফ কানের কাছে চুলের সঙ্গে বাঁধা। দাড়িতে সিঁথিকাটা, দুদিকে দুই চাঁপা ফুল গোঁজা। নাম হয়তো তলোয়ার সিং। কী মজা!’

সুমিত্রা তালি দিতে দিতে ছোটোমা-র কাছে গিয়ে খবরটা দিল। তিনি ছুটলেন স্বামীর কাছে। বললেন, ‘ওগো শুনেছ? ছেলে যাচ্ছে রাজপুতানা, চাকরির খোঁজে। ওদেশে নাকি বাইজি বিয়ে করবে।’

‘কী বিয়ে করবে? কী বিয়ে করবে?’

‘বাইজি!’

‘কুষ্মান্ডটাকে বলো চাকরির জন্যে অতদূর যেতে হবে না, সরকারি চাকরির আশা আছে।’

ছোটোমা সোমের কানে ওকথা পৌঁছে দিলে সোম বলল, ‘সে চাকরি যখন হবে তখন হবে। ততদিন বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করতে প্রবৃত্তি হয় না।’

তিনি তখন স্বামীর কানে ওকথা তুললেন। স্বামী বললেন, ‘ওর ভাবী স্ত্রীকে ও যদি কিছু নির্জনে বলতে চায় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।’

সোম এর উত্তরে ছোটোমা-র মারফত বলল, ‘যাকে ওকথা নির্জনে বলব সে ভাবী স্ত্রী হতে অস্বীকৃত হতে পারে।’

ছোটোমা-র মধ্যস্থতায় বাবা বললেন, ‘মেয়ে অস্বীকৃত হলে কী আসে যায়? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তা অর্থে বরকর্তা ও কন্যাকর্তা।’

ছোটোমা-র মধ্যস্থতায় সোম এর উপর মন্তব্য করল, ‘তবে বরকর্তা কন্যাকর্তার পাণিগ্রহণ করুন। মন্ত্রপাঠপূর্বক নারীধর্ষণ আমার দ্বারা হবে না।’

এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে ছোটোমা পড়লেন হাঁপিয়ে। বাপও ছেলের মুখ দেখবে না, ছেলেও বাপের সুমুখে দাঁড়াবে না। ছোটোমা সুমিত্রাকে ডেকে বললেন, ‘আমি আর পারিনে। তুমি হও এদের টেলিফোন।’

সুমিত্রা বলল, ‘বাহবা বাহবা বেশ।’

সুমিত্রা কানে শুনল, ‘ওকে বল, ও যা বলবে তা শুনে মেয়ে যাতে বিয়ে করতে অস্বীকৃত না হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে।’

মুখে বলল, ‘বাবা বলেছেন, তোমার কাহিনি শুনে মেয়ে রাগ করবে কি, উলটে ভাববে যার কলঙ্ক আছে সেই চাঁদ, তাকে বিয়ে না করলে কাকে বিয়ে করব, জোনাকিকে?’

সোম জেরা করল। বলল, ‘বাবা কখনো অমন কথা তোর সাক্ষাতে বলেননি। বাবার নাম করে মিথ্যা বললি?’

তখন সুমিত্রা আর কী করে, সত্য বলল।

সোম বলল, ‘মেয়ের আন্তরিক স্বীকৃতি না-পেলে শেখানো স্বীকৃতি আমার কোন কাজে লাগবে?’

সুমিত্রার দ্বারা পল্লবিত হয়ে বাবার কানে উঠল, ‘দাদা বলছে তোতাপাখির মতো যে-মেয়ে না বুঝেসুঝে ‘হাঁ’ বলবে দাদা তার অভিভাবককে বেশ বুঝেসুঝে ‘না’ বলবে।’

বাবা চটেমটে বললেন, ‘কী! বলেছে কল্যাণ ওকথা!’

তখন সুমিত্রা ডালপালা ছেঁটে মূল উক্তিটি আবৃত্তি করল।

বাবা বললেন, ‘জিজ্ঞাসা কর আন্তরিক স্বীকৃতি যদি পায় তবে বিয়ে করবে তো? না, অন্য ওজর-আপত্তির আশ্রয় নেবে?’

সুমিত্রার আর ভালো লাগছিল না টেলিফোন হতে। যাতে কল্পনার দৌড় নেই সে কি খেলা?

দাদাকে বলল, 'কথোপকথনের এই শেষ। তিন মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় টেলিফোন-গার্ল সতর্ক করে দিচ্ছে।'

সোম বলল, 'আন্তরিক স্বীকৃতির পিছনে কী প্রকার মনোভাব রয়েছে সেটাও ধর্তব্য। তা যদি হয় করুণা, কিংবা সংশোধনেচ্ছা, কিংবা ব্যবসায় বুদ্ধি—অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করলে কত সুবিধা তাই নিয়ে হিসাবিয়ানা—, কিংবা Cynicism—অর্থাৎ পুরুষমানুষের ইতিহাস ও ছাড়া আর কী হবে—, তবে আমার বিদায়।'

বাবাকে দাদার শেষ বার্তা দিয়ে সুমিত্রা বলল, 'এবার দাও তোমার শেষ বার্তা। টেলিফোনের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।'

জাহ্নবীবাবুর ইচ্ছা করছিল বলতে, আমার মাথা আর ওর মুন্ডু। কিন্তু শেষ বার্তারূপে ওই বাক্যটির উপযোগিতা ওঁকে সন্দিগ্ধ করল। ছেলে যদি টং হয়ে রাজপুতানা চলে যায় ও বাইজিকে ঘরে আনে—কিছুই বলা যায় না, আজকালকের ছেলে—তবে নিজের ইহকাল ও পূর্বপুরুষের পরকাল দুই একসঙ্গে খাবে। অমন খানা ওর মুখরোচক হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওর মুখে বাড়িয়ে দেওয়া কি সংগত?

চিন্তা করে বললেন, 'পুত্রবরের নিকট আমার শেষ নিবেদন এই যে, উনি আপাতত কাশী, দেওঘর প্রভৃতি দু চার স্থলে পরীক্ষা করে দেখুন ওঁর প্রিন্সিপল, আমার পলিসির থেকে কোন অংশে কার্যকরী ও ফলপ্রদ।'

সোম ভেবে দেখল পিতা প্রকারান্তরে তার লঘিষ্ঠ দাবী মেনে নিয়েছেন, অতএব পিতার গরিষ্ঠ দাবি—কাশী, দেওঘর ইত্যাদিতে প্রিন্সিপল-এর পরীক্ষণ—অসংকোচে স্বীকার করা যায়। অল্পে সন্তুষ্ট হলে চাকরি যেকোনোদিন যেকোনোখানে জোটে, একশো টাকার হেডমাস্টারি দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু যে-মেয়ে তাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করবে তার সন্ধানে যাত্রা করা তো কঠিন অ্যাডভেঞ্চার।

রাত্রে বাবার পাশে বসে খাওয়ার সময় সোম বলল, 'কাশী যাব স্থির করলুম।'

জাহ্নবীবাবুর মুখভাবে সুখের লক্ষণ ছিল না। তিনি বললেন, 'যাবার আগে একটা তার করে দিও দাশরথিকে। ঠিকানা ভেলুপুরা।'

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা জমল না। সুমিত্রার সঙ্গে যখন দেখা হল সোম বলল, 'সুমি, রাজপুতানার জন্যে বাক্স-বিছানা বেঁধে শেষে চললুম কাশী।'

'কেন যে ওখানে যাচ্ছ, দাদা। ওখানে তোমার হবে না।'

'তুই কেমন করে জানলি?'

'তোমার যেমন ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা, তুমি ভীষ্মের মতো আইবুড়ো থেকে যাবে।'

'সেও ভালো, তবু ঠকিয়ে বিয়ে করব না।'

'তুমি কি সত্যি অন্ধ, না অন্ধতার ভান করছ, না বিলেত যারা যায় তারা সবাই এমনি?'

'তোর কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় তুমি সত্যি অন্ধ। নইলে তুমি কখনো ধরে নিতে না যে-কোনো মেয়ে তোমার কাহিনি শুনে বাস্তবিক শক পাবে। নেহাৎ যদি অপোগন্ড না হয়।'

'তুই আমার কাহিনির কী জানিস! আমার আসল কাহিনির প্রদ্যোত সিং-ই বা কী জানে! বাবা আমাকে যতটা খারাপ বলে জানেন আমি তার বেশি খারাপ এবং সেজন্যে অনুতাপ করিনে।'

'বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তোমার স্ত্রী শক পেত না, যদি বিয়ের পরে জানত।'

'তার মানে তুই বলতে চাস যে নারীর মন স্বভাবত অসাড়। আমি কিন্তু নারীকে পাষাণী বলে ভাবতে আজও প্রস্তুত হইনি, সুমি। ওইটুকু রোমান্টিসিজম এখনও আমার চিত্তে অবশিষ্ট, মানুষের শরীরে যেমন অ্যাপেন্ডিক্স।'

'আমি বলতে চাইনে যে আমরা পাষাণী। আমরা কাজের লোক, আমরা খুদকুঁড়ো যা পাই তাই নিই ও তাই দিয়ে রান্না চড়াই। স্বামী কুষ্ঠরোগী হলেও আমরা তাকে দোষ দিইনে, সমাজকেও দুষিনে, কাঁদি অদৃষ্টের কাছে, তাও স্বামীকে খারিজ করবার জন্যে নয়, স্বামীর কুশলের জন্য। জগতে একপক্ষকে সয়ে যেতে হয়,

আমরা সেই সহিষ্ণু পক্ষ। নইলে কোনো পক্ষেই শান্তি থাকত না, একপক্ষ হত বুনো ওল আর অপর পক্ষ হত বাঘা তেঁতুল।

সোম হাসল। বলল, 'বুনো ওলের নায়িকা বাঘা তেঁতুল। জগতে যখন আমি আছি তখন সেও আছে। সে শক পাক বা না পাক, তার মধ্যে ঝাঁজ থাকবে, প্রাণ থাকবে। নারী তো কত আছে, আমার সবর্ণা না হলে কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করব? এসব কথা বাবা বুঝবেন না। তাই তার সঙ্গে করতে হল এমন একটা প্যাক্ট যে, আমার দিক থেকে রইল না কোনো প্রতিশ্রুতি অথচ তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললুম কাশী।'

'ও! এই তোমার মতলব?' সুমিত্রা কৌতুক কলরোলে গৃহ মুখরিত করল। ছোটোমা ছুটে এলেন। সোম বলল, 'এই চুপ, চুপ, চুপ।'

ছোটোমা বললেন, 'বলো, বলো কী নিয়ে এত হাসাহাসি হচ্ছিল!'

'জান না বুঝি? দাদা কাশী যাচ্ছে একটি বাঘা তেঁতুলের খোঁজে। আমি বলি অতদূর যেতে হবে না থার্ড মুনসেফের মেয়ে নন্দরানি থাকতে।'

ছোটোমাও হাসলেন। চলে যেতে যেতে বললেন, 'নন্দরানির মাটিও সেই জাতের।'

২
শিবানী

কাশীতে বাড়ি করায় বিপদ আছে। পরিচিত, অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, পরিচিতের পরিচিত, অপরিচিতের পরিচিত, অর্ধ-পরিচিতের পরিচিত, যিনিই সদলবলে তীর্থ করতে আসেন তিনিই দিব্য সপ্রতিভভাবে গাড়ি থেকে স্থাবর ও অস্থাবর পোঁটলা-পুঁটলি নামিয়ে গাড়োয়ানকে বিদায় করতে করতে হতভম্ব দাশরথিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দেখুন, এটা কি দাশরথিবাবুর বাড়ি?'

দাশরথিবাবু প্রশ্নকর্তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ঘোমটা-দেওয়া পুঁটলিগুলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন। বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এইটেই দাশরথি বাবুর ছত্র। আমিই দাশরথি।'

প্রশ্নকর্তা বিনয়াবনত হয়ে একটি নমস্কার করেন। তারপর পোঁটলাপুঁটলির দিকে ফিরে উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রণাম করো। প্রণাম করো। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ জজ দাশরথিবাবু।'

দাশরথিবাবু এরপর কেমন করে এতগুলি ভক্তকে তাড়িয়ে দেন? অন্দরে গিয়ে গিন্নিকে ডাকেন, 'ওগো যাদুমণি।'

যাদুমণিকে খুলে বলতে হয় না। তিনি সম্বোধনের সুর থেকে আন্দাজ করেন যে বাড়িতে অভ্যাগত এসেছে। অর্ধেক জীবন কোথায় রাউজান, কোথায় হাতিয়া, কোথায় জাজপুর, কোথায় জামুই এইসব দুর্গম জায়গায় কাটল, একটিও অভ্যাগত এল না। এখন কাশীতে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে এসে সঞ্চিত অর্থটুকু খুঁটতে খুঁটতে নিঃশেষ করে দিল। হায়, এমন দিন গেছে যেদিন তাঁরা মাছ খেতে পাননি, সপ্তাহে দু-দিন হাটে মাছ পাওয়া যায়। মাছ না-খেয়ে-মিষ্টি না-খেয়ে বছরের পর বছর যা বাঁচালেন কাশীতে বাড়ি করে পরকে পাঁচরকম খাইয়ে তার অবশিষ্ট থাকল না।

সাধে কী যাদুমণির দাঁত দিয়ে বিষ ক্ষরিত হয়? দাঁতও আব্রুহীন, অধরের অবগুণ্ঠন মানে না। যাদুমণি ঝংকার দিয়ে লঙ্কামরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। দু-দিন বাদে অভ্যাগতের তীর্থদর্শন ফুরিয়ে যায়, পোঁটলাপুঁটলি বাড়ি ছেড়ে গাড়িতে ওঠে।

তবু দাশরথিবাবুর ছত্রে লোকাভাব ঘটে না। তাঁরও পুণ্য হয়, লোকেরও ধর্মের জন্যে অর্থ দিতে হয় না।

এই ধারায় জীবনপ্রবাহ বইছিল কাশীতে। এদিকে দাশরথিবাবুর দেশে মুর্শিদাবাদে তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রী শিবানী মাসে আধ ইঞ্চি করে বাড়তে বাড়তে চোদ্দো বছর বয়সে লম্বায় চওড়ায় চৌকস হয়ে উঠছিল। শিবানীর বাড় দেখে তার বাবা মৃগেন্দ্রবাবুর ব্লাড প্রেশার যাচ্ছিল বেড়ে। ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দাশরথিবাবু শিবানীকে আনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। উদ্দেশ্য এই যে, কাশীতে যখন এত বাঙালির আসা, যাওয়া, শিবানীকে দেখে তাদের কারুর পছন্দ হতে সময় লাগবে না। যাদুমণি দেওরের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ দেওর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার অনুগত না-হয়ে নিজের স্ত্রীর অনুগত। তবু শিবানীকে পাত্রস্থ করবার দায়িত্ব নিলেন শুধু অতিথিদের ওপর যে খরচটা হচ্ছে সেই খরচটাকে সার্থক বলে মনে করতে। অপব্যয় নয়, প্রয়োজনীয় ব্যয়, দেওরের হিতার্থে। ভাই হয়ে ভাইয়ের এমন উপকার কলিযুগে আর কে, কোথায় করেছে? কার ভাইঝিকে দেখবার জন্যে দেশসুদ্ধ মানুষ কাশীতে এসে অতিথি হচ্ছে? কে এই ভ্রাতৃবৎসল কলির দাশরথি এবং কে তাঁর সীতা?

অতিথিদেরও এতে মুখ রক্ষা হল। তাঁরা আশ্রয়ের যাচক হয়ে আসেননি, তাঁরা মেয়ে দেখতে এসেছেন, মেয়ে দেখে অনুগৃহীত করতে। গাম্ভীর্যের ভান করে শিবানীকে যাচাই করেন, বিস্ময়ের ভান করে মন্তব্য করেন, 'বাস্তবিক আজকালকার বাজারে এমন পাত্রী দেখা যায় না।' কথা দিয়ে যান বাড়ি পৌঁছেই চিঠি লিখে দিনক্ষণ স্থির করবেন। তারপর তাগাদা দিলেও চিঠি লেখেন না। তবু দাশরথিবাবু অভ্যাগতকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা যখন গাড়ি থেকে গোষ্ঠীসমেত নামেন ও দু-চার কথার পর বলেন, 'দাশরথিবাবু, আপনার সেই প্রসিদ্ধ

ভাইঝিটিকে দেখতে কাশীতে এলুম' তখন দাশরথিবাবু অন্দরে প্রবেশ করে গৃহিণীকে ডাক দেন, 'ওগো যাদুমণি।'

যাদুমণি বিদুষী না হলেও নারী, ইনটুইশন তাঁর জন্মগত ও মর্মগত। তিনি সবই বোঝেন, তবু মনকে প্রবোধ দেন এই বলে, 'জীবনে যত মাছ হল না খাওয়া তাদের দাম মিছে জমাতে যাওয়া। টাকা জমিয়ে কী হবে? সঙ্গে যাবে?'

পাড়ায় থাকতেন এক সিভিল সার্জনের স্ত্রী—অবসরপ্রাপ্ত। (স্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত নন, সিভিল সার্জন স্বয়ং অবসরপ্রাপ্ত) মহিলাটি মহিলা মহলের মোড়ল। শিবানীকে কেউ পছন্দ করছে না শুনে দু-চারটে টোটকা বাতলে দিলেন। বলেন, 'বিজ্ঞানের অসাধ্য কী আছে? আর বিজ্ঞান খাটে না কোন বিষয়ে? মেয়ে-দেখানো কাজটি বৈজ্ঞানিকভাবে করে দেখুন, ফল অবশ্য পাবেন।' তিনি ফি দাবি করেন না, পাড়ার মহিলারা তাঁকে ধরাধরি করে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর নির্দেশমতো দর্শনীয়া কন্যার প্রসাধন করেন। (টীকা—'ধরাধরি করা' এখানে দ্ব্যর্থবাচক।)

'ও শাড়ি পরালেই হয়েছে! মরি মরি কী রুচি! খোঁপাটা অমন কুকুরের ল্যাজের মতো হল কেন শুনতে পারি? ব্রোচটা ওখানে বসবে না, বিশ্রী বেমানান দেখায়।'

সিভিল সার্জনের স্ত্রীর টোটকা অনুসারে দ্রৌপদীর মতো প্রতিদিন দু-বেলা শাড়ি বদলাতে বদলাতে শিবানী একটি পুতুলের মতো অসাড় হয়ে উঠল। তার মাথার চুলও ক্রমাগত খোলা হচ্ছে, বাঁধা হচ্ছে, তৈলাক্ত হচ্ছে, ধৌত হচ্ছে। তার হাত-পায়ের নখ ঘসা হয়, কাটা হয়, পালিশ করা হয়, রঙিন করা হয়। তবু ফল পাওয়া যায় না। গাঙ্গুলি গৃহিনী বলেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে। বিজ্ঞান তো ভোজবাজি নয় যে দেখতে দেখতে বীজ থেকে গাছ গজিয়ে সেই গাছে আম ফলবে।'

বেনারসি শাড়িতে ফল হয় না, সুতরাং কাশ্মীরি শাড়ি পরো। কাশ্মীরিতে ফল হয় না, অতএব বোম্বাই শাড়ি পরো। তাতেও ফল হয় না, মাদ্রাজি শাড়ি পরো।

কে এক অর্বাচীন টিপ্পনী করলেন, 'তার মানে একশোটা গুলি মারলে একটা লেগে যাবে। তাহলে বিজ্ঞান আর কী হল।'

গাঙ্গুলি-গৃহিণী সিডিশনের গন্ধ পেয়ে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'হয়েছে! হয়েছে! মা-মাসিমার চেয়ে তুমি বেশি জানো দেখছি! তবে তুমিই সবাইকে পরামর্শ দাও। আমরা তাহলে এখান থেকে উঠি।'

বলা যত সহজ ওঠা তত সহজ নয়। গাঙ্গুলি গৃহিণী রথের পথে পুরীর জগন্নাথ মূর্তির মতো দুলতে থাকলেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে এগিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করল না।

বোঝা গেল তাঁর প্রতিপত্তি—বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি—অস্তমিত হয়েছে। যার পরামর্শে ফল হয় না, তাকে মোড়ল বলে মানতে কেউ প্রস্তুত নয়।

শিবানীকে দেখে যাদের অনুমান হয় যে ওর বয়স উনিশ-কুড়ি তারা মূর্খ। তার দেহে এখনও লাবণ্যের বন্যা আসেনি। তার সর্বাঙ্গ ভরে উঠে ঢল ঢল করেনি ও দু-কূল ছাপাতে উদ্যত হয়নি। সে হচ্ছে সেই জাতীয় লতা যার বৃদ্ধি দ্রুত ও ঘন হলেও যে পুষ্পিতা হবার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

প্রৌঢ়রা একটি রাঙা টুকটুকে বউমা পেলে খুশি হন, তাঁদের পক্ষে শিবানী যথেষ্ট কমনীয় নয়, কচি নয়। আর যুবকরা চান শ্রীসম্পন্না বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণী বধূ, শিবানীকে তাঁরা ছ-সেরা বেগুনের মতো একটা অপরূপ পদার্থ জ্ঞান করেন। তার রং ময়লা। কালো মানুষদের দেশে সেটা তার এক মস্ত অপরাধ। কিন্তু সেজন্যে সে নিজে চিন্তিত নয়, চিন্তিত তার বাবা মৃগেন্দ্র, মা সৌদামিনী, তার জ্যাঠামশাই দাশরথি। কেবল তার জ্যাঠাইমা যাদুমণি বলেন, 'পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে সব কটাই ধলা হবে এ তোমার ইংরেজের দেশে হয় কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু কালা-ধলা দুই না-থাকলে ভগবানের সৃষ্টি একাকার হয়ে যেত।' একথা যখন তাঁর মুখে তাঁর স্মরণে তখন তাঁর দাঁতের কথা।

চিন্তা করতে, উদ্বিগ্ন হতে, বিরক্ত হতে শিবানী জানে না। তাকে যে যা করতে বলে সে তাই করে, তবু খাটুনির চাপে তার বাড় থামে না। ওজন কমাবার জন্যে তার ভোজন কমানো হয়, কিন্তু শরীর তার যেন মনসা সিজের ঝাড়। পড়াশুনো সে তার সাধ্যমতো করেছে। মেয়ে ইশকুলে ক্লাসে-ওঠা বাড়িতে সিঁড়ি-ওঠার চেয়ে সোজা, দেশে ফোর্থ ক্লাস অবধি উঠেছিল। তারপর কাশীতে এসে দু-বেলা সাজতে ও সাজ খুলতে ব্যাপৃত থাকায় ইশকুলে হাজিরা দেবার সময় নেই বলে ভরতি হয়নি। দাশরথিবাবুর একমাত্র দুহিতা—যিনি প্রকৃতপক্ষে বিধবা হলেও কলেজে কুমারী বলে আখ্যাতা —তাঁরই কাছে শিবানী মুখে মুখে ইংরেজি কথোপকথন শিখছে। তাকে গান শেখানোর জন্যে সপ্তাহে তিন দিন একজন আসেন—ওস্তাদ নন, কারণ ওস্তাদের ধৈর্যের সীমা আছে, যদিও অন্যের ধৈর্যের সীমা সম্বন্ধে ওস্তাদ হচ্ছেন নাস্তিক।

এই যার মোটামুটি পরিচয় সে যে সোমের মতো পাত্রের উপযুক্ত নয় তা কি দাশরথিবাবুরা জানতেন না? জানতেন। তবে সম্বন্ধ করলেন কেন? কারণ দাশরথিবাবুর এক ছেলে বিলেত ঘুরে এসেছে, আর এক ছেলে বিলেতে সাত বছর থেকে Accountancy শিখছে, মেয়েকেও তিনি বিলেত পাঠাবার কল্পনা করেছেন—যদি সে সরকারি স্কলারশিপ পায়। কাজেই দাশরথিবাবুর ভাইঝিকে যে বিয়ে করবে তার স্ত্রীভাগ্য যাই হোক শ্যালক ও শ্যালিকাভাগ্য গৌরবময়। শ্যালক ও শ্যালিকা সম্পদই তার যৌতুক। আর স্ত্রীও তো কাঁচামাল, তাকে দিয়ে যা বানাবে সে তাই বনবে। নিজের হাতে গড়ে নাও। কোনো আফশোস থাকবে না। সেই তো গার্হস্থ্য স্বরাজ। আজকাল ঘরে ঘরে এত দাম্পত্য অশান্তি কেন? লোকে পরের হাতে তৈরি মেয়ে বিয়ে করে বলে। সব ল্যাঙ্কেশায়ারের কলে প্রস্তুত।

কাজেই সোমকে শিবানীর বর করতে দাশরথিবাবুদের দ্বিধা ছিল না, তাঁরা মনে মনে বলছিলেন, উপযুক্ত নয়? তবে উপযুক্ত করে নাও। শত শত ভদ্রলোক যাকে দেখে না-পছন্দ করলেন সোম যে তাকে পছন্দ করবে এতটা ভরসা তাঁদের ছিল না। তবে ওসব ভদ্রলোক আসলে হচ্ছেন কশাই, ওঁরা দাশরথিবাবুকে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, পণ কত দেবেন। দাশরথিবাবু প্রকারান্তরে বলেছিলেন, এক পয়সাও না। এমন সব শ্যালক-শ্যালিকা থাকতে পণ? দাশরথিবাবু ক্রমশ বুঝলেন যে পণ অনুসারে পছন্দ। তবু তাঁর মতো মানী ব্যক্তি পণের কড়ি নিয়ে দরদস্তুর করবেন এ কি কখনো সম্ভব? আর কৃপণও তিনি কম নয়। সবদিক থেকে খতিয়ে দেখলে সোমের মতো পাত্রই তাঁর আশার স্থল। জাহ্নবীবাবুও দাশরথিবাবুর কথা ঠেলবেন না, যদি তাঁর ছেলের দিক থেকে কোনো আপত্তি না থাকে।

দাশরথিবাবু মনে মনে একটা প্রকান্ড বক্তৃতা মুসাবিদা করলেন, যেন জুরির প্রতি জজের চার্জ। বাবা কল্যাণ, তোমরা নব্য তরুণ, তোমরা ভাবী ভারত, তোমরা পণ নিতে পারো না। কী চাও তোমরা? রূপ? দেহের রূপ যে দেহের চেয়েও নশ্বর। বিদ্যা? দুজনের মধ্যে একজন বিদ্বানই যথেষ্ট, নইলে বিরোধ অনিবার্য। ডিগ্রি? হায়রে দেশ! ডিগ্রির মোহ এখনও মুছল না! ভেবে দেখ কল্যাণ, পৃথিবীতে শাশ্বত যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে বনেদিয়ানা। আমরা বনেদি বংশ, কুলীন। আমাদের এভল্যুশনের জন্যে বহু শতাব্দী লেগেছে। এ বাড়ির মেয়ে কেবলমাত্র জন্মস্বত্বে এত বাঞ্ছনীয় যে চন্দনকাঠের বাক্সের মতো রঙিন প্রলেপের অপেক্ষা রাখে না। বাজারের মেয়ে হলে accomplishments-এর আবশ্যক থাকত। তোমরা গৃহশ্রী চাও না নটী চাও?

সোম দাশরথিবাবুর পরিচয় পেয়ে রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি একেবারে গলে গেলেন। বললেন, ‘থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে।’ নিজের বিলেতফেরত ছেলেও তাঁকে সকলের সাক্ষাতে এমন মর্যাদা দেয়নি। স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত তাঁর বাকস্ফূর্তি হল না—উত্তেজনায়। তারপর হাঁক দিলেন, ‘ওগো যাদুমণি।’ যাদুমণি বেরিয়ে আসতেই সোম তাঁকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম ঠুকে দিল। তিনিও হতবাক। সোম এদিকে একধার থেকে প্রণাম করতে লেগেছে। বাড়িতে দুই-তিনজন অভ্যাগত ছিলেন, তাঁরাও বাদ গেলেন না। দাশরথিবাবুর বিধবা মেয়ে কুমারী কাননবালা মিত্র চোখে চশমা এঁটে ওই পথ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, যেন সোমকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না—সোম তাঁর পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করলে, তিনি প্রথমে চকিত ও পরে এমন বিনম্রভাবে নমস্কার করলেন যে, পাঠক ওখানে উপস্থিত থাকলে

পাঠকের মনে হত মিস মিত্র ওই নমস্কারের মহড়া দিয়ে আসছিলেন পরশু থেকে তাঁর শোবার ঘরের আয়নার সম্মুখে।

কৌতূহলী হয়ে শিবানী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, পাছে সোমের ভক্তির আবেগ সাগরলহরীর মতো সেই সামান্য বালিকার চরণে চূর্ণ হয় এই আশঙ্কায় যাদুমণি বিশ্রী একটা নিষেধ বাক্যের দ্বারা সেই বালিকাকে স্বস্থানে স্তম্ভীভূত করে দিলেন। দেখেশুনে সোমও তার ভালোছেলেমির বেগ সংবরণ করল।

কে একটি চাকর এসে তাকে পাখা করতে লাগল। যাদুমণি বললেন, 'বোসো, বাবা বোসো।' দাশরথি বললেন, 'তোমাকে দেখেছিলুম মুনশিগঞ্জে, তখন তুমি চার পাঁচ বছরের।' যাদুমণি আপত্তি করে বললেন, 'না, না, আমার রবি তখন কোলে, আর এ ছেলে তখন হামাগুড়ি দিচ্ছিল।' দাশরথিবাবু বললেন, 'সে কী করে হয়?' স্বামী স্ত্রীতে এই নিয়ে ঘোরতর বচসা উপস্থিত। দুজনেই স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে কার, কখন চোখ উঠেছিল, হাম হয়েছিল, কাকে কোনখানে কাঁকড়াবিছেতে কামড়েছিল, ভূতে পেয়েছিল, কে কোন বার গলায় মাছের কাঁটা আটকে প্রায় পটল তুলেছিল—এই সকল অলিখিত তথ্য উদ্ধার করতে থাকলেন।

বাড়ির বুড়ি ঝি—বুড়ি ঝিদের নাম যা হয়ে থাকে তাই অর্থাৎ মোক্ষদা—তর্কের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক মায়ের মতো দেখতে—তেমনি চোখ, তেমনি ভুরু, তোমার—'

যাদুমণি বললেন, 'তুই ভারি মনে রেখেছিস মোক্ষদা। অবিকল বাপের মতো মুখ, যেন ঠাকুরপো নিজেই এসেছেন এত কাল পরে। হাঁ বাছা, তোমার বাবার খবর দিলে না যে? ভালো আছেন তো? তোমার নতুন মাকে আমি দেখিনি। বেশ ভালো ব্যবহার করেন তো? নতুন ভাইবোন ক-টি?'

দাশরথি বললেন, 'আহা, এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কেন?' এই বলে তিনি নিজেই আর একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। 'ওহে, লণ্ডনে ধূর্জটির সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হত?'

সোম ধূর্জটির নাম শুনেছিল, কিন্তু চেহারা দেখেনি। বলল, 'লণ্ডনের মতো বিরাট শহরে পাঁচ-শো বাঙালি ছাত্র কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া অসম্ভব। তাঁর ঠিকানাই জানতুম না।'

কর্তা-গিন্নি দু-জনেই ক্ষুণ্ণ হলেন। আশা করেছিলেন যে-খবর চিঠিতে পাবার নয়, সে-খবর দূতের মুখে পাবেন।

যাদুমণি দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ গা, রবি কোথায় পড়ত, গেলাস না বাটি কী তার নাম?'

মিস মিত্র ফিক করে হেসে বাপের হয়ে উত্তর দিলেন, 'ও মা, গ্লাসগো তোমার মনে থাকে না।'

যাদুমণি বললেন, 'এই তো তুই নিজমুখে বললি গ্লাস গো। আমিও বলেছি গ্লাস—তবে আমি মুখখু মানুষ, আমি গ্লাস না বলে গেলাস বলেছি। এই তো?'

'ওগো না গো, দাশরথি বুঝিয়ে বললেন, 'গ্লাস নয়, গ্লাসগো।'

যাদুমণি আগুন হয়ে বললেন, 'তামাশা করবার আর সময় খুঁজে পেলে না। গ্লাস নয় গো, গ্লাসগো, চুলো নয় গো, চুলো গো।'

দাশরথিবাবু পলায়ন করলেন। কাননবালা সোমকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'কত বার চেষ্টা করলুম, all in vain. তোতাকে কৃষ্ণ নাম শেখালে সে শেখে, কিন্তু to teach Mother English!'

মা কী বুঝলেন তিনিই জানেন, মুখ ভেঙিয়ে বললেন, 'বুঝেছি লো বুঝেছি। আমারই ঘরে বসে আমারই খেয়ে আমার নিন্দে। আমার শিল আমার নোড়া আমার ভাঙে দাঁতের গোড়া।'

মোক্ষদা বলল, 'হাঁ রে খুকী, তুই কী বলছিস ইঙ্গিরিজিতে? মায়ের দাঁত ভাঙবি?'

'তুই বের হ এখান থেকে হারামজাদি,' বলে যাদুমণি মোক্ষদার গায়ে যেন বিষ দাঁত বসিয়ে দিলেন। কাননবালার পিছু পিছু মোক্ষদাও দৌড় দিল।

বাকি থাকল সোম। যাদুমণি তাকে ব্যথার ব্যথী করলেন। লেখাপড়া যে তিনি জানেন না সেটা কি তাঁর দোষ? দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে, বারো বছর বয়সে তিনি মা—এক এক করে পাঁচটি সন্তান হারিয়ে তিনি যখন বিশের কোটায় পা দিলেন তখন যমরাজ তাঁকে দয়া করলেন, তাঁকে তিনটি সন্তান ভিক্ষা দিলেন।

তারপর সেই সন্তান তিনটিকে মানুষ করতে করতে আটাশ বছর অতীত হল, অতীতের স্মৃতি নিয়ে দুদন্ড কাটাবেন তার অবসর পেলেন না। মেয়েটিই সকলের বড়ো, তার কপাল পুড়ল বিয়ের মাস ছয় না যেতে। শ্বশুর-শাশুড়ি গরিব, নিজেরাই খেতে পান না, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল। ওর বাপ বললেন, একটিমাত্র মেয়ে, তার বিষণ্ণ মুখ দেখতে পারিনে, যাক ও ইশকুলে, যে ক্লাসে পড়ছিল সেই ক্লাসে পড়ুক, ইশকুলের খাতায় যে-নাম লেখা ছিল সেই নাম বহাল থাকুক। পড়াশুনোয় মেয়ের খুব মন, কিন্তু মাঝখানে হল পেটের ব্যারাম। ভুগতে ভুগতে বেচারির চারটি বছর নষ্ট। এই বার এম-এ দেবে। —যাদুমণি সগর্বে ভ্রূ বিস্তার করলেন। ততক্ষণে ভুলে গেছলেন যে মেয়ে তাঁর মূর্খতা নিয়ে পরিহাস করেছে।

সোম বলল, 'ধূর্জটিবাবু ও রবিবাবুর সঙ্গে বিলেতে পরিচয় হল না বলে আমি দুঃখিত।'

'রবি তো দেশে ফিরেছে। দুই ভাই এক সঙ্গে ওদেশে যায়, রবি ছোটো। আর সেই রবিই কি না পাঁচ বছরের মধ্যে পড়া শেষ করে বরোদায় কাজ পেয়ে গেল।' যাদুমণি সোমকে জিজ্ঞাসু দেখে যোগ করলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার।'

'আর ধূর্জটিবাবু?'

'ওকথা তুমি ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরো, বাবা। আমার এখনও দোরস্ত হল না। পাস করলে কোম্পানির হিসাব পরীক্ষা করবে, না কী করবে। এদিকে তো বাপের পেনশনটা সেই একলা গ্রাস করল। সে আর এইসব'—এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি চুপি—'কুটুম্বুরা।'

সোমও গলার সুর নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা সব কুটুম্বু বুঝি?'

চোখ টিপে যাদুমণি চুপি চুপি বললেন, 'বুঝতে পারলে না? কাশী বেড়াতে এসে ছত্রে খাবার ফন্দি এঁটেছে। কুটুম্ব নয়, কুটুম্বুর কুটুম্বু, তার কুটুম্বু। তাও নয়, কোথায় ওঁর নাম শুনেছে, এসে বলেছে আপনি আমার মামলা ডিসমিস করেছিলেন তেইশ বছর আগে আরামবাগে।'

সোম ফিসফিস করে বলল, 'ভাগিয়ে দেন না কেন?'

'ওরে বাপ রে। কাশীধামের পুণ্য যেটুকু হচ্ছে এই বুড়ো বয়সে সেটুকুও হবে না।' যাদুমণি অঙ্গভঙ্গিসহকারে উক্তিটাকে সচিত্র করলেন।

সোম আসবে এই খবর পেয়ে শিবানীকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, অন্যের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার তার দরকার ছিল না। সোমের পৌঁছোনোর পর আবার সাজ সাজ রব উঠল। ধূর্জটির স্ত্রী এই বাড়িতেই থাকেন, রবির স্ত্রী বরোদায়। ধূর্জটি তিন বছর আগে একবার দেশে এসে স্ত্রীকে দেখা দিয়ে গেছল, ফলে তাঁর একটি খোকা হয়, সেই খোকাটিকে বুকে করে তাঁর বিরহবেদনার উপশম হচ্ছিল। শিবানীকে সাজানোর ভার তাঁরই ওপরে পড়েছে।

কাননবালার কলেজ থাকায় তিনি এ বিষয়ে দায়িত্ববিরহিত। তিনি এসব বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। ভালো ছেলেরা যেমন টেরি কাটে না, সাবান মাখে না, শৌখিন পোশাক পরে না। কাননবালারও তেমনি কেশ আলুথালু, বসন এলোমেলো, ধরন অগোছালো।

আবার সাজ সাজ রব উঠল। এবার এসেছে বিলেতফেরতা পাত্র, পাড়ার পরোপকারিণীদের দ্বারে ডাকাডাকি করতে হল না; তাঁরা সাজ সাজ রবাহূত হয়ে নিজেরাই সেজেগুজে সমুপস্থিত হলেন। গাঙ্গুলিগিন্নি সেবারকার অপমানের কথা ধর্তব্য মনে করলেন না, তবে এবার মাদুরের উপর আসন না-নিয়ে, একখানা প্রশস্ত মজবুত চেয়ারে আসীন হলেন, যদি আবার অপমানিত হন, তবে গাত্রোত্থানের জন্য পরমুখাপেক্ষী হবেন না। এবার শিবানীর সংকট এত বিষম যে তাঁকে উপেক্ষা করবে কি সকলে তাঁকেই সংকটের তারিণী ভেবে স্তুতি করতে শুরু করে দিল।

সোম ঘুণাক্ষরে জানত না যে এত বড়ো একটা আয়োজন চলেছে শুধু তারই মনোহরণের জন্যে। সে আরাম করে সারা দুপুর জুড়ে নিদ্রা দিল। কে একটি ছোটো ছেলে তার শোবার ঘরে ঢুকে ছোটাছুটি করে

তাকে যখন জাগিয়ে তুলল তখন পাঁচটা বাজে। চোখ-মুখ ধুয়ে সে বসবার ঘরে গিয়ে দেখে দাশরথিবাবু সপার্ষদে তার প্রতীক্ষা করছেন। ‘এই যে, কল্যাণ। বসো, কেমন ঘুম হল। এতক্ষণ তোমার কথা এঁদের বলছিলুম। একেবারে মনে হয় না যে বিলেত থেকে ফিরেছ। কী ভক্তি, কী বিনয়, কী স্বদেশপ্রীতি—আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলুম প্যান্ট-কোট পরা সাহেবকে কী খাইয়ে কোথায় বসিয়ে আদর আপ্যায়ন করব!’

সমাগত অবসরপ্রাপ্তগণ নাকের উপর চশমা চড়িয়ে সোমকে পর্যবেক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। দু-বছর বিলেতে থেকে তার গায়ের রং যতটা ফর্সা হয়েছিল এই কয় দিনেই প্রায় ততটা ময়লা হয়েছে। তার চামড়ার নীচে যে বিদেশি প্রভাব উহ্য ছিল টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপেও তার পাত্তা পাওয়া যায় না, চশমা তো ছার। কাপড় চোপড় বাঙালির মতো দেখে তাঁরা চশমা খুলে রাখলেন। কতকটা হতাশ সুরে বললেন, ‘না, আদৌ মনে হয় না যে বিলেত প্রত্যাগত।’

তবু তাঁরা সে-দেশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চললেন। সোম সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে থাকল। তার অন্য দিকে হুঁশ ছিল না। হঠাৎ এক সময় পর্দা সরিয়ে দুই-তিন জন মহিলা একটি বালিকাকে ঘরের ভিতর জোরে ঠেলে দিলেন। পর্দা ছেড়ে দিলেন। বালিকাটি দুই হাতে একটি ট্রে ধরে তিরের মতো সোজা সোমের দিকে এগিয়ে এল। সোম যদি হঠাৎ উঠে তার হাত থেকে ট্রে-টি তুলে নিয়ে নিকটবর্তী টিপয়ের উপর না রাখত, তবে টাল সামলাতে না পেরে সে হয়তো সোমের গায়ে চা ঢেলে দিত।

সোমকে একটি সরল চাহনি অর্পণ করে সে নতমুখে দাঁড়িয়ে কী যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করল। যেন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই-এই করতে হবে, শেখানো কর্তব্য ভড়কে গিয়ে ভুলে গেছে। সোম যে হঠাৎ তার হাত থেকে ট্রে-টি কেড়ে নেবে এমন সম্ভাবনার জন্যে তাকে কেউ প্রস্তুত করে দেয়নি। সে যে ভূমিকায় অভিনয়ের তালিম পেয়েছিল তাতে কেউ ট্রে ছিনিয়ে নিলে ধন্যবাদ দিতে হয় এটুকুরও উল্লেখ ছিল না।

তাকে তদবস্থ দেখে কারুর করুণা উপজাত হওয়া দূরে থাকুক সোম ছাড়া সকলের কোপ উদ্রিক্ত হল, অভিনেতা পার্ট ভুলে গেলে অডিয়েন্সের যা হয়। দাশরথিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, ‘নমস্কার করো।’ মেয়েটি বার-এক চোখ মিট মিট করে শশব্যস্তভাবে নমস্কার করল। তখন সোম তার দশা হৃদয়ংগম করে তার ওপর থেকে সকলের মনোযোগ ছাড়িয়ে নিল। বৃদ্ধ কুঞ্জমোহনবাবুর কাছে ট্রেশুদ্ধ টিপয়টি স্থাপন করে করজোড়ে বলল, ‘আগে বয়ঃ প্রাচীন।’

কুঞ্জবাবুর মঙ্গোলীয় নয়নযুগল বিনা নেশায় ঢুলু ঢুলু। তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও সস্মিত হলেন। কিছু না বলে একটি রসগোল্লা তুলে নিয়ে টপ করে মুখে ফেলে দিলেন। দুই ঠোঁট একত্র হয়ে ‘আঁপপ’ বলে একটা শব্দ সৃষ্টি করল। তারপর গন্ডদ্বয়ের স্ফীতি প্রশমিত হল ও চোখের কোণ থেকে খানিকটা জল ঝরে গেল। তখন দাদা বললেন, ‘বেশ বানিয়েছে তো। একটা মুখে দিয়ে দ্যাখ না, দাশরথি।’ অতঃপর সুসজ্জিতা অন্য কয়েকটি মেয়ে ঘরে যতগুলি ভদ্রলোক ছিলেন ততগুলি থালা হাতে করে প্রবেশ করলেন ও সকলের হর্ষ বর্ধন করলেন।

সোম এতক্ষণে টের পেয়েছিল যে এইসব সজ্জন তাকে পরীক্ষা করতে আসেননি, এসেছেন পরীক্ষাধীনার পক্ষীয় হয়ে পরীক্ষককে তোষামোদ করতে। কিন্তু কোনটি পরীক্ষাধীনা? একটি না সব ক-টি? কেউ তো কারুর চেয়ে কম সাজেনি। যেন সকলের জীবনে আজ পার্বণ। হয়তো প্রত্যেকেই ভাবছে সোম কী মনে করে তাকেই পছন্দ করবে। বলবে, দেখতে এসেছিলুম বটে শিবানীকে কিন্তু পছন্দ হল আমার (জ্যোৎস্নার মনে মনে) জ্যোৎস্নাকে, (লিলির মনে মনে) লিলিকে, (শান্তিলতিকার মনে মনে) শান্তিলতিকাকে।

কিন্তু মরীচিকার মতো ওই সকল মায়াললনা কোথায় মিলিয়ে গেল। সোম দেখল, সেই সর্বপ্রথম মেয়েটি। (সেইটি শিবানী বুঝি) তখনও তেমনি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চল প্রতিমার মতো। সুরূপা নয়, বেশভূষা তার অঙ্গের সঙ্গে অসমঞ্জস, যেন তার নিজের নিত্যকার নয়। কেবল দীঘল ঘন চুল এলায়িত হয়ে তার মধ্যে যা কিছু লাবণ্য যোজনা করেছে। মেয়েটির মুখ ভাব বড়ো সরল। মনে হয় এ মেয়ে রূপকথা শুনে তার

প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঋজু, সরল। মনে হয় এ মেয়ে আরামকেদারায় বই হাতে করে ললিতা নয়, খাটতে অভ্যস্ত।

সোম নরম সুরে বলল, 'বসুন।'

মেয়েটি সত্যিই বসল। হুকুম যে। হুকুমের অবাধ্য হতে জানে না। ওদিকে দাশরথিবাবুরা মেয়েটার স্পর্ধা দেখে রুষ্ট হলেন। কিন্তু পালটা হুকুম করলেন না।

ভদ্রতার খাতিরে সোম দুটো একটা প্রশ্ন করল। দাশরথিবাবু বললেন, 'অতবার ওকে 'আপনি' আপনি' বলছ কেন বাবা। ও তোমার অনেক ছোটো।'—

কাঙ্গালীবাবু বললেন, 'সব দিক দিয়ে।'

সরোজিনীবাবু বললেন, 'লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের ওই পল্লিবালিকার তুলনা হয়! তবে ইনি যদি ওকে নিজগুণে গ্রহণ করেন—যদি ওর নির্গুণতা গ্রাহ্য না করেন তবে দুই জেলা জজের পারিবারিক সংযোগ বড়োই হৃদয়গ্রাহী হবে।'

চাটুভাষণ সমানে চলল।

পরদিন যাদুমণি প্রসঙ্গটা তুললেন। বললেন, 'কেমন লাগল, বাছা, শিবানীকে?'

সোম গত রাত্রে ভেবে রেখেছিল এর উত্তর। মেয়েটি এমন অবোধ যে ওকে প্রবঞ্চনা করা নিতান্ত সহজ এবং সেইজন্যে সর্বথা পরিহার্য। ওকে বিয়ে না করলেই চুকে যায়, কিন্তু বিয়ে করতে সোমের অনিচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ ওর প্রতি সোমের প্রগাঢ় মমতা বোধ হচ্ছিল। কে জানে কার হাতে পড়বে, শাশুড়ি দেবে ছ্যাঁকা, ননদ করবে চিলেকোঠায় বন্দি, স্বামীটি গোপালের মতো সুবোধ, প্রতিবাদ করবে না। ওর মতো অবোধ মেয়েরাই তো অত্যাচারকে আমন্ত্রণ করে।

বলল, 'ভালোই লেগেছে। তবে—'

'তবে?'

'তবে আমার একটি ব্রত আছে।'

'ও মা পুরুষ মানুষের কী ব্রত!' যাদুমণি তাঁর কন্যা কাননবালার দিকে তাকিয়ে সোমের দিকে ফিরে তাকালেন।

কাননবালা উৎকর্ণভাবে ছিলেন : বাক্য প্রক্ষেপ করলেন না।

সোম বলল, 'আমার ব্রত এই যে যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হবে তার সঙ্গে আগে একবার আমি নির্জনে কথা বলতে চাইব। কথাবার্তার পরে স্থির করব তাকে বিয়ে করব কি না।'

'কী বললে!' যাদুমণি যেন হালুম হালুম করতে লাগলেন বাঘিনীর মতো। 'কী বললে তুমি। নির্জনে কথাবার্তার পর বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখবে। ওগো শুনছ! খুকীর বাবা। ডাক দেখি খুকী তোর বাবাকে।' যাদুমণি গজরাতে থাকলেন।

দাশরথিবাবু এক পায়ের একপাটি চটি বৈঠকখানায় ফেলে এলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে বললেন, 'কী হয়েছে? কী? কী?'

যাদুমণি ততক্ষণে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন এবং সেই মিশ্র সামগ্রীকে সোমের ওপর আরোপ করে আরও কুপিত হয়েছেন। বললেন, 'তোমার বন্ধুর ছেলে বলছেন তোমার ভাইঝির সঙ্গে আগে নির্জনে কথা বলবেন, কী আর-কী করবেন, পরে বিয়ে করবেন, কী আর-কী করবেন। ভাইঝি, না বাইজি—কী দেখতে আসা হয়েছে কাশীতে?'

দাশরথিবাবু লজ্জিত, অপদস্থ, অপমানিত সোমকে ইঙ্গিতে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে!' বৈঠকখানায় পাশে বসিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিষম বদরাগী মানুষের পাল্লায় পড়েছিলে। আমি জানি উনি তিলকে বাড়িয়ে তাল করেছেন। আমাকে বলো তো আসল কথাটা।'

তখনও সোমের হৃৎকম্প হচ্ছিল। অপমানে তার বাকরোধ হয়েছিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। এই সময় কাননবালা এসে দাশরথিবাবুর কাছে আসন নিলেন।

'বলো বাবা, বলো। আমাকে তোমার বাবার মতো মনে করতে পারো।'

তবু সোম নির্বাক।

কাননবালা সোমের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'বিলেতফেরতা আধুনিক যুবকদের এ বাড়িতে আসতে বলবার সময় মা-র মুখে gag দেওয়া উচিত, যেমন দুষ্টু কুকুরের মুখে।'

'কী হয়েছে, তুই বল না খুকী।'

খুকী বললেন, 'হয়েছে যা তারজন্যে এই ভদ্রলোকের কাছে আমাদের মাফ চাওয়া উচিত। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসবশত যদি ইনি বলেই থাকেন যে শিবানীকে বিয়ে করবেন কি না স্থির করবার আগে একবার ওর সঙ্গে নির্জনে আলাপ করতে চান—যা ওদেশের একটা অতি নির্দোষ রীতি—তবে অন্যায় কিছু বলেননি। যে-কোনো মডার্ন যুবক তাই বলে থাকতেন ও যে-কোনো মডার্ন মেয়ে তাই প্রত্যাশা করে থাকত।'

দাশরথিবাবু শেষ পর্যন্ত শুনলেন কিনা সন্দেহ। একমনে ও দুই হাতের দশ আঙুলে দাড়ি বুরুষ করতে লাগলেন। যৌবনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। ভাব গেছে, প্রভাব আছে ও পরিপুষ্ট হয়ে আননভূমিতে কানন রচনা করেছে।

বহুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, 'যে সমাজে বাস করতে হচ্ছে সে সমাজের রীতি মান্য করতে হয়। নইলে তোর আমি পুনরায় বিয়ে দিইনি কেন?'

সোম আড়চোখে কাননবালার মুখে তাকিয়ে দেখল তিনি শরম-সিন্দূর বদনে কী যেন ধ্যান করছেন। নিশ্চয়ই তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর মর্ত্যরূপ নয়।

'আমার স্ত্রীর কথায়,' দাশরথিবাবু বলতে লাগলেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, কল্যাণ। এদেশে যা সম্ভব নয় তা ওদেশ থেকে ফিরে সম্ভব করতে চাও তো আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের উপর অধীত বিদ্যার প্রয়োগ না করে আমাদেরকে শান্তিতে মরতে দাও।'

সোম সাহসের সহিত বলল, 'কিন্তু মেয়েগুলি যে আপনাদের হাতে।'

'সেইজন্যেই তো বলছি আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো, তোমাদের নিজের নিজের মেয়ে হোক।'

'কিন্তু,' সোম উষ্মার সহিত বলল, 'আমি যা সম্ভব করতে চাই তা এমন কিছু নয়, একটু বাক্যালাপের নিভৃত অবকাশ।'

'না, না,' দাশরথিবাবু দাড়ি নাড়লেন। 'তুমি যে শুধু বাক্যালাপই করছ একথা পরে পাড়ার লোক বিশ্বাস করবে না।'

'আপনার ভাইঝির মুখে শুনেও বিশ্বাস করবে না?'

'না হে, না। ওদের মধ্যে যারা দুর্মুখ তারা ও-মেয়ের যাতে অন্যত্র বিয়ে না হয় সেই চেষ্টা করবে, বেনামি চিঠি লিখে পাত্র ভাঙিয়ে নেবে। ওদেরও তো বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। এক যদি তুমি কথা দাও যে শিবানীকে পরে বিয়ে করবে তবে লোকনিন্দা আমরা সামলে নিতে পারব, যদিও এত বড়ো বনেদি বংশের পক্ষে ওটা যেন বনস্পতির পরগাছা—বনস্পতিরই মতো দীর্ঘজীবী। আরও তো ছোটো ছোটো ভাইঝি আছে, ওদেরও একদিন বিয়ে দিতে হবে। না, হবে না?'

কাননবালার পাণ্ডুর মুখ যেন এই কথাটি বলতে চাইছিল যে, ওইসব আগত অনাগত শিশুদের বিয়ে হবে না বলে আমারও ভালো করে বিয়ে হল না।

সোম বলল, 'কথা আমি দিতে পারব না নিভৃতে কথা বলার আগে।' আপনাকে অহেতুক লোকনিন্দাভাজন করতেও আমার রুচি হবে না। অতএব বিদায়।'

'সে কী হে! তুমি এখনি উঠবে! হ্যাঁ!'

'যা অসম্ভব তার জন্যে আমি আর-এক পুরুষ কেন আর-এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পারবো না।'

'সে কী হে! অ্যাঁ!'

'যেতে হবে আমাকে সম্ভবের সন্ধানে—কুস্তোড় কলিয়ারি, নান্দিয়ারি, নান্দিয়ার পাড়া, লালমণির হাট, ভূসাওল, কোলাবা। একশো সাতচল্লিশটা ঠিকানার খোঁজ করতে হবে। সম্ভবকে এক জায়গায় বসে থাকলে চলে?'

দাশরথিবাবু বুদ্ধি ধার করবার জন্যে অন্দরে উঠে গেলেন। ডাকলেন, 'ও যাদুমণি।' স্বামী-স্ত্রীতে যতক্ষণ ধরে বুদ্ধি দেওয়া-নেওয়া চলল—ততক্ষণ বৈঠকখানায় সোম ও কাননবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কাননবালা সোমের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'বাস্তবিক, লোকনিন্দাকে এতটা ভয় করা অনুচিত।'

সোম কাননবালার দিকে বিশেষ করে তাকিয়ে বলল, 'লোকনিন্দার ভয়টা গৌণ। ভয় মুখ্যত আমাকে।'

কাননবালা ঘাবড়ে গেলেন। সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'কেন, আপনি কি বাঘ না ভালুক যে আপনাকে ভয় করতে হবে? এই তো আমি নিভৃত বাক্যালাপ করছি নির্ভয়ে।'

কপট গাম্ভীর্যের সহিত সোম বলল, 'সাবধান, মিস মিত্র। একাকিনী নারীর পক্ষে পুরুষ হচ্ছে বাঘ-ভালুকের চেয়ে ভয়াবহ। কারণ বাঘ যদি আঁচড় দেয় তবে সে আঁচড় একদিন শুকোতে পারে। কিন্তু আমি যদি হাতখানি ধরে একটু নেড়ে দিই তবে সে ব্যথার চিকিৎসা নেই।'

নার্ভাস হাসি হেসে মিস মিত্র বললেন, 'মডার্ন ইয়ংম্যানদের অহংকার দেখে এমন হাসি পায়। যেন আমরা কাচের পুতুল যে নাড়া পেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাব।'

সোম তেমনি গম্ভীরভাবে বলল, 'একবার নাড়া দিয়ে দেখব নাকি?'

'বেশ তো। দেখুন না।' কাননবালা মুচকি হেসে চোখ নামালেন।

সোমের সহসা স্মরণ হল যে, না, আগুন নিয়ে খেলা আর নয়। যথেষ্ট বার প্রেম করা হয়েছে। এবার করতে হবে বিয়ে।

দাশরথিবাবু যেন আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। 'তোমার কথাই রইল, কল্যাণ। শিবানী ও তুমি এই ঘরে বসে নির্জনে কথাবার্তা কইবে, আর তিন পাশের তিন ঘরে থাকব আমি, খুকীর মা ও খুকী।'

সোম বিরক্তি দমন করে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'তিন দিকের দরজা বন্ধ থাকবে, না খোলা থাকবে?'

'খোলা থাকবে।'

'তাহলে আর নির্জন কী হল?'

'না, না, বন্ধ থাকবে।'

'কোন দিক থেকে বন্ধ থাকবে—বাইরের দিক থেকে না ভিতরের দিক থেকে?'

দাশরথিবাবু বললেন, 'তাই তো! তাই তো! ওগো যাদুমণি।' আবার অন্দরে চললেন।

ইত্যবসরে কাননবালা বললেন, 'মডার্ন ইয়ংম্যানদের ধরন হচ্ছে মেঘের মতো যত গর্জায় তত বর্ষায় না।'

সোম চুপ করে থাকল।

তিনি বললেন, 'নাড়া দেব, নাড়া দেব। কই নাড়া? কেবল words, words, words.'

সোম আত্মসংবরণ করে সহাস্যে বললে, 'মনে হয় সুপক্ক অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন।'

তিনি সকরুণ স্বরে বললেন, 'আপনারা সকলেই সমান হৃদয়হীন। পরের হৃদয় সম্বন্ধে সমান উদাসীন।'

সোমের মধ্যেকার খেলোয়াড় ওই চ্যালেঞ্জ শুনে বলল, 'শিবানীর হৃদয়ের প্রতি উদাসীন থেকে অন্যায় করব না বলেই তো তাঁর সঙ্গে প্রাইভেট ইন্টারভিউ প্রার্থনা করছি। তবে কোন অপরাধে আমাকে হৃদয়হীন বললেন?'

কাননবালা এর উত্তর দিতে না পেরে অপ্রতিভ বোধ করলেন। আরক্ত মুখমন্ডল অবনত করে অস্পষ্টভাবে বললেন, 'আমি শিবানীকে লক্ষ করে বলিনি।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বেচারিকে আর নির্যাতন করে কী হবে! তাঁর দুঃখ দূর করা সোমের অসাধ্য। রোমান্সের ওপর তার অশ্রদ্ধা ধরে গেছল। ওর পরিণাম ভয়াবহ না হোক দুর্বহ। অথচ রোমান্সের সাহায্য ব্যতিরেকে এত বেশি বয়সের নারীকে বিবাহ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

সোম নীরব রইল। আর খেলা নয়।

পাঠ মুখস্থ করতে করতে দাশরথিবাবুর পুনঃপ্রবেশ। তিনি বললেন, 'বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে।'

'বাইরে থেকে যে বন্ধ থাকবে সারাক্ষণ তার স্থিরতা কী!'

'তুমি তো ভারি সন্দেহী লোক হে!'

'কে সন্দেহী লোক তা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে।' সোম উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, আসি।'

'অ্যাঁ!' দাশরথিবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'অ্যাঁ! বসো, বসো। আমার কথাটার সবটা শোনো আগে। তুমি বলছ, স্থিরতা কী? আমি বলছি, আমি প্রতিশ্রুতি দিলুম।'

'আপনি তো দিলেন, আপনার স্ত্রী?'

'আমার স্ত্রী পতিপ্রাণা।'

সোম মনে মনে বলল, 'আর আপনার কন্যাটিও ভাবী ভগ্নীপতি-প্রাণা।' মুখে বলল, 'আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলুম।'

তাই হল। শিবানীকে সোমের সঙ্গে রেখে তিন দিকে তিন দরজার আড়ালে পাহারা দিলেন কেবল ওঁরা তিন জন না, ওঁদের বউমা, ওঁদের দাসী মোক্ষদা এবং আরও অনেকে। সোমকে শুনিয়ে শুনিয়ে দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ হল। ক্রমশ গোলমাল থেমে এল। কিছুক্ষণ ফিসফিসানি চলল। তারপর সব চুপ। সকলে কান পেতে রইল সোম-শিবানী সংবাদ শুনতে।

সোম বলল, 'শিবানী'। তার পর পাঁচ মিনিট স্তব্ধ থেকে ওঁদের উৎকর্ণতাকে ক্ষুরধার করল।

সোম বলল, 'শিবানী, একটি দরজা খোলা আছে, চলো আমরা পালাই।'

ওঁরা কাশলেন। কাশীর কাশি, মহাকাশি।

সোম বলল, 'ওঁরা সবাই ওই তিন ঘরে বন্ধ, কে আমাদের আটকাবে? এই যে, ধরো আমার হাত। ধরলে তো? চলো।'

কপাটের খিল খসিয়ে টান মেরে হুড়মুড় করে ওঁরা এসে সোমের ঘাড়ে পড়লেন। সে-দুষ্ট তখনও তেমনিভাবে যথাস্থানে উপবিষ্ট। শিবানীও তার থেকে তেমনি দূরে।

প্রথমে মুখ ফুটল যাদুমণির। তিনি বিনা গৌরচন্দ্রিকায় বললেন, 'ছোটোলোকের ব্যাটা, বেজন্মা।'

দাশরথি ইশকুলে একটিমাত্র গালাগালি শিখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ওই ছিল তাঁর সম্বল। এমনি তাঁর একনিষ্ঠতা। বললেন 'Donkey, monkey, robber.'

মিস মিত্র আমতা আমতা করে বললেন, 'হৃদয়হীন, উদাসীন।'

বউমা শিবানীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন! মোক্ষদা বলল, 'ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। কাল যখন এসে পেরণাম করল আমি ভাবনু সোনার চাঁদ ছেলে। ওমা, এর পেটে এত ছিল। আগুনমুখো, ড্যাকরা।'

সোম এসবের জন্যে একরকম প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, 'প্রতিশ্রুতি এমনি করে রাখতে হয়।'

দাশরথিবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'যাও, যাও, সাধুপুরুষ। প্রতিশ্রুতির যোগ্য বটে।'

যাদুমণি তাড়া দিয়ে বললেন, 'ভাগ, ভাগ, আমার বাড়ির থেকে। নইলে—'

'নইলে?'

'নইলে পুলিশ ডাকব।'

'তবে তাই ডাকুন। আমি সহজে গা তুলছিনে।' এই বলে সোম একটা চুরুট ধরাল। এই লোকগুলির ওপর তার ভক্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

ঘরে পুলিশ ডাকলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দাশরথিবাবু গিন্নিকে বললেন, মেজাজ ঠাণ্ডা করতে। সোমকে বললেন, ‘ভদ্রলোকের ছেলে মানে মানে বিদায় হও।’

সোম বলল, ‘অপমানের কী বাকি রেখেছেন? কেন চোরের মতো সরে পড়ব? ডাকুন পুলিশ, একটা এজাহার লেখাই, পাড়ার লোক ভিড় করুক, একটা বক্তৃতা দিই। বলি সবাইকে ডেকে নির্জন ঘরে কী করেছি—’

‘কী করেছ।’ দশরথিবাবু আঁতকে উঠলেন।

‘কী করেছি তা আপনার ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করুন।’

দাশরথিবাবু মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়লেন। মোক্ষদা পাখা নিয়ে ছুটে এল। মিস মিত্র চিৎকার করে ‘স্মেলিং সল্ট’ হেঁকে এঘর-ওঘর করতে থাকলেন। যাদুমণি এক ঘটি জল এনে স্বামীর মাথায় উজাড় করলেন। মোক্ষদাকে বললেন, ‘তুই আমার হাতে পাখাটা দিয়ে যা, আরও জল নিয়ে আয়।’

দাশরথিবাবু অনেক কষ্টে বললেন, ‘আজ আমি আত্মঘাতী হব, তোমরা কেউ বাধা দিয়ো না। গিন্নি, তুমি এতদিনে বিধবা হলে। বাড়িতে থান কাপড় আছে তো? দেখো বৈধব্যের কোনো উপকরণের কমতি হলে বাজারে রাম দুশমন সিংকে পাঠাতে ভুলো না।’

সোম পায়ের উপর পা রেখে নির্বিকারভাবে চুরুট ফুঁকতে থাকল। যেন ফোটোর জন্যে pose করেছে।

৩
সুলক্ষণা

কাশীতে এক বনেদি বংশের এইরূপ সর্বনাশসাধন করে বাঙালি Casanova কল্যাণ কুমার সোম দেওঘরে উপনীত হলেন। তাকে নিতে এসেছিল সত্যেনবাবুর মেজো ছেলে শুভ্র আর সত্যেনবাবুদের বাড়ি আড্ডা দিয়ে থাকে একটি যুবক, তার ভালো নাম যে কী তা কেউ জানে না, ডাক নাম মাকাল।

মাকালকে সোম একদা চিনত। আই-এতে দু-বছর একসঙ্গে একঘরে বসেছিল, এই পর্যন্ত। এতদিনে উভয়েরই আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অবস্থা হরেদরে সেই একই—দু-জনেই বেকার। মাকাল জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পারছেন?'

'পারছি বইকী,' সোম বলল, 'কিন্তু আপনি' কেন? 'তুমির কী হয়েছে?'

মাকাল খুশি হয়ে বলল, 'বাপরে, তোমরা হলে বিলেতফেরত। তোমাদের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটতে-পারা আমাদের মতো অস্পৃশ্যদের সৌভাগ্য।'

শুভ্র ছেলেটি স্কুলে পড়ছে। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তার মুখমন্ডল। তার জীবনে প্রভাতকাল। শুভ্রকে দেখে সোম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইচ্ছা করলে ওই বয়সের স্ত্রী পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা করলে ওই বয়সকে ফিরে পাওয়া যায় না। যৌবন আনে ক্ষমতা, কৈশোর দেয় শ্রী। ক্ষমতার নেশায় শ্রীকে থাকা যায় ভুলে, কিন্তু নেশার ফাঁকে হঠাৎ একদিন তার ওপর দৃষ্টি পড়লে ক্ষমতাকে নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তাই ব্রজের গোপবালক চিরদিন আমাদের প্রীতি পেয়ে আসছে, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে আমরা চিনিনে। বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।

সত্যেনবাবু বাতে পঙ্গু অবস্থায় সোমকে অভ্যর্থনা করলেন। 'তুমি এসেছ দেখে বড়ো আনন্দ পেলুম। আমাদের এ দিকে তোমার মতো কৃতী, কালচারড যুবকের আসা একটা event. বুলুকে তোমার পছন্দ হোক বা নাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, তোমার আসাটাই আমার পক্ষে ধন্বন্তরির আগমন।'

ভদ্রলোক বলে চললেন—বলা ছাড়া তাঁর করণীয় আর কী ছিল?—'ইয়োরোপ! ইয়োরোপের আকর্ষণ আবাল্য আমাকে অস্থির করেছে, কিন্তু এজন্মে হয়ে উঠল না, যাওয়া হয়ে উঠল না। মা বুলু, শুনে যাও তো মা।'

আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি সুগঠিতা সুমধ্যমা তরুণী সোমকে নমস্কার করে বলল, 'কী বাবা।'

'সেই পুরোনো মোটা ছবির বই দুটো একবার আনতে পারো, মা? ইনি দেখবেন। সেই যে ১৮০৪ সালের ছাপা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় মুদ্রিত।'

'বুঝেছি,' বলে বুলু বই আনতে গেল।

সত্যেনবাবু নিম্নস্বরে বললেন, 'আমার বড়ো মেয়ে সুলক্ষণা। এরই কথা তোমার বাবাকে লিখেছি।'

মোটা মোটা দু-খানা ভল্যুম বুলু একা বয়ে আনছে দেখে সোম ছুটে যেতে দ্বিধা করল না। 'দিন, দিন, আমার জন্যে আনা বই আমাকে দিন। এ কি অবলা জাতির কর্ম!' সুলক্ষণার মৃদু আপত্তি সোম গ্রাহ্য করল না।

সত্যেনবাবু খুব হেসে বললেন, 'অবলাজাতিকে অবজ্ঞা কোরো না হে। তুমি নিজেই দেখে এসেছ ওঁরা সমুদ্রে সাঁতরে পার হচ্ছেন, আকাশেও ওঁরা উড্ডীন। আর আমাদের বুলুর বীণাখানি দেখবে এখন।'

১৮০৪ সালে ইংলাণ্ডে মুদ্রিত সেই গ্রন্থে পটের মতো রংচঙে ছবির ছড়াছড়ি। নানা দেশের নানা বেশভূষাধারী মানুষের প্রতিকৃতি ও বর্ণনা। সেকালের যানবাহন তৈজস আসবাব ইত্যাদির অনুকৃতিও ছিল। সত্যেনবাবু সোমের মনোযোগ ভঙ্গ করে বললেন, 'আমার সংগ্রহে এর চেয়ে পুরাতন চিত্রপুস্তকও আছে, কল্যাণ। দেখবে তুমি ক্রমে ক্রমে। এখানে থাকা হবে তো কিছুদিন?'

'সেটা গৃহস্বামীর ইচ্ছাধীন।'

'বেশ, বেশ, তোমার যতদিন খুশি ততদিন থাকো। তোমাদেরই জন্যে তো এ বাড়ি করেছি। আমার স্ত্রী নেই, আমারও থাকা-না-থাকা সমান। তান শুনতে শুনতে প্রাণটা আছে বীণার তারে বাঁধা। তুমি

স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করো তো?'

'আজ্ঞে, না।'

'বিশ্বাস যখন করো না তখন তোমাকে বোঝানো অসম্ভব, কী পথ্যের ওপর আমি বেঁচে আছি।'

ভদ্রলোকের চলৎশক্তি নেই, কিন্তু বলৎশক্তি বিলক্ষণ। বকবক করতে ভালোবাসেন বলে, যে-কেউ একটু মন দিয়ে বা মন দেবার ভান করে তাঁর কাছে একঘণ্টা বসল সেই তাঁর বয়স্যের মতো প্রিয় হল। মাকাল এদের অন্যতম। ভদ্রলোক যৌবনে কবিতা লিখতেন। শিশুপাঠ্য পুস্তকে কবি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, 'কবি—যে কবিতা লেখে।' অতএব সত্যেনবাবু ছিলেন কবি। শোনা যায় তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতির সতীর্থ। তারপরে একটি মহকুমা শহরে এম-এ বি-এল উকীল রূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটল। বাগ্মিতা ও বিদ্যা প্রথম কয়েক বছর রজতপ্রসূ হল না। রজতের অভাবে রন্ধনগৃহে ইন্ধনের অভাব হলে গৃহিণী একদিন কবিতার খাতাগুলির দ্বারা সে অভাব দূর করলেন। এমন সময় রাজায় প্রজায় বাধল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা। সব উকিল জমিদারের মুঠায়। একা সত্যেন রক্ষা করেন প্রজাদের স্বত্ব। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এক কানা মোক্তার। প্রজারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে মামলার খরচা জোগাল আড়াই বছর। সত্যেন উকিল ও সফররাজ হোসেন মোক্তার পকেট ও জেব বোঝাই করে আর পায়েহেঁটে বাড়ি ফিরতে পারলেন না, গাড়ি কিনে ফেললেন। আর বাড়ি ফিরে কি আরাম আছে—মহকুমা শহরের বাড়ি! হোসেন চললেন হজ করতে। সত্যেন দালান দিলেন দেওঘরে। জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে ওকালতি করা যায় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারও তাঁর বিস্বাদ বোধ হল। আড়াই বছরে উপার্জন যা করেছিলেন তা পঞ্চাশখানা গ্রামের পঁচিশ হাজার কৃষকের সঞ্চয় ও ঋণ। তার সুদের সুদে পুরুষানুক্রমে বীণা বাজানো যায়।

যৌবনে যখন তিনি কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন থেকেই তিনি অনুকরণ করে আসছিলেন। অবশ্য সদরে। অন্দরে তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর স্বকীয়। তবে সোমের আগমনে তাঁর সদর অন্দর একাকার হয়ে গেছে। মাকাল যা বর্ষাধিক কালের সাধনায় লাভ করতে পারল না, সোম শুধুমাত্র বিলিতি ডিগ্রির জোরে তাই দখল করল। সোমের জন্য রান্না করল স্বয়ং বুলু। পাতা পড়ল বিশেষ একটি ঘরে। পর্বতকে মহম্মদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি যে পথ্য গ্রহণ করলেন বলা বাহুল্য তা স্পিরিচুয়ালিজম নয়।

'ওরে বুলু', তিনি খেতে বসে বললেন, 'তোর হাতের অমৃত ভুঞ্জন যে ফুরিয়ে এল আমার। বাবা কল্যাণ, আশা করি অমৃতকে তুমি অমৃত বলবে।'

সোম বলল, 'আর একটু ঝোলামৃত পেলে মন্দ হত না।'

সত্যেনবাবু ব্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রেতর স্বরে বললেন, 'আর-একটু, আর-একটু ঝোল দিয়ে যা তো এঁকে।'

রাত্রে সংগীতের জলসা। হিন্দি ও বাংলা গানের ওস্তাদদের পালা সাঙ্গ হলে সুলক্ষণা শ্রোতৃমন্ডলীকে নমস্কার করে বীণা হাতে নিল। চর্তুদিকে ধ্বনিয়ে উঠল, ঝনন ঝনন ঝন। বীণাবাদনের দ্বারা সে একটি মায়াময় পরিমন্ডল সৃজন করতে থাকল। যেন আদেশ দিল, "Let there be light." অমনি আলোকের জন্মরহস্যে পূর্বদিকে উদ্ভাসিত হল। তারপর হুকুম করল, 'Let there be a firmament.' অমনি প্রকাশিত হল মহাকাশ।

গান-বাজনার ভালোমন্দ সোম বোঝে না, সংগীতে তার প্রবেশ নেই। সেই যে তার এক বন্ধু প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামের গ্যালেরিতে লম্বমান আলেখ্যরাজি সম্পর্কে বলেছিল, 'এ আর কী দেখব? এর একটা অন্যটার মতন। হুবহু এক।' তেমনি রাগরাগিণী সম্বন্ধে সোমেরও পার্থক্যভেদ ছিল না, ওসব হুবহু এক। তা সত্ত্বেও সংগীতের সম্মোহন সরীসৃপকে বশ করতে পারে, সোম তো মানুষ। সুলক্ষণা যেন তাকে মন্ত্র পড়ে বন্দি করল। বীণাবাদনের সঙ্গে জড়িয়ে বীণাবাদিনীকে সোম অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা জ্ঞানে পুরস্কারস্বরূপ তার হৃদয় নিক্ষেপ করল। চেয়ে দেখল সত্যেনবাবু চোখ টিপে মাথা নেড়ে তারিফ করছেন, মাকাল ঢুলু ঢুলু, ফটিকবাবু প্রবোধবাবুরা হাত দিয়ে উরুর উপর তাল ঠুকছেন।

সুলক্ষণা বাদন সারা করে আবার একটি নমস্কার করে বীণা নামিয়ে রাখল। সকলে গর্জে উঠলেন, সাধু সাধু সাধু। প্রশংসা বাক্যের কোলাহলমুখর হট্টস্থলী ত্যাগ করে সোম বাইরে নক্ষত্র সভামন্ডলের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে হতে লাগল সে অমন একটা ব্রত গ্রহণ না করলেই পারত, কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। এই মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে পাবার প্রস্তাব আজই করা যায়, সত্যেনবাবু তো তাই প্রত্যাশা করছেন। বিয়ের পরে কোন মেয়ে স্বামীকে ভালো না বাসে যদি স্বামীর ভালোবাসা পায়? সোম তাকে খুব—খুব—খুব ভালোবাসবে, তার বীণা শুনে তার কোনো খুঁত মনে আনবে না।

খাবার সময় সত্যেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে! বুলুর তানালাপ তোমার কেমন লাগল তা তো বললে না?'

সোম শুধু বলতে পারল, 'আমি মুগ্ধ হয়েছি।' তার তখন একমাত্র চিন্তা তার ব্রতের কী হবে।

'ওরে বুলু, শোন, ইনি কী বলছেন। তোর শিক্ষা সার্থক। তুমি বোধ হয় জানো না, কল্যাণ, ওকে আমি শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলুম। কবি বড়ো স্নেহ করতেন। ওকে স্বহস্তে একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন, দেখবে এখন।'

প্রতিভা ও সাধনা বিয়ের বাজারে না বিকেলে সার্থক হয় না, ও-কথা থেকে সোম এই সিদ্ধান্ত টেনে বার করল। তখন তার অন্তর বিষিয়ে উঠল প্রতিবাদের তীব্র তাড়নায়। ব্যাঙ্গোক্তি তার মুখের প্রান্তে টলমল করল। সে বলতে চাইল, 'বীণা বোধ করি এত ভালো করে বাজত না যদি না তার ওপর ঘটকালির ভার থাকত।' কিন্তু তাতে সুলক্ষণা আঘাত পাবে। আনন্দদায়িনীকে আঘাত করতে সোমের মুখ ফুটল না।

সোমের মোহ অপগত হল। সে ভাবল, মেয়েদের কলানুশীলন বিবাহান্ত। বিবাহের পরে কাব্য তোলা হয় শিকায়, বীণা জমা হয় মালগুদামে। বিবাহের দু-বছর পরে শিবানী যা সুলক্ষণাও তাই—গৃহিণী এবং জননী। ওদের যে-কোনো একজনকে নিয়ে সুখে-দুঃখে গৃহকোণে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবে কেন সুলক্ষণার বেলায় ব্রতের ব্যতিক্রম হবে? না, হবার কোনো কারণ নেই। হবে না।

পরদিন সত্যেনবাবুকে তার ব্রতের কথা বলবে-বলবে করছে এমন সময় তিনি আপনি প্রস্তাব করলেন, 'যাও তোমরা, বুড়ো মানুষের কাছে বসে থেকো না। একটু বেড়িয়ে এসো।'

সোম, শুভ্র, সুলক্ষণা ও মাকাল বেড়াতে বেরোল। সোমের আশা হল যে মাকাল ও শুভ্র একটু দূরে দূরে হাঁটবে ও নিজেদের মধ্যে গল্প করতে থাকবে। সোম শুনতে পেল মাকাল শুভ্রকে বলছে, 'আমি রেস খেলি তার আসল কারণ কি জানো? জীবনের সর্ববিধ প্রকাশে আমার সমান আগ্রহ।' শুভ্র তা নিয়ে তর্ক করছে। ছেলেমানুষি তর্ক—নীতিবচন আওড়ে হিতাহিতের ভাগবাঁটোয়ারা। মাকালের সর্ববিধ প্রকাশে সমান আগ্রহ যে খাঁটি মাকাল তা প্রতিপন্ন করছে পোশাকে। তার পরনে টেনিস ট্রাউজার্স, কোটের বদলে ড্রেসিং গাউন, হ্যাটের বদলে পশমের টুপি; তার পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি। সোমের হাসি পেল। সে সুলক্ষণাকে বলল, 'সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে ওরূপ পোশাকের কোনো উপযোগিতা আছে কি?'

সুলক্ষণা মৃদু হেসে বলল, 'ওঁর বিশ্বাস উনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন করছেন। মহাকবি জুতো ভেঙে চটির মতো করে পায়ে দেন, পরেন পায়জামা ও চড়ান আলখাল্লা। তাঁর টুপিরও মাকালদা নকল করেছেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে মাকালদা ওই পোশাকে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।'

সোম অবশ্য অবাক হল না। সবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কবি তাঁর পরিচ্ছদের প্যারডি দেখে কী বললেন?'

'কী আর বলবেন? বোধ হয় ভাবলেন যে, সব হয়েছে, দাড়িটি হয়নি।'

সোম কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে গেছল। তখন সুলক্ষণা ওখানে ছিল কি না, থাকলে সোম তাকে দেখেছে কি না, তাই নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল, ততক্ষণে মাকালরা অনেকদূর গেছে। ইচ্ছাপূর্বক কি অন্যমনে তা কে বলবে?

‘আপনার সঙ্গে,’ সোম চলতে চলতে বলল, ‘নির্জনে আমার কিছু কথা ছিল’।

এতক্ষণ যে কথাবার্তা হচ্ছিল সেও নির্জনে, তব সেটা নির্জনে বলে সুলক্ষণার খেয়াল ছিল না। ‘নির্জনে’ শব্দটার প্রয়োগে সে সহসা সচেতন হয়ে সচকিতভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে নিল। পুরুষমানুষের সঙ্গে সে কতবার কথা কয়েছে, কিন্তু এক ঝাঁক পাখির মধ্যে একটি পাখির মতো। শান্তিনিকেতনের মেলামেশা ঝাঁকে বদ্ধ থেকে, তাই বাড়িতেও মেলামেশার সময় ঝাঁক না থাকলে ফাঁক বোধ হয়, গা ছম ছম করে।

যে-মেয়েটি এতক্ষণ বেশ সপ্রতিভ ছিল তার ব্যবহারে কেন এল আড়ষ্টভাব, সোম তা বুঝতে পারল না। কিন্তু লক্ষ করল। বক্তব্যটাকে এমন মানুষের গ্রহণযোগ্য করবার জন্যে সে নীরব থেকে নিজের মনে বহু বার মহলা দিল, মোলায়েম করল।

বলল, ‘সুলক্ষণা দেবী, আপনাদের বাড়িতে আমি কেন অতিথি হয়েছি তা হয়তো জানেন, অন্তত অনুমান করেছেন। আপনাকে আমার কেমন লাগল আপনার বাবা প্রকারান্তরে এই প্রশ্নই করেছিলেন, আমি যে উত্তর দিয়েছি আপনি তা শুনেছেন। এখন আমাকে আপনার কেমন লাগল এই আমার জিজ্ঞাস্য।’

সুলক্ষণা তার সপ্রতিভতা ফিরে পেল, কিন্তু ভাষা ফিরে পেল না। এবার শঙ্কা নয়, লজ্জা।

‘বুঝেছি, সুলক্ষণা দেবী,’ সোম বলল, ‘আপনার ছিল বীণা, সেই দিল আপনার পরিচয়। আমার তো তেমন কিছু নেই, আমি আপনার অপরিচিত। অপরিচিতকে কেমন আর লাগবে!’

সুলক্ষণার কুণ্ঠিত দৃষ্টি থেকে এর অনুমোদন পেয়ে সোম বলে গেল, ‘আপনার পরিচয় বীণাতে, আমার পরিচয় বাণীতে। বীণা চেয়েছিল জনতা, বাণী চায় বিজনতা। এখন বুঝলেন তো কেন নির্জনে কিছু কথা ছিল?’

‘নির্জনে’ শুনে সুলক্ষণা আবার চমকাল। কিন্তু এবার সে ঔৎসুক্য বোধ করছিল। সোমের পরিচয় বিজ্ঞাপনে যা পড়েছিল তার বেশি কী হতে পারে শোনা যাক। সে কি শিকারি, না সে বাঁশি বাজায়, না সে খুব বেড়িয়েছে ও বেড়াতে ভালোবাসে?

সোম বলল, ‘সুলক্ষণা দেবী। আমি গুণী নই। গান-বাজনার সারেগামা ও পোর্তুগালের ভাস্কোডাগামা এদের মধ্যে কে কার মামা জানিনে। হাসছেন? তবে কেউ কারুর মামা নয়। বাঁচা গেল। গামার কথায় মনে পড়ল আমি পালোয়ান নই। পালের কথা যখন উঠল তখন বলি গোষ্ঠ পাল হয়ে থাকলে দেওঘরের বল কিক করে গিরিডিতে ফেলতুম, সেই হত আমার পরিচয়। খুব হাসছেন। তা বলে মনে করবেন না যে আমি হাস্যরসিক। লেখকও নই, অভিনেতাও না। আর হাসাতে যদিও পারি হাসতে তেমন পারিনে। ভাবছেন, হয়তো সিনিক। না, সুলক্ষণা দেবী, বিধাতা ও তাঁর বিধানের ওপর আমার আক্রোশ, কি অভিমান, কি সংশয়, কি অশ্রদ্ধা নেই।’

এই পর্যন্ত এসে সোম হঠাৎ থামল। শুধাল, ‘শুনতে আগ্রহ বোধ না করলে বলুন বন্ধ করি।’

সুলক্ষণা সলজ্জভাবে বলল, ‘না।’

সোম দুষ্টুমি করে বলল, ‘শুনবেন না? তাহলে বন্ধ করি।’

সুলক্ষণা আবার তেমনি সলজ্জভাবে বলল, ‘না।’

‘কোনটা না? শোনাটা, না বন্ধ করাটা?’

নাছোড়বান্দার হাতে পড়েছে, খুলে বলা ছাড়া গতিরন্যথা। কিন্তু কথাটা যেই তার মুখ ছেড়ে রওনা হল মনটা অমনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গেল।

সোম হৃষ্ট হয়ে বলল, ‘বেশ, এখন আমার সাত খুন মাপ। তবে খুন আমি হিসাব করে দেখতে গেলে ছয় বার করেছি—’

সুলক্ষণা ‘উঃ’ বলে উঠে থমকে দাঁড়াল। তার পাংশু মুখে আতঙ্কের নিশান।

সোম হেসে বলল, ‘ভয় নেই, আপনাকে খুন করব না। খুন-খারাবি জীবনের মতো ত্যাগ করেছি, সুলক্ষণা দেবী।’

এতক্ষণে সুলক্ষণার ঠাহর হল যে খুন করা অর্থে অন্যকিছু বোঝায়। নিজের মূর্খতায় লজ্জিত হওয়ায় আবার তার মুখে রক্ত সঞ্চার হল। সে অস্বস্তির স্বরে বলল, 'ওঃ!'

'ওঃ!' সোম বলল পরিহাসভরে। 'আপনাকে সবই বিশ্বাস করানো যায় দেখছি। যেমন অকস্মাৎ বললেন 'উঃ' তেমনি অবলীলাক্রমে বললেন 'ওঃ!' এবার আমি যদি ঘোষণা করি যে আমি লোকটা কেবল যে নির্গুণ তাই নয় আমি রীতিমতো চরিত্রহীন তাহলে আপনি বোধ করি তৎক্ষণাৎ বলবেন 'ইস'! কেমন?'

সুলক্ষণা নিরুত্তর।

'কিন্তু,' সোম গম্ভীরভাবে বলল, 'এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা যার জন্যে করা গেল সেটা ও ছাড়া আর কিছু নয়, সুলক্ষণা দেবী!'

'বুঝতে পারলুম না,' সুলক্ষণা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলল।

'বলছিলুম,' সোম সভয়ে বলল, 'আমি চরিত্রহীন।'

'ছি,' সুলক্ষণা বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা তা বলবেন না।'

'বিশ্বাস করলেন না?' সোম কাতরস্বরে শুধাল।

'না।' সুলক্ষণা বলল দৃঢ়ভাবে।

'কিন্তু,' সোম অনুযোগের স্বরে বলল, 'পরে আমাকে দোষ দেবেন না এই বলে যে আমি আপনার সঙ্গে সত্যাচরণ করিনি।'

সুলক্ষণা বাস্তবিক বুঝতে পারছিল না। সরোষে বলল, 'বুঝতে পারছিনে, কল্যাণবাবু।'

সোম হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, ফেরা যাক। বিয়ে যে আমাকে করবেন সে ভরসা আমার নেই। খামকা আপনাকে আমার বিশ্বাসভাগী করি কেন?'

সুলক্ষণা বিমনা হয়ে রইল, বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা কইল না সহজে। সত্যেনবাবুর মনে ধোঁকা লাগল। মাকালকে ডাকিয়ে গোপন তদন্ত করলেন। সে বলল 'ওঁদের মধ্যে কী নিয়ে আলাপ হল, কী আলাপ একেবারে হলই না, তা তো আমি জানিনে। আমার কি স্বার্থ বলুন, কেন চরবৃত্তি করব?'

মাকালের মতো মহা ভক্তের মুখে এমন রূঢ় বিদ্রোহের কথা সত্যেনবাবু এই প্রথম শুনলেন। কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময় ঘটনা, রোমহর্ষকও হতে পারে, এই সন্দেহ পঙ্গুকে একান্ত অসহায় বোধ করাল। এমনিতেই তিনি বিষম অভিমানী মানুষ, অভ্যস্ত ভক্তি শ্রদ্ধার এক ছটাক কম পড়লে তাঁর চক্ষু ক্রমশ জলাশয় হয়ে ওঠে, কেউ যদি তাঁর বাগ্মিতার প্রতি অমনোযোগী হল অমনি তাঁর কণ্ঠস্বরে আদ্রতা উপস্থিত হয়। আর প্রতিবাদ যদি কোনো হতভাগা কোনো কথার করল তবে তিনি এক নিমেষে হুতাশন। 'আমি মূর্খ? আমি মূঢ়? আমি অকবি? আমি অতরুণ? এই তো তোমার—না, না, আপনার—মনোগত ধারণা? এই তো? এই তো? ধিক, পিতৃবয়সি পিতৃকল্প ব্যক্তির প্রতি ঈদৃশ অনাস্থা, অশ্রদ্ধা, অশিষ্টতা, অর্বাচীনতা। গুরুদেবকে সেদিন আমি টেলিগ্রাম করে আপত্তি জানিয়েছি, জানিয়েছি যে তিনি বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করে আমাদের দফাটি সেরেছেন, ওই সর্বনেশে ছোকরার সুখ্যাতিতে সর্বনেশে ছোকরাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যে কতখানি বেড়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত তুমি—না, না, আপনি।'

মাকাল যে তার সমবয়সিদের মতো দুর্বিনীত দুর্নীত দুঃশীল নয় এর দরুন তার জন্যে সত্যেনবাবুর হৃদয়ের এক কোণে একটু জায়গা ছিল। তিনি তাকে কিছু স্নেহ করতেন। তাই তার ওই অনাত্মীয়ের মতো উক্তি যেন পাহারাওয়ালার 'ভাগ যাও, হামকো কুছ মৎ পুছো'র মতো তাঁর কানে ও প্রাণে বাজল। তিনি মুখে রুমাল চেপে ক্রন্দনবেগ রোধ করলেন। তাঁকে প্রকৃতিস্থ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সে-রাত্রেও বীণাবাদনের অপেক্ষাকৃত ঘরোয়া বন্দোবস্ত ছিল, তা বিগড়াল!

সত্যেনবাবু শুভ্রকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর দিদির সঙ্গে কল্যাণবাবুর কথাবার্তা কী হয়েছে রে?'

‘তা তো আমি,’ শুভ্র ঢোক গিলে বলল, ‘বলতে পারব না। আমি মাকালদার সঙ্গে তর্ক করতে করতে ওদের সঙ্গ ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছলুম, ফেরবার সময় ঠিক ততখানি পেছিয়ে পড়তে বাধ্য হলুম।’

বোনের বিমনাভাব, বাপের কাতরতা, সোমের বিস্ময়, মাকালদার মৌনতা—এত কান্ডের পরে শুভ্ররও মনে হতে লাগল যে কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময় ঘটনা, রোমাঞ্চকরও হতে পারে। সে দিদিকে একাকিনী পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘দিদিভাই, কী হয়েছে?’

দিদি বলল, ‘আমিও তাই জানতে চাই তোর কাছে, যদি তুই জানিস।’

সোমের সঙ্গে তার তেমন আলাপ হয়নি। তবু সে সংকোচ কাটিয়ে সোমকে চুপটি করে বসে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কল্যাণবাবু, আপনি কি জানেন কী হয়েছে?’

‘কী হয়েছে?’ সোম শুভ্রর প্রশ্নের পুনরুক্তি করল।

‘আপনি জানেন না?’

‘তুমি জানালেই জানব।’

‘বা রে, আমি নিজে জানতে এলুম যে।’

‘তাই বলো। আমি এতক্ষণ ধরে ভাবছি কার কাছে জানতে চাইলে জানতে পাব। আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? আমরা সবাই যদি সমবেত হয়ে যে যতটুকু জানি ততটুকু বলি।’

শুভ্র উৎফুল্ল হয়ে সম্মতি দিল। বলল, ‘তাহলে গ্র্যাণ্ড হয়। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স।’

সে গেল সভা ডাকতে।

সভা বসল।

সত্যেনবাবু প্রথম বক্তা। তিনি বললেন, ‘বুলু-মাকে কেমনতর আনমনা দেখে কী যেন একটা ভাব বেণুবনে দখিন হাওয়ার মতো আমার মর্মে গুঞ্জরিত হতে থাকল, মাকালকে ডেকে বললুম, হ্যাঁ রে কী হয়েছে বলতে পার? তা তিনি চোখ রাঙিয়ে তর্জন করে বললেন, আমি কি গুপ্তচর? অমন তাড়না পেয়ে আমি তো বেত্রাহত কুক্কুরের মতো কোঁ করে উঠলুম। অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো হয়েছিল, সামলে নিতে পেরেছি এই ঢের।’

মাকাল তাঁর ভ্রম সংশোধন করল না। মজনুর মতো দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে বেড়াবে কি না এই তার তখনকার চিন্তা। তার মতো বেকার যুবকের যাঁহা দেওঘর তাহা হিমালয়। তবে দেওঘর অঞ্চলে তার বাবা খানকয়েক বাড়ি করে গেছেন, সে দেওঘর ছাড়লে ভাড়াটা ঠিকমতো আদায় হবে কি না এই সন্দেহ থেকে দেওয়ানা হওয়া নিয়ে দ্বিধা।

‘দেখ মাকাল,’ সত্যেনবাবু তাকে সম্বোধন করে বললেন, ‘তুমি আমার পুত্রপ্রতিম, আমি তোমার পিতৃবয়সি না হই মাতৃবয়সি। অমন তেরিমেরি করে তেড়ে-আসা তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকদের ও-দোষ একচেটে বলে জানতুম।’

মাকাল এবার যথার্থ উত্তপ্ত হয়ে বলল, ‘অতিরঞ্জনের দ্বারা সুলক্ষণার নিকট আমাকে লঘু করবেন না। তিনি অন্যকে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু,’ বলব কি বলব না করতে করতে বলে ফেলল, ‘আমার মানসী।’

সত্যেনবাবুর সাহিত্য ও জীবন উভয় স্বতন্ত্র ছিল। পরের বেলায় যাই হোক না কেন তাঁর ঘরের বেলায় এর ব্যত্যয় তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মেয়ে মাকালের মানসী এ কথা শুনে তিনি পঙ্গু না হয়ে থাকলে লম্ফ দিয়ে ধৃষ্টের চুল চেপে ধরতেন। অধুনা অদৃষ্টের ওপর অভিমান করলেন, কিন্তু তাই করে ক্ষান্ত হলেন না, কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘তবু যদি ডিগ্রি থাকত, ওদেশি না হোক এদেশি। বড়ো মুখে ছোটো কথা সইতে পারা যায়, কিন্তু ছোটো মুখে বড়ো কথা!’

মাকাল বেপরোয়াভাবে বলল, ‘A man’s a man for a’ that!’

সত্যেনবাবু পরাস্ত হয়ে আর্তস্বরে বললেন, ‘কল্যাণ, তোমার সাক্ষাতে ওই মূর্খ আমার কন্যার কাছে প্রেম নিবেদন করছে তুমি সহ্য করছ! তুমি কি শিশুপাল?’

সোম বলল, 'নিজে প্রেমিক না হলেও প্রেমিককে আমি বড়ো বলে মর্যাদা দিয়ে থাকি। মাকালের নিবেদন আমার নিবেদনের চেয়ে বড়ো। সুলক্ষণা যদি ছোটোকে অগ্রাহ্য করে বড়োকে বরণ করেন তবে আমি সাহ্লাদে বরযাত্রী হব।'

সত্যেনবাবু চোখ বুঝে শুয়ে পড়লেন। সোম সুলক্ষণার দিকে চেয়ে দেখল সে মাথা নীচু করে দুই-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে। অপমানে তার কর্ণমূল আরক্ত।

পরদিন সত্যেনবাবু সোমকে কাছে বসিয়ে চাপা সুরে বললেন, 'কাল কী ছেলেমানুষি করেছ বলো দেখি। তোমার সঙ্গে মাকালের তুলনা! ওটা যে গ্রাজুয়েটই নয়, আধখানা মানুষ।'

'কিন্তু,' সোম বলল, 'ওর বিষয়-সম্পত্তি যা আছে তা অনেক গ্র্যাজুয়েটের নেই এবং হবে না।'

'তা ছাড়া,' সত্যেনবাবু চুপি চুপি বললেন, 'ও রেস খেলে।'

'রেস খেলা,' সোম বলল, 'ক্যানসার-সদৃশ অসাধ্য ব্যাধি নয়। সুলক্ষণার চিকিৎসায় সারতে পারে।'

'অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাব কেন? তুমি বিদ্যায় বিত্তে ও চরিত্রে কেবল মাকালের কেন দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে। তোমাকে না দিয়ে ওকে মেয়ে দিতে কোন মেয়ের বাপের দুর্মতি হবে?'

'বিদ্যার ও বিত্তের বিষয় হয়তো ঠিক। কিন্তু চরিত্রে যে আমি মাকালের তথা দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে এর কি আপনি কোনো প্রমাণ পেয়েছেন? না আপনার চারিত্রিক মান কৌমার্য্যের দাবি মানে না?'

'কী বললে?' সত্যেনবাবু কানের গোড়া রগড়ালেন।

'অর্থাৎ লোকে যাকে চরিত্রহীন বলে আপনি কি তাকে সচ্চরিত্র বলেন?'

সত্যেনবাবু তিক্তস্বরে বললেন, 'ও প্রশ্ন কেন উঠল?'

সোম অকুণ্ঠিতভাবে বলল, 'এইজন্য যে আমি লৌকিক অর্থে চরিত্রহীন।'

'যা তা বোলো না, কল্যাণ।' সত্যেনবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। 'আমি জানি তোমরা অত্যাধুনিকরা আমাদের খ্যাপাবার জন্যে অযথা দুর্বৃত্ততার ভান করে থাকো। আমাদের সময় আমরা বিধবা বিবাহের ভয় দেখিয়ে গুরুজনকে জব্দ করতুম।'

সোম বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন না-করুন আমার নষ্ট কৌমার্য্যের সংবাদ আমি সময় থাকতে জানিয়ে রাখলুম, সত্যেনবাবু।'

'ওহো!' বলে সত্যেনবাবু যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন, তাঁর মুখে কপাট পড়ল না, চোখে পলক পড়ল না। আকস্মিক পক্ষাঘাত যেন তাঁর সকল অঙ্গ অসাড় করে দিল।

'ও কী!' বলে সোম চেঁচিয়ে উঠল। শুভ্র, সুলক্ষণা ও বাড়ির চাকর-বাকর ছুটে এল। কিছুক্ষণ ঝাড়ফুঁকের পর সত্যেনবাবুর হাঁ বুজল ও চোখ বন্ধ হল। সোম এতক্ষণ ভাবছিল কাশীর দাশরথি বাবুর দোসর জুটল নাকি? সে যেখানে যায় সেখানে শনির অভিশাপ বহন করে নিয়ে যায়।

সে ওঠবার উদ্যোগ করলে সত্যেনবাবু তা দেখে ইশারায় জানালেন বোসো। ইশারায় অন্যান্যদের জানালেন ঘর থেকে যেতে।

ভাঙা গলায় বললেন, 'চারিত্রিক আদর্শ অনুচ্চ হলে পত্নীর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করে থাকতুম।'

সোম বিনীতভাবে বলল, 'কিন্তু সেটা তো চরিত্রের নয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা।'

সত্যেনবাবু খুশির ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললেন, 'চরিত্র ও প্রেম ভিন্ন নয়, বাবাজী। তোমরা যতই আধুনিক বলে বড়াই করো না-কেন তোমরা এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করোনি। আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবার কথা, কায়াহীনের প্রতি কীসের অনুরাগ? আর তিনি যখন এ বাড়িতে নেই ও প্রত্যাবর্তন করবেন না তখন অন্য কেউ তাঁর স্থান পূরণ করলে তাঁর আপত্তির কী হেতু থাকতে পারে?'

'কিন্তু তাঁর স্মৃতি,' সোম স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'আপনার মন থেকে এক দন্ড অন্তর্হিত হয়নি। অন্যকে স্পর্শ করতে গেলে সেই স্মৃতি মারবে চাবুক।'

‘ঠিক বলেছ, বাবাজী’ তিনি পৃষ্ঠপোষকের মতো বললেন, ‘কিন্তু শুধু তাই নয়। স্মৃতি লোপ পেলেও তিনি ওপারে বসে আমার প্রতীক্ষা করতে থাকবেন। আমি যে স্পিরিচুয়ালিজম মানি। ওপারে যেন তিনি বাপের বাড়িতে আছেন আর এপারে আমি অন্য-স্ত্রী-সঙ্গ করছি—হোক না সে বনিতা, নাই বা হল সে পণ্য স্ত্রী—ছি ছি ছি। না, আমার চারিত্রিক আদর্শ এত নীচ নয়।’

‘এর জন্যে,’ সোম গম্ভীরভাবে বলল, ‘আমি আপনাকে সাধুবাদ দেব না, সত্যেনবাবু। যিনি ওপারে গেছেন তিনি যে ইতিমধ্যে পত্যন্তর গ্রহণ করেননি তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি পাইনি। যদি পাই তবুও স্বীকার করব না যে তাঁর প্রতি আপনার সেই চারিত্রিক দায়িত্ব আছে যা তাঁর প্রতি ছিল তিনি যখন বাপের বাড়ি থাকতেন। স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামীরা সৎ থাকেন এই প্রত্যাশায় যে তাঁদের অবর্তমানে স্ত্রীরা থাকবেন সতী। আপনার সৎ থাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ,’ সোম অতি সন্তর্পণে বলল, ‘আপনার স্ত্রী এখন কায়াহীন।’

সত্যেনবাবু রাগ করলেন না, সোমের প্রতি করুণা প্রকট করলেন তাঁর চাউনিতে। যেন নীরবে বললেন, হায়রে পাশ্চাত্য materialist!

সোম এটা-ওটার পর এক সময় বলল, ‘তাহলে আমি কলকাতা চললুম কাল। এখানকার কাজ তো হলনা।’

সত্যেনবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হলো না কীরকম?’

‘আমি যে চরিত্রহীন।’ উত্তর দিল সোম।

‘আহা।’ সত্যেনবাবু সর্বজ্ঞের মতো বললেন, ‘বিলেত জায়গাটাই অমন। সেখানে চরিত্র নিয়ে ক-জন ফিরতে পেরেছে? তুমি তো তবু স্পষ্ট কবুল করলে।’

‘আমি,’ সোম উঠতে উঠতে বলল, ‘এই কথাটাই আপনার কন্যাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলুম।’

‘কী সর্বনাশ!’ সত্যেনবাবু চোখ বুজে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকলেন। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে থাকলেন, ‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।’

সোম সেখানে দাঁড়াল না।

সত্যেনবাবু যে সাধু ও ভণ্ডের অপরূপ সমাহার এই আবিষ্কারের পর সোমের সুলক্ষণাকে বিবাহ করবার বাসনা শিথিল হয়ে এল। কে জানে সুলক্ষণাও হয়তো তাই। সোম যাত্রার আয়োজন করল। হতভাগ্য মাকালের বিষয় তার মনে ছিল। সোম চলে গেলে মাকাল হয়তো আবার এ বাড়িতে প্রবেশ পাবে আর পাবে আদর। সে যে সচ্চরিত্র।

একবার সুলক্ষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে সোম শুভ্রর কাছে আবেদন পেশ করল। ‘তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করো তো তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে, যদি হয়।’

শুভ্র ঘুরে এসে বলল, ‘এখনি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।’

সুলক্ষণা শুভ্রর জন্যে কি কার জন্যে একটা পুলোভার তৈরি করছিল। সেলাই রেখে সোমকে নমস্কার করল। ‘বসুন।’ শুভ্রকে মিষ্টি করে বলল, ‘তুমি গিয়ে বাবার কাছে বসতে পারো।’

সোম ইতস্তত করে বলল, ‘সেই কথাটার কী হল জানতে পারি?’

সুলক্ষণা সেলাইয়ের থেকে চোখ না-তুলে বলল, ‘অবশ্য।’ তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, ‘আমার মা নেই, ভাই বড়ো হলে যেখানে কাজ পাবে সেখানে যাবে, বাবার সেবার ভার আমাকেই বইতে হয়। বিয়ের দায়িত্ব কি এই অবস্থায় নেওয়া উচিত?’

সোম একটু বিস্মিত হয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপরে বলল, ‘যদি ভেবে চিন্তে এই স্থির করে থাকেন তবে আমাকে ও প্রশ্ন করা বৃথা। আর যদি আমার উত্তর শুনলে আপনার স্থির করা সুকর হয় তবে বলি, রোগীর শুশ্রূষা নার্সের কাজ, আপনি নার্সের ট্রেনিং পাননি বোধ করি। পরধর্ম সব সময়েই ভয়াবহ।’

‘কিন্তু’ সুলক্ষণা বলল, ‘বাইরের নার্স কি আপনার লোকের মতো হবে? মমতা যে শুশ্রূষার প্রধান উপাদান।’

সোম হেসে বলল, ‘বনের পাখিও পোষ মেনে আপনার হয়, নার্স তো নারী।’

সুলক্ষণা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, ‘তার মানে নার্স হবে এ বাড়ির গৃহিণী। এই তো?’ সোম বলল, ‘এই।’

সুলক্ষণা দৃঢ়ভাবে বলল, ‘না, তা হতে পারে না, কল্যাণবাবু। আমার মায়ের স্থান অন্যের অধিকারে আসতে পারে না।’

‘How sentimental!’ সোম বলল ঈষৎ অবজ্ঞাভরে।

সুলক্ষণা ভ্রূ কুঞ্চনপূর্বক সোমকে নিরীক্ষণ করে বলল, ‘স্ত্রী-বিয়োগের পর গুরুদেব যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি তিনিও তাহলে সেন্টিমেন্টাল?’

সোম হাসতে হাসতে বলল, ‘গুরুদেবই দেখছি নাটের গুরু। অন্য সকলে গড্ডলিকা।’

‘দেখুন,’ সুলক্ষণা উষ্মা গোপন করে বলল, ‘গুরুদেবের নিন্দা কানে বড়ো বাজে।’

‘কিন্তু’ সোম বুঝিয়ে দিল, ‘আমি তো গুরুদেবের নিন্দা করিনি, করেছি শিষ্যবৃন্দের নিন্দা।’

‘আপনার চেয়ে,’ সুলক্ষণা উষ্মা প্রকাশ করে বলল, ‘আমার বাবা বয়সে অনেক বড়ো, চরিত্রেও। তাঁর বিচার আপনি না-করলে পারতেন।’

সোম থ হয়ে রইল।

‘বিলেত ঘুরে এসে লোকে ষত্ব ণত্ব ভুলে যায়। (সোম মনে মনে বলল, ব্যাকরণ কৌমুদীখানা আরেকবার খুলে দেখতে আলস্য বোধ করে।) অহংকারে ফুলতে ফুলতে সেই গল্পের ব্যাঙের মতো হাতিকে লাথি মারতে চায়। (সোম মনে মনে বলল, গল্পে শেষের টুকু নেই।)’

‘আর কিছু বলবেন?’ সোম প্রশ্ন করল।

‘না।’ সুলক্ষণা যেন সশব্দে কপাট দিল।

‘আমি’, সোম যথেষ্ট বিনয়ের সহিত বলল, ‘এমনি বেশ ভালোমানুষ। কিন্তু কোনো মেয়ের ওপর যদি ও যখন রাগ করি তবে ও তখন আমি রাবণ। আমার ইচ্ছা করে তাকে সীতার মতো লুট করে নিয়ে যেতে।’

সুলক্ষণা এর উত্তরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে আলমারির একটি দেরাজ থেকে বের করলে একটি ছোরা। সোমকে দেখিয়ে বলল, ‘এই আমার উত্তর।’

সোম একটু ভড়কে গেছল। সামলে নিয়ে বলল, ‘ব্যবহার জানেন তো?’

‘সেটার পরীক্ষা নির্ভর করছে আপনার ব্যবহারের উপর।’

‘নিশ্চিন্ত থাকুন। রাবণের ব্যবহারের মূলে ছিল প্রেম। লোকটা সীতাকে এত ভালোবাসত যে অন্তঃপুরে না-পুরে অশোক বনে ছেড়ে দিয়েছিল। অন্য কারুর প্রতি এমন অনুগ্রহ করেনি। আমার নেই প্রেম। হবেও না।’ এই বলে সোম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সুলক্ষণা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কী ভাবল সেই জানে। বলল, ‘আপনার কিছু একটা ব্যথা আছে। তা বলে আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না, মার্জনা অবশ্য করতে পারি—কিন্তু বিবাহের প্রতিষ্ঠা মার্জনার উপর নয় বিশ্বাসের উপর।’

‘মার্জনা,’ সোম হেসে বলল, ‘কে চায়? কল্যাণকুমার সোম মার্জনার চেয়ে গঞ্জনা পছন্দ করেন।’ তারপর বলল, ‘আচ্ছা, উঠি।’

সুলক্ষণা কোনোমতে নমস্কার করল। সোমের প্রস্থানের পর চাপা কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল।

শুভ্র দিদির পড়ার ঘরে গিয়ে দেখল দিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার টেবিলের উপর একখানা ছোরা। এক সেকেন্ডের জন্যে শুভ্র ভয়ে-বিস্ময়ে, দ্বিধায় থমকে দাঁড়াল। তারপর কী মনে করে ছোরাখানাকে খপ

করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। এক নিঃশ্বাসে বাবার ঘরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাবা, দিদি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।'

সত্যেনবাবু একসঙ্গে এতগুলো চমক কোনো দু-দিনের ভিতর পাননি এর আগে। ক্রমশ তাঁর অভ্যস্ত হয়ে আসছিল। তিনি আচ্ছন্নের মতো বললেন, 'দেখি কত কাঁদাতে পারো।'

শুভ্রর পিছু পিছু সুলক্ষণাও ছুটেছিল। সে তার বিপর্যস্ত কেশবেশ নিয়ে পাগলির মতো ঘরে ঢুকল। বলল, 'না, বাবা, আত্মহত্যা নয়।'

'তবে কী? তবে কী!'

'আত্মহত্যা নয়। সত্যি বলছি।'

'তবে কেন ওই ছোরা?'

সুলক্ষণার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আত্মরক্ষা।'

সত্যেনবাবু ও শুভ্র দু-জনেই চীৎকার করে প্রতিধ্বনি করলেন, প্রশ্নসূচক স্বরে। শুভ্রর রাগ হচ্ছিল তার অত বড়ো একটা আবিষ্কার ভেস্তে যাওয়ায়! সত্যেনবাবু তো মনে মনে প্রলয়নাচন নাচছিলেন সোম-রস পান করে।

সত্যেনবাবু হুকুম করলেন, 'আন ওর মুন্ডুটা পেড়ে।'

শুভ্র বলল, 'শুধু মুন্ডু কেন? ধড়টাও।'

সোম তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। যে শুভ্র তার সঙ্গে মাথা সোজা করে কথা বলতে ভরসা পেত না, সেই গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বলল, 'আসুন।'

সোম আশ্চর্য হয়ে শুধালো, 'কী ব্যাপার?'

ফেরারি আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারায় হঠাৎ যে আনন্দ হয় শুভ্র সেই আনন্দের পীড়ন গাম্ভীর্যের দ্বারা প্রতিহত করে বলল, 'ব্যাপার গুরুতর।'

সত্যেনবাবু ন্যায়ের সঙ্গে করুণা মিশ্রিত করে হাকিমি ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী বলবার আছে?'

সোম কিছু বুঝতে না-পেরে সুলক্ষণার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। সুলক্ষণা ততক্ষণে লজ্জায় মরে গেছে। কেমন করে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বাবার কাছে আবৃত্তি করবে, তাই তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। সে সোমের চাউনির পথ থেকে নিজের চাউনিকে সরিয়ে নিল।

সত্যেনবাবু একটা মস্ত বক্তৃতার পাঁয়তারা কষছিলেন মনে মনে। শুভ্র ভাবছিল হুকুম পেলে সোমের পিঠে কোন লাঠিখানা ভাঙবে। ওসব অপ্রিয় কর্তব্য চাকরকে দিয়ে করাতে নেই, হাজার হোক সোম ভদ্রলোকের ছেলে—বিলেতফেরত।

সত্যেনবাবুর বক্তৃতা শুরু হল। 'পাপিষ্ঠ', তিনি সোমকে সম্বোধন করলেন, 'পাপিষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম, শিক্ষা তোমার সাধারণের দুষ্প্রাপ্য, তুমি সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতী। কিন্তু চরিত্রে তুমি ছাগল—(ছাগলের সংস্কৃত স্মরণ করে) হ্যাঁ, চরিত্রে তুমি ছাগ, তুমি অজ।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি চেয়ে দেখলেন কোনো এফেক্ট উৎপন্ন হল কি না। সোম বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ভাবছিল সকালে সত্যেনবাবুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয়েছিল তখন তো তিনি তার চরিত্রহীনতার স্বীকৃতি শুনে ক্রুদ্ধ হননি, বিলেতফেরতাদের অমন হয়ে থাকে বলে প্রকারান্তরে অনুমোদন করেছিলেন! তবে সুলক্ষণাকে ওকথা বলেছি বলায় তিনি আঘাত পেয়েছিলেন বটে। সেই অপরাধে এই দন্ড? তাকে কল্পনার অবকাশ না দিয়ে আপনি সত্যেনবাবু তার অপরাধের চার্জ তাকে শোনালেন।

বললেন, 'আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে আমার কন্যার ওপর প্রশস্ত দিবালোকে বলপ্রয়োগ—হে পাপিষ্ঠ, নারীধর্ষণের ইতিহাসে এমন অঘটন ঘটেছে বলে শুনিনি কিংবা পড়িনি, উকিল হিসেবে এমন মামলা পাইনি।

ওরে, আন তো পিনাল কোডখানা। দেখি কোন ধারায় পড়ে—৩৫৪ কি ৩৭৬। না, পুলিশে দেব না, কেলেঙ্কারিতে কাজ নেই। বলো, তুমিই বলো, পাপিষ্ঠ প্রবর, ঘরোয়া সাজার মধ্যে কোনটা তোমার উপযুক্ত।'

সোম ইতিমধ্যে ছোরাখানাকে লক্ষ করে কতকটা আঁচতে পেরেছিল তার অপরাধ। সাজা? তার ইচ্ছা করল বলে, আপনার মেয়েটিকে আমাকে দিন, উনিই আমার শাস্তিরূপিণী, সারাজীবন অবিশ্বাসের কারাকক্ষে আমাকে কয়েদি করে রাখবেন। সুলক্ষণা যে পিতার নিকট তার নামে নালিশ করেছে এতে তার সন্দেহ ছিল না।

বলল, 'অপার আপনার কৃপা। সত্যযুগের মহারাজ হবুচন্দ্র কলিযুগে কবি সত্যেন্দ্রচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ। সাজা? অপরাধীকে সাজা দিতে গিয়ে স্বয়ং শূলে চড়ে সশরীরে স্বর্গে গেছলেন মনে পড়ে না কি?'

'পাষন্ড!' সত্যেনবাবু তর্জনী উদ্যত করে তর্জন করলেন। 'লিখব আমি তোমার বাবা জাহ্নবীবাবুকে। তিনি যদি তোমার উপর ইচ্ছা প্রয়োগ করতে অসম্মত হন, যদি তোমাকে এই মেয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে না-দেন, তবে তোমার বল প্রয়োগের সাজা দিতে অক্ষম সেই জেলা জজকে অকর্মণ্য বলে জানব। জানব যে তিনি সেই পন্ডিতের মতো ভন্ড যিনি বলেছিলেন, আমার ছেলে মাকড় মেরেছে? মাকড় মারলে ধোকড় হয়।'

মামলার রায় শুনে সোম ফেলল হেসে। শুভ্রও হল নিরাশ—কোথায় 'শালা হিঁয়াসে নিকলো' বলে দু-ঘা বসিয়ে দেবে, না নিজেই বনবে শালা। সবচেয়ে বিস্মিত হল সুলক্ষণা। এত তম্বির পর এই তামাসা! তাকে সোমের কাছে এমন হাস্যাস্পদ করবার প্রয়োজনটা কী? না, তার বিবাহ। সোমের মতো পাত্র যেন আর হয় না। 'চেষ্টা করিলে কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর?'

সব শিক্ষিতা মেয়ের মতো তারও ছিল স্তবস্তুতির ক্ষুধা। কেউ তাকে 'মানসী' বলুক, 'সাকী' বলুক, বলুক 'Eternal Feminine' —তবে তো সে করবে বরদান। সে কি দেবে বরণমালা? না। সে দেবে বরমাল্য। কেউ কি তার বর হবে? না। সকলে হবে তার বরপ্রার্থী, তাদের একজন হবে তার বরপ্রাপ্ত।

এমন যে সুলক্ষণা—যার বীণাবাদন একদিন দেশবিশ্রুত হতে বাধ্য—যার চরণে এখনি মাকালের মতো কত অকর্মা দুবেলা পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে—তাকে একদিন সোমের চেয়ে নিষ্কলুষ অথচ সোমেরই মতো কৃতকর্মা কেউ কি দেবে না অর্ঘ্য? সে অপেক্ষা করবে।

সুলক্ষণা বলল, 'আসুন, কল্যাণবাবু, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। অমন সাজা আপনাকে পেতে হবে না, কারণ আপনার বিরুদ্ধে ওই অভিযোগটা সম্পূর্ণ আনুমানিক। আমি যে এই প্রহসনের সূত্রধার নই তা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কল্যাণবাবু।'

৪
অমিয়া

'এই, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম কল্যাণ। তোমার?'

খোকা হেসে লুটোপুটি খায়। হি হি হি হি। হা হা হা হা। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে,

'এই, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম কল্যাণ। তোমার?'

খোকা আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। হো হো হো হো। তারপর আবার সেই প্রশ্ন—

'এই, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম কল্যাণ।' সোম হাল ছাড়ে না। 'তোমার?'

'আমার নামও কল্যাণ।' খোকা দাঁত বের করে চোখ অর্ধেক বুজে আধো আধো ভাষায় বলে।

সোম তাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে। বলে 'আমাদের দু-জনের এক নাম। না?'

'হ্যাঁ। তোমার বাবার নাম কি কুণাল?'

সোম এই লজিকের কাছে হার মানল। বলল, 'না।'

তখন খোকা জিজ্ঞাসা করল, 'তবে তোমার নাম কল্যাণ হল কেন?'

এর আর উত্তর হয় না। সোম বলল, 'তুমিই বলো না, আমার নাম কল্যাণ হল কেন।'

খোকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবল। জানালা দিয়ে দেখল একটা পায়রা। ভাবনা ভুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল, 'ধর ধর' করতে করতে।

'ওহে তোমার ছেলেটা তো ভয়ানক তুখোড়।' কুণালকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোম বলল, 'প্রথমে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল, তারপর আমাকে লজিকে হারিয়েদিল।'

পুত্রের কৃতিত্বে কুণাল বিনীতভাবে গৌরব বোধ করল। বলল, 'আগে এক পেয়ালা খাও। ওর দুষ্টুমির গল্প অষ্টাদশ পর্বেও শেষ হওয়ার নয়, ধীরে ধীরে শুনো পরে।'

আদর্শ স্বামী। স্ত্রীর শ্রমলাঘব করবার জন্য একটা আস্ত ট্রে বয়ে এনেছে—ওর মতো ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে ওই এক গন্ধমাদন।

ললিতা এল খাবার হাতে করে। সে কত কী তৈরি করেছে। সমস্ত তার নিজের হাতের। সোম বলল, 'জানো ললিতা, তোমার ছেলেটা কী সাংঘাতিক সেয়ানা। ও ছেলে বড়ো হলে মোক্তার হবে দেখো।'

'হুঁ।' ললিতা অভিমান করে বলল, 'সেই আশীর্বাদ কোরো। মোক্তার! মোক্তার না দারোগা!'

'কেন, মোক্তার পছন্দ হল না? কুণাল যদি মাস্টার না-হয়ে মোক্তার হত তাহলে কি তুমি তাকে নিরাশ করতে?'

'যাও!' ললিতা ধমক দিয়ে বলল, 'খাও, খাও, বিলেতফেরতা বক্তিয়ার। বাপ মোক্তার হলে ছেলের উকিল হওয়া উচিত। বাপ উকিল হলে ছেলের ব্যারিস্টার হওয়া দরকার।'

কুণাল ফোড়ন দিল, 'নইলে এভল্যুশন কিসের?'

'সত্যি।' ললিতাটা স্বভাবত সিরিয়াস। বলল, 'মেয়ে বি এ পাস হলে লোকে খোঁজে জামাই আই সি এস। কেন?'

'ওটাও কি হল এভল্যুশন?' বলল সোম।

'নিশ্চয়। পারিবারিক মর্যাদার এভল্যুশন।' তারপর কী মনে করে ফিক করে হাসল। বলল, 'ভবনাথবাবু যে এ বাড়িতে ধন্না দিতে দিতে 'ভবধাম' ছাড়তে বসেছেন, তাঁর একটা গতি করো।'

'বাস্তবিক' কুণাল ইতস্তত করতে করতে বলল, 'তোমাকে বলতেও কেমন-কেমন লাগে, অথচ একই প্রোফেশনের লোক, আমাদের অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পান্ডা।'

‘আমি জানি,’ সোম গম্ভীরভাবে বলল। ‘ভবনাথবাবু বাবাকেও চিঠি লিখেছেন। কী যেন তাঁর মেয়েটির নাম?’

‘অমিয়া।’

‘হ্যাঁ, অমিয়া, অমিয়ার একখানি ফোটোও পাঠিয়েছেন!’

‘তাহলে,’ ললিতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ‘বলো তোমার পছন্দ হয়েছে কি না। হুঁ, হুঁ, বলতেই হবে।’

‘হায়।’ সোম কপট ক্ষোভ ব্যক্ত করল, ‘এই তো দুনিয়ার রীতি। তোমরা বিয়ের আগে পুরো দু-বছর প্রেম করলে। আমাদের কি প্রাণে সাধ আহ্লাদ নেই, রস কষনেই?’

ললিতা ভুরু কপালে তুলে বলল, ‘হয়েছে। ভবনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম। জানো, ও বাড়িতে একখানা মাসিকপত্র পাবার জো নেই? পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বইও যদি পাও তবে সে স্বামী বিবেকানন্দের বই।’

‘ভবনাথবাবুর,’ কুণাল তার স্বাভাবিক নম্রতার সহিত বলল, ‘ডিসিপ্লিনেরিয়ান বলে নামডাক আছে। আর-এক যুগের মানুষ। এ কালের মহাস্বাধীন ছাত্ররাও তাঁর চোখের দিকে তাকালে একেবারে ভিজেবেড়ালটি।’

‘অথচ,’ সোম বলল, ‘এই ভবনাথবাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রবয়সির বাড়িতে ধন্না দিতে ইহধাম ছাড়তে বসেছেন।’

‘ইহধাম নয় গো।’ ললিতা শুধরে দিয়ে বলল, ‘ভবনাথবাবুর বাড়ির নাম ‘ভবধাম’। তাই ছাড়তে বসেছেন।’

সোম সশব্দে হেসে বলল, ‘বুঝেছি। তুমি একটা pun দিয়েছিলে! খোকার উপযুক্ত মা,’ ললিতা এতে পুলকিত হয়ে সোমের পাতে আরও পাঁচখানা লুচি তুলে দিল।

‘করো কী! করো কী!’

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

‘স্কুলের বই লিখেই,’ কুণাল বলল, ‘ভবনাথবাবু তিন তিনটে ভবধাম বানিয়ে ফেললেন—কলকাতায়, পুরীতে, দার্জিলিঙে।’

‘ভেবে দেখ, কল্যাণদা,’ ললিতা বলল, ‘অমিয়াকে তিনি একটা-না একটা বাড়ি দেবেনই। বাকি দুটোতেও তুমি বিনা ভাড়ায় থাকতে পারবে। ভবধামে যত দিন আছো বাড়িওয়ালাকে খুব ফাঁকি দিলে। আর আমরা,’ সে মাথা দুলিয়ে সহাস সকরুণ স্বরে বলল, ‘আমরা তো ভগবানের চেয়ে ওকেই বড়ো বলে মানি। যেহেতু ভগবান যদি অবতাররূপে কলকাতায় বাসা করেন তাঁকেও বাড়িওয়ালার গঞ্জনা শুনতে হবে।’

‘তা হলে,’ সোম বলল, ‘দাঁড়ায় এই যে বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে বাড়িওয়ালা শ্বশুর চাই। শ্বশুরকন্যার প্রেম সংসারী মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক।’

‘প্রেমিক প্রেমিকাকে,’ ললিতা বলল, ‘রেল কোম্পানি কনসেশন টিকিট দেয় না, গয়লা দেয় না খাঁটি দুধ, মুদি তাগাদা দিতে ছাড়ে না, ধোপা ছাড়ে না তাগাদা দেওয়ার কারণ দিতে। রোগবীজাণুরা তেমনি আশ্রয় করে, পাগলা কুকুরে তেমনি তাড়া করে, মোটরওয়ালা তেমনি চাপা দেয়।’

সোম কুণালকে ফিস ফিস করে অথচ ললিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ‘বিয়ের পর ললিতা বিজ্ঞ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আগে হলে বিয়েই করত না, অন্তত তোমাকে।’

‘যাও,’ বলে ললিতা গোসা করে থালা ও ট্রে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খবর পেয়ে ভবনাথবাবু স্কুল থেকে ‘ভবধামে’ ফিরলেন না, সোজা এলেন সোমকে দেখতে।

রাশভারী মানুষ। আধখানা কথা মুখে রাখেন। বললেন, ‘দেখে এলে?’

সোম বলল, ‘আজ্ঞে?’

‘ইউরোপ দেখে এলে?’

‘আজ্ঞে।’

‘কোনটা ভালো? ওদেশ না-এদেশ?’
‘আজ্ঞে এদেশ।’
‘ঠিক বলেছ।’ যেন ক্লাসে ছাত্রের উত্তর শুনে পিঠ চাপড়ে দিলেন। ‘ঠিক। কেন এদেশ ভালো? (যেহেতু) এদেশ আমাদের দেশ। ‘এই দেশেতেই জন্ম (আমার) এই দেশেতেই মরি!’ ‘কোন (বিষয়ে) অনার্স?’
‘ইংরেজিতে।’
‘বেশ, বেশ। আমার অমিয়াও সেই (বিষয়ে) অনার্স। ভালো মেয়ে। রাঁধতে জানে। (কী কী) খেতে ভালোবাসো?’
‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে ভালোবাসি।’
‘(কী কী) খেতে?’
‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে আর শুতে।’
তিনি বিষম কটমট করে তাকালেন। ‘কী বললে? (আবার) বলো।’
‘আজ্ঞে, খেতে ভালোবাসি।’
‘কী খেতে?’
‘চানাচুর।’
‘চানাচুর? রোসো, (অমিয়াকে) জিজ্ঞাসা করে দেখি। চানাচুর? (রোসো) জিজ্ঞাসা করে দেখি। আর কী (খেতে ভালোবাসো)?’
‘আলুর দম।’
‘হুঁ! ওদেশে মেলে না। আলুর দর কী রকম?’
সোম মুশকিলে পড়ল। কোনোদিন আলু কেনেনি। বলল, ‘একটা এক পেনি করে।’
‘পেনি তো আনা। এত!’
‘আজ্ঞে।’
‘ওদেশ ভালো নয়। Plain living নেই। (সুতরাং) High thinking নেই।’
সোম মনে মনে বলল, তাই কেউ Translation ও Essay Writing-এর বই লিখতে পারে না।
ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এরোপ্লেন?’
‘এরোপ্লেন কী? দর কত?’
‘না। চড়েছ?’
‘আজ্ঞে না।’
‘আহা (ওটা) বাকি রেখে এলে!’
‘হবে একদিন।’
‘না, না। বিয়ের পরে (হতে) পারে না। Crash করলে (বউ বিধবা হবে)।’ ভবনাথবাবু চিন্তা করে বললেন, ‘গান?’
‘আজ্ঞে।’
‘ভালোবাসো?’
‘আজ্ঞে।’
‘অমিয়া (গান) জানে। শ্যামা সংগীত। ওর নাম কী? ওই মুসলমান?’
‘কোন মুসলমান?’
‘ইসলাম। ...নজরুল ইসলাম। ওর গান—(ভবনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন)।’
‘কেন?’
‘কেন আবার? মুসলমান। গানেন অর্ধভোজনং। কে জানে কী খায়!’

সোম মনে মনে বলল, আমিও তো ওদেশে ও জিনিস খেয়েছি। অতি উপাদেয় গব্যপদার্থ, পঞ্চগব্যের অতিরিক্ত ষষ্ঠ গব্য। শুনেছি স্বামীজিও খেতেন।

এতক্ষণ কুণাল চুপ করে ছিল। মানুষটি সে মুখচোরা, কুণো, সংকোচশীল। ভবনাথবাবু তাকে বললেন, ‘একে (নিয়ে) একদিন আমাদের ওখানে (এসো)।’

‘যে আজ্ঞে।’

‘তোমার স্ত্রীও (আসুন)।’

‘তাঁকে বলব।’

‘আর সেই বাচ্চাটা (কোথায়)? (তাকে তো) দেখছিনে?’

‘খেলা করছে।’

‘উঁহু। (সব সময়) খেলা ভালো নয়। একটু একটু এ বি সি ডি শিখুক।’

‘মোটে তিন বছর বয়স।’

‘বলো কী! তিন বছর নষ্ট করেছে।...আচ্ছা উঠি! কাল রাত্রে ওখানেই (খাওয়াদাওয়া) হবে। আসি।’ তিনি নমস্কারের প্রতিনমস্কার করলেন।

ভবনাথবাবু প্রস্থান করলে ললিতা ছুটে এল। ‘কি কল্যাণদা। শ্বশুর পছন্দহল?’

‘শ্বশুরের পছন্দ হল কি না তাই ভাবছি।’

কুণালের মুখ ফুটেছিল। সে বলল, ‘ভয় পেয়ে গেছো তো?’

‘ভাবছি এই বাঘার সঙ্গে ইয়ার্কি খাটবে না। দাশুবাবুকে যা করে রেখে এসেছি আর সত্যেনবাবুকেও করেছি যেমন জব্দ!’

ললিতা ও কুণাল একত্রে জিজ্ঞাসা করল, ‘সে কেমন?’

সোম বলল সমস্ত কথা। শুনে ললিতা বলল, ‘অমন একটা পণ করা সংগত হয়নি। ও যে ভীষ্ম হবার পণ!’

‘কিন্তু তুমিই বলো, কুণাল যদি দুশ্চরিত্র হত ও তুমি যদি না-জেনে তাকে বিয়ে করতে, তবে কি তোমাদের অহরহ মনে হত না যে তার চেয়ে ভীষ্ম হওয়া ছিল ভালো।’

কুণাল লজ্জিত ও ললিতা কুপিত ভাবে পরস্পরের দিকে তাকাল। যেন ‘যদি’ নয়, সত্যি। তারপর ললিতা শুষ্ক হাসির সঙ্গে বলল, ‘তবু ভীষ্ম হবার চেয়ে সেভালো।’

‘কিন্তু কে চায় ভীষ্ম হতে। আমি আমার মনের মতো স্ত্রী পেলে রূপগুণ নির্বিচারে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করি। প্রেমফ্রেম বাজে—কেবল সময়ক্ষেপ ও হৃদয়যন্ত্রণা।’

এবার প্রেমের পক্ষ নিয়ে ললিতা লড়াই করল। তখন সোম বলল, ‘তুমি তো বলেছ প্রেমিক প্রেমিকা God's chosen people নয়, রেল কোম্পানি তাদের কনসেশন টিকিট দেয় না ইত্যাদি।’

‘কিন্তু,’ ললিতা বলল, ‘তুমিও তো বলেছো তোমার প্রাণে কি সাধ আহ্লাদ নেই, রস কষ নেই। তুমি দেখছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাও।’

‘যাক,’ কুণাল থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘ঝগড়া করে কাজ নেই। ভবনাথবাবু প্রেমেরও বিরোধী, পণেরও। কল্যাণ ওঁর কাছে কথাটা কীভাবে পাড়ে তাই দেখব আমরা।’

পরদিন ভবনাথবাবু তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র মনুর হাতে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থের এক সেট উপহার পাঠালেন। একখানির নাম, *Intelligent Children's Guide to English Grammar and Idiom.* তার ভূমিকায় আছে, ‘The author begs to acknowledge with fervent appreciation the labour of love bestowed by his beloved eldest daughter Miss Amiya Bose, B A student...’

আর একখানির নাম, *1000 Unseen Passages by Bhabanath Bose,* B A Headmaster of...Institution (29 years' experience), author of ... (২৯ খানা কেতাব) and Miss Amiya Bose, B A (Hons).

তৃতীয় একখানা বইয়ের নাম *Easy Conversations at Home and School.* সেটার উৎসর্গ পত্র এইরূপ —'To my dutiful eldest daughter Miss Amiyakana Bose on her passing the Matriculation Examination in the First Division.'

এতদিন যে সোম অমিয়কণার মতো বহু বিজ্ঞাপিত পাত্রীর পরিচয় পায়নি এই এক আশ্চর্য। এক Intelligent Children's Guide-এরই ইতিমধ্যে ৭০০০ খানা বিক্রি হয়েছে। মনু বলল, 'লোকে স্বদেশি পেলে বিদেশি কিনবে কেন? Nesfield-এর দফা রফা। ম্যাকমিলান বাবাকে কত offer করেছে জানেন?'

শুনে সোম মনুকে একটা সিগ্রেট offer করল। মনু কি তা নিতে পারে! ভবনাথবাবু জানতে পারলে তার দফা রফা। সোম বলল, 'আমি কি আপনার বাবাকে বলতে যাচ্ছি? নিলেন, খেলেন, ফুরিয়ে গেল।' একজন বিলেতফেরতা তাকে সমকক্ষ ভেবে সিগ্রেট নিতে বলছেন, গৌরবে তার বুক ফুলে উঠেছিল। সে একটা নিল, নিয়ে টান দিতেই তার মাথা ঘুরে গেল নেশায় এবং দম্ভে। দু-দিন পরে হয়তো এঁরই শালা হবে, খাতির করে কথা বলবে কেন? সে যা-তা বকতে শুরু করে দিল। সোমও তাকে প্রশ্রয় দিল। জিজ্ঞাসা করল, 'অমিয়কণা আপনার বড়ো, না?'

'হ্যাঁ—বড়ো। দেড় বছরের বড়ো আবার বড়ো। ওর নাম অমিয়কণা কবে হল? সে আমার জন্মের বহু পরে।'

'কী রকম?'

'ওকে আমরা টুলী বলেই ডাকতুম। যদিও ভালো নাম শুভঙ্করী। স্কুলে নাম লেখাবার সময় হেড মিসট্রেস বললেন, ও নাম রাখলে কেউ বিয়ে করবে না। তিনিই নামকরণ করলেন অমিয়কণা। তারপর সে নাম সংক্ষেপ করা হয়েছে, আজকাল আবার লম্বা নাম কেউ পছন্দ করে না।'

'লম্বা নাকের মতো।'

'হ্যাঁ—যা বলেছেন। আমার নাম ছিল জগদানন্দ বসু। আমি ওটাকে ছেঁটেকেটে করেছি জগদা বসু। তবু সকলে আমাকে মনু বলেই ডাকে।'

'আমি কিন্তু জগদা বলে ডাকব।'

'সৌভাগ্য!'

'দেখুন জগদাবাবু, আপনি তো ধরতে গেলে আমার বন্ধুই—কেমন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি আমার Only best friend, মাইরি।'

'নিন, আর একটা সিগ্রেট নিন। 'না' বলবেন না। বিলিতি নয়, ইটালিয়ান! অনেক যত্নে এনেছি কাস্টমস-এর চোখে ধুলো দিয়ে।'

মনু শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, 'তাহলে দিন। আপনার মতো বন্ধুর মহার্ঘ দান মাথায় করে নিই।'

সোম মনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে সুর নামিয়ে বলল, 'দেখুন জগদাবাবু, জগদাবাবু কেন বলি, জগদা, বন্ধুর জন্যে একটা কাজ করে দিতে হবে।'

জগদা তড়িৎস্পৃষ্টের মতো কান সরিয়ে নিল। পরমুহূর্তে কানটা আরও একটুখানি ঝুঁকিয়ে ব্যগ্রভাবে বলল, 'হুকুম করুন।'

'দেখ,' সোম ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস না-করলে একথা বলতুম না।'

'আমি শপথ করছি,' জগদা দুই চোখে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'যদি বিশ্বাস রক্ষা না করি তবে আমার দুই চোখ—হ্যাঁ, দুই চোখ কানা হয়ে যাবে।'

'ছি, ছি,' সোম বলল 'শপথ কে চায়? মনের জোর।'

'হ্যাঁ! মনের জোরে আমার সঙ্গে ক-জন পারে। জানেন আমি একটা ভূতুড়ে বাড়িতে তিন রাত ছিলুম। তেরাত্রিবাসের পর আমার চেহারা যা হয়েছিল, যদি দেখতেন তবে আমাকেই ভূত বলে ঠাওরাতেন।'

'বেশ, বেশ। অমনি মনের জোর চাই।' কিছুক্ষণ পরে সোম বলল, 'আজ আমি আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। আপনার দিদিকে দেখব। কিন্তু শুধু দেখলে তো হবে না। একটু কথাবার্তা কওয়া দরকার তাঁর সঙ্গে।'

'এই কাজ! আচ্ছা, আমি—'

'না, অত সোজা নয়। আমি চাই নির্জনে কথা বলতে। ঘরে অন্য কেউ থাকবে না, বাইরেও কেউ আড়ি পাতবে না।'

মনুর মুখ শুকিয়ে সরু হয়ে গেল। সিগ্রেট খসে পড়ল তার দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে। বাড়ি তো ওর নয়, বাড়ি ওর বাবার, ওর মা-র। তাঁদের কাছে কেমন করে অমন প্রস্তাব করবে? দিদিকে বলতে পারে, কিন্তু দিদিও তো মালিক নয়।

সোম বলল, 'কি ভাই, পারবে না?'

'আমাকে মাফ করবেন,' জগদা অত্যন্ত কাতরভাবে বলল। 'আমাদের বাড়িতে আশ্রিত অভ্যাগত নিয়ে ষোলো-সতেরো জন মানুষ, নিভৃত স্থান কোথায় পাব? তা ছাড়া who is to bell the cat?'

সোম ভেবে বলল, 'আচ্ছা এমন হয় না? আমার বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী যদি তোমাকে ও তোমার দিদিকে নিমন্ত্রণ করেন তোমরা আসবে?'

'আমরা তো আসতে উৎসুক ও উদ্যত। কিন্তু বাবা বলেন,' মনু চুপি চুপি বলল, 'এঁদের বিবাহ অসিদ্ধ। এঁদের একজন বামুন, আর একজন কায়স্থ। এঁদের সন্তান হচ্ছে বর্ণসংকর, দোআঁশলা। এঁদের বাড়ি নিমন্ত্রণ অসম্ভব।'

সোমের ক্রোধে বাগরোধ হল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ অসম্ভব! সোম লক্ষ করেছিল যে ভবনাথবাবু চা ছুঁলেন না। অথচ নির্বিকারমুখে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ অসম্ভব। অথচ দৌড়াদৌড়ি, ধরাধরি, ধন্না—এসব সম্ভব। ওঃ! এই ভবনাথটাকেও শিক্ষা দিতে হবে দাশরথি ও সত্যেনের মতো।

'আচ্ছা, তা হোক,' সোম বলল, 'নিমন্ত্রণ গ্রহণ নাই করলে। এমনি বেড়াতে আসতে দোষ কী? এই যেমন তুমি আজ এসেছ?'

'তাও,' মনু বলল, 'আপনার জন্যে। কিন্তু আপনার জন্যে দিদি তো আসতে পারে না।'

সোম বলল, 'হুঁ'।

অনেক ভেবে সোম একটাও ফন্দি বের করতে পারল না। মনুকে বলল, 'আচ্ছা, ভাই জগদা; আমার জন্যে তোমার দিদি না আসুন, তুমি কিন্তু এসো কাল এইসময়।'

'গুড ইভনিং, নমস্কার। এই যে, আসতে আজ্ঞা হোক,' বলে যে সুপার-ভদ্রলোকটি সোমাদিকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁর নাম দ্বিজদাসবাবু, ভবনাথবাবুর কনিষ্ঠ। হাসিখুসি মানুষটি, বাঁটোয়ারায় তাঁর ভাগে পড়েছে হাসি আর তাঁর দাদার ভাগে পড়েছে রাশি অর্থাৎ রাশভারিত্ব। 'আসুন, এইখানে বসুন। আহা, ওখানে কেন, এখানে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। ডাবের জল খাবেন, না ঘোলের শরবত খাবেন? হলই বা শীতকাল। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। কিছু খাবেন না, তা কি হয়! এক পেয়ালা চা? চা যেকোনো সময় খাওয়া যায়, বাড়িতে খেয়ে এসেছেন বলে এখানে খাবেন না, ও কি একটা কথা হল কুণালবাবু?'

সোমের বন্ধু বলে কুণালেরই খাতির বেশি। ভবনাথবাবুদের ধারণা কুণাল যা বলবে সোম তাই করবে। কুণালের পছন্দ নিয়ে সোমের পছন্দ। তাই কুণালকে খামোখা দুটি ছোটো মেয়ে দুই পাশ থেকে দুই সখীর মতো পাখা করতে শুরু করে দিল। হিমেল হাওয়া লেগে সে বেচারার ইনফ্লুয়েঞ্জা হবার দাখিল। এমনিতেই তো রোগা মানুষ। পড়ে পড়ে চোখদুটির মাথা খেয়েছে, অশোকপুত্র কুণালের মতোই অন্ধ—চশমা খুলেনিলে।

সোমাদি যেঘরে বসলেন সেটার সিলিং ছাড়া কোনোখানে একটুও ফাঁক ছিল না। দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান ফোটো, পট তৈলচিত্র ভবনাথপরিবার, দশমহাবিদ্যা, অমিয়কণা, স্বামীজি, পরমহংসদেব, দিল্লি দরবার, আশুতোষ মুখুজ্যে, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন ধুতির উপরে মিলওয়ালাদের নামাঙ্কিত যে সব দেবদেবীর ছবি থাকে সেগুলিও বাদ যায়নি। মেজের উপর একটি বৃহৎ পালঙ্ক—ভবানাথবাবুর বিবাহের। সেটি বোধ হয় অমিয়কণার বিবাহের যৌতুক হবে। আলমারি সিন্দুক বাক্স প্যাঁটরা ইত্যাদি ছাড়া টেবল চেয়ার তো আছেই, নইলে সোমাদি বসবেন কেমন করে? একটুখানি জায়গায় একটা ফরাশ পাতা ছিল। তার উপর ছিল একটি হারমোনিয়াম।

সোম ললিতার কানে কানে বলল, 'এই বাড়ির জামাই হলে বাড়িভাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু প্রাণ বাঁচবে বলে বোধ হচ্ছে না।'

ললিতা সোমের কানে কানে বলল, 'প্রাণের যিনি অধিক তিনি যদি থাকেন তবে প্রাণ গেলে ক্ষতি কী!'

ভবনাথবাবু তাঁর গৃহিণীকে ও অপরাপর কন্যাদেরকে চালন করে আনলেন, কেবল অমিয়া রইল রিজার্ভে। এঁদের সবাই কুণালকে ও ললিতাকে নিয়ে ব্যস্ত, সোমের প্রতি দৃষ্টি নেই কারুর। বেচারা সোম অভিমানে রাঙা হয়ে উঠল। ভাবল, কে এ বাড়িতে এই মুহূর্তে সর্ব প্রধান মানুষ? কে এই সংবর্ধনার নায়ক? কার একটা হাঁ কিংবা না-র উপর এদের আয়োজনের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে? সে আমি।

ওরা সকলে মিলে কুণালকে ও ললিতাকে সমস্তক্ষণ কথা কওয়াল। বেচারা কুণাল যতবার বলে, 'কল্যাণ যে বকোমধ্যে হংসোযথা হয়ে রইল, বকবক করছি বলে আমরা যেন বক,' সোম ততবার একটা রহস্যময় হাসি হাসে। প্রীতিকণা, জ্যোতিঃকণা, নীহারকণারা তা দেখে চমৎকৃত হয়। ভবনাথবাবু বলেন, 'কুণালবাবু, আপনার উপর এ বাড়ির যা কিছু আশাভরসা। (আপনি কল্যাণের) অভিন্নহৃদয় বন্ধু।'

ভবনাথের ভবার্ণবের তরণী বলেন, 'ললিতা মা থাকতে আমি তো একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। তোরা কেউ নিয়ে যা তো খোকামণিকে; ও ঘরে সমস্ত সাজানো রয়েছে, যেটা ওর পছন্দ হয় সেইটে ওর হাতে দে। যাবে না? মামণিকে ছেড়ে যাবে না? চলো তা হলে তোমার মাকেও নিয়ে যাই। এসো মা ললিতা, গরিবের বাড়িতে যখন পা দিয়েছ তখন দেখতে হবে সমস্ত।'

মনু কোথায় গেছল। এসে সোমের পিছনে দাঁড়িয়ে সোমের চোখ টিপে ধরল। ভবনাথবাবুর তা দেখে চোখ উঠল টাটিয়ে। তিনি তো জানতেন না যে মনু সোমের বন্ধু। বাবা যে ওখানে বসেছেন, তাড়াতাড়িতে মনুর ওদিকে নজর পড়েনি। সে যেন হঠাৎ সাপ দেখে লাফ দিয়ে পালাল। সোম পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই। সে একটু আশ্চর্য হয়ে কার্যকারণ অনুধাবন করল।

দ্বিজদাসবাসু চায়ের তত্ত্ব নিচ্ছিলেন। ভৃত্যকে বললেন, 'রাখ, ব্যাটা, ওখানে রাখ। ব্যাটা উল্লুক। সাতদিন ধরে ট্রেনিং দিচ্ছি, বিলেতফেরত জেন্টলম্যানকে কেমন করে চা দিতে হয়!'

দ্বিজদাসের হাসির মুখোশখানা এত অল্পেতে আলগা হয়ে আসে, তা কে ভেবেছিল!

ভৃত্যটির সদ্য পদোন্নতি হয়েছে। ছিল বাগানে ও মালী। হয়েছে খানসামা। পাগড়ির উপর একটা 'B' হরফ আঁটা। অর্থাৎ বোস সাহেবের খানসামা। পান খেয়ে দাঁতগুলিকে পাকা রঙে রাঙিয়েছে, হাতের তেলো কোদাল ধরতে অভ্যস্ত বলে সেখানে বড়ো বড়ো কড়া। উর্দিটা কার কাছ থেকে ধার করে এনেছে, গায়ে ঢিলে হয়েছে। হাতের আস্তিন বার বার গুটোতে হচ্ছে।

দ্বিজদাসবাবু আবার মুখোশ এঁটে বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শীতকাল। কড়া হয়েছে? আর একটু দুধ দেবো? চিনি খান না? সব ঠিক আছে? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। ওরে ব্যাটা নন্দুরাম, যা যা, আরও দু-পেয়ালা নিয়ে আয়, ঝট করে—দাদার জন্যে, আমার জন্যে।'

ভবনাথ বললেন, 'এত দেরি (হচ্ছে কেন)?' চায়ের নয়, অমিয়ার।

দ্বিজদাস বললেন, 'ওঁরা তো এখনও ওকে যথেষ্ট সজ্জিত বলে মনে করতে পারছেন না বিলেতফেরত জেন্টলম্যানের পক্ষে।'—ওঁরা মানে দ্বিজদাসের উনি, গৌরবে বহুবচন।

মনু পা টিপে টিপে কখন এসে সোমের কাছে বসেছিল। ভবনাথ হুকুম করলেন, 'যা তো মনু।'

মনুকে যেতে হল না। অমিয়াকে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে কে একটি মহিলা ঘোমটা টেনে দিয়ে ঝপ করে সরে গেলেন। গিয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি মারলেন।

সুপ্রসিদ্ধ অমিয়া বোস ফরাশের উপর বসলেন।

পা দুটিকে ভাঁজ করে বাঁদিকে রেখে ডানহাতের উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। বাঁ হাতটি কখনো উঠে অবনত মুখের চিবুকে সংলগ্ন হল, কখনো নেমে ঊরুর উপর সংন্যস্ত রইল। দৃষ্টি তাঁর অধোগামী। ভুলেও সোমের অভিমুখ হল না।

সোম লক্ষ করল যে অমিয়ার চোখে চশমা নেই, মুখ নিটোল, শরীর সুঠাম। বিদুষীদের দেখলে যেমন বিতৃষ্ণা হয় অমিয়াকে দেখে তেমন হয় না। রং মলিন শ্যাম। ত্বক মসৃণ তৈলাক্ত।

তবে প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, আছে একটা নির্জীব জড়তা তার প্রকৃতিতে। যাদু নেই তার চলনে, চাউনিতে, নড়নে-চড়নে, ভঙ্গিতে স্থিতিতে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। তার বিদ্যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়নি। পাহারা ও ডিসিপ্লিন মিলে তার স্বভাবকে নিষ্পিষ্ট ও শিষ্ট করেছে। তার বিশিষ্টতার অবশিষ্ট নেই।

সোমের তো কথা বলার কথা নয়, কথা বলার ভার কুণালের উপর। কুণাল ইতস্তত করে বলল, 'মিস বোস, ইনি আমার বন্ধু মিস্টার কে কে সোম।'

অমিয়া সবাইকে একবার নমস্কার করেছিল। সোমকে একান্তভাবে নমস্কার করে আবার নতমুখী হল। না একটু হাসি, না একটা চাউনি। সোম এতক্ষণ বুদ্ধি আঁটছিল। বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু।'

অমিয়া পিতার দিকে তাকাল। পিতা কন্যাকে উৎসর্গ করে 'Easy Conversations'-এর বই লিখেছেন। কিন্তু কাজের বেলায় ঢু ঢু।

সোম যেন কোনোদিন বাংলা বলে না, যেন কত বড়ো ইঙ্গবঙ্গ। বলল, 'I've been reading your book, Miss Bose. How wonderful to meet the author of a book one's been reading!'

মিস বোস নীরব, নিঃস্পন্দ। তাঁর বাবা তাঁর দিকে সংকেত করে বললেন, 'Writing another.'

'But, Miss Bose, how on earth do you manage to write?'

মিস বোস আবার পিতার মুখের পানে চাইলেন।

'Oh, somehow,' পিতা কন্যার হয়ে উত্তর দিলেন।

সোম কুণালের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'Is she deaf or is shedumb?'

ভবনাথবাবু চটতে পারেন না, অথচ চটবার কথা। সহিষ্ণুভাবে বললেন, 'No, no, not deaf and dumb. Only shy.'

দ্বিজদাস এতক্ষণ বিলেতফেরতের বিশুদ্ধ ইংরাজি শুনে তাজ্জব বোধ করছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্বন্ধে সাহেবের ওরূপ ধারণা তাঁকে লজ্জা দিল। তিনি বলে উঠলেন, 'She is a Lakshmi girl, although learned like Saraswati.'

যাকে নিয়ে এত কান্ড সেও একটু উশখুশ করছিল। একেবারে পাষাণ তো নয়। সোম হাসি চেপে বলল, 'Then she ought to marry a Vishnu man.'

ভবনাথ দ্বিজদাসের উপর চটলেন। সে কেন ফোপরদালালি করতে যায়। দিক এখন এর জবাব!

জবাব দিতে না-পেরে দ্বিজদাস দাদার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করলেন। দাদার মুখটা বিরক্তিতে বিকৃত। যেন ওল খেয়েছেন।

এই সময় ভবনাথ গৃহিণী সদলবলে প্রবেশ করলেন।

তিনি বললেন, 'একটু গান হোক?'

দ্বিজদাস যেন বর্তে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান হোক।'

ভবনাথ ফরমাশ করলেন, 'তনয়ে তার তারিণী।'

অমিয়া হারমোনিয়ামের আওয়াজ দিয়ে আরম্ভ করল।

সোম বলল, 'Please, Miss Bose, I can't, I simply can't stand thatinstrument.'

মিস বোস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাজনা থামালেন। তাঁর শরীর কাঁপতে থাকল। দ্বিজদাস বউদিদিকে বললেন, 'আমি তো বলেছিলুম একটা পিয়ানো ভাড়া করতে। যাঁহা হার্মোনিয়াম তাঁহা পিয়ানো, হিন্দি হরফ শেখার মতো একটা দিন লাগে শিখতে।'

ভবনাথগৃহিণী বুঝতে পারেননি ইংরেজিতে সোম কী বলল। দেওরের কথা শুনে আন্দাজে বুঝলেন। সোমকে অনুনয় করে বলেন, 'হ্যাঁ বাবা। অত ধরলে চলবে কেন? আমরা গরিব বাঙালি গৃহস্থ, পিয়ানো কোথায় পাব বল? তবে তুমি যদি বলো যৌতুকের জন্যে একটা কিনব এখন। না জানি কোন দু-পাঁচশো টাকা না নেবে।'

সোম একপ্রকার কৃত্রিমস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনি—যা—ভাবছেন—আমি তা—mean করিনি। I meant —তার মানে আমি mean করেছিলুম—হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র—আমার কানে—যন্ত্রণা করে।'

দ্বিজদাস দোভাষীর কাজ করল। বলল, 'বউদি, উনি বলছেন হারমোনিয়ামটা না-বাজিয়ে অমনি গান করলে উনি শুনবেন।'

'তবে তুমি যে পিয়ানোর কথা বললে?'

ভবনাথ এর উত্তর দিলেন। বললেন, 'দ্বিজুটা বড়ো বাড়াবাড়ি (করছে)।'

দ্বিজদাস চুপ। আড়ালে থেকে দ্বিজদাসগৃহিণী মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

হারমোনিয়ামের প্রথম আওয়াজ বাড়িশুদ্ধ মানুষকে এই ঘরে ছুটিয়ে এনে জুটিয়েছিল—সাপখেলানোর বাঁশির সুরের মতো, ভালুক নাচানোর ডুগডুগির বোলের মতো। হঠাৎ বাজনা থেমে যাওয়ায় চারিদিক থেকে অস্বস্তির গুঞ্জন উঠল।

সব কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়। সংক্ষেপ করি। অমিয়ার মা তাকে বললেন, 'তুই অমনি গান কর।'

অমিয়ার বুক দুড়দুড় করছিল। যেন হারমোনিয়ামটাকে সোম তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গানটাকেও হয়তো তার গলা থেকে ছিনিয়ে নেবে। হয়তো বলবে, 'I can't I simply can't stand that noise.' আরম্ভ করতে তার ভরসা হচ্ছিল না। আরম্ভ যদি-বা করলে তবু আরম্ভই হয়তো শেষ এই আশঙ্কায় সে কেবলি হোঁচট খেতে থাকল।

সোম তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বলল, 'Fine! Fine!' তা সত্ত্বেও অমিয়ার আত্মবিশ্বাস উজ্জীবিত হল না। কয়েকটা কলি ডিঙিয়ে কোনোমতে সে সমে এসে ঠেকল।

সোম যখন বলল, 'Encore' তখন সে তার করুণ চোখ দুটি তুলে নিঃশব্দ মিনতি নিবেদন করল। সোম বলল, 'Thank you, Miss Bose.'

ফেরবার পথে ললিতা বলল, 'শুনলে তো, রান্নার অধিকাংশ অমিয়ারই হাতের। এমন মেয়ে দৈবে মেলে! যেমন বিদ্যায়, তেমনি স্বাস্থ্যে, তেমনি গানে, তেমনিরন্ধনে।'

সোম বলল, 'রন্ধনের ভার অন্যের উপর দিয়ে পরিবেশনটা যদি স্বহস্তে করতেন তবে আমি ক্রন্দন করতুম না। কিন্তু ওই নন্দুরাম খানসামা—'

কুণাল বলল, 'বিলেতফেরতের যথোপযুক্ত সৎকারের জন্যে ওঁরা চেষ্টার ক্রটি করেননি।'

'সৎকারই বটে,' সোম বলল, 'তবে তুমি ও ললিতা তো বিলেতফেরত নও, তোমাদের সৎকার অমনভাবে হল কেন জান?'

'জানি,' কুণাল সখেদে বলল।

'রক্ত গরম হয়ে ওঠে না?'

'ওঠা উচিত নয়।'

‘শুনছ ললিতা। তোমার স্বামীটি একটি অপদার্থ।’

‘যে দেশে,’ ললিতা বলল, ‘প্রত্যেকেই এক একটি পদার্থ সে দেশে একটি অপদার্থ থাকলে মন্দ হয় না। তুমিও যদি একটি অপদার্থ হতে আমি তোমার বোন বলে গর্ব অনুভব করতুম, কল্যাণদা।’

‘কেন, আমি অন্যায়টা কী করেছি!’

‘অমন ওরাং ওটাং-এর মতো ইংরেজি আওড়ালে অমিয়া কেন, যেকোনো বাঙালির মেয়ে বিপর্যস্ত হয়। ওর গানটাকে খুন করলে তুমি।’

‘তুমি ভাবছ ওর গান আরও ভালো ওতরালেই ও আর্টিস্ট হত?’ সোম হাসল। ‘আর্টিস্ট ছিল সুলক্ষণা, ওর ধাত আলাদা।’

‘গানে কাঁচা হলে কী হয়, কত বই লিখছে।’

‘বই লিখছে বলে কি ও একজন intellectual? ললিতা, আমি একটি চাষাণী পেলে বিয়ে করতে রাজি আছি, যদি পণের বাধা না থাকে। ললিতা, আমার কান্না পায় শিক্ষিতা মেয়েদের শ্রী দেখে! ভেবে দেখ ললিতা, অন্য কোনো সভ্য দেশে কি এমনটি সম্ভব? বি এ পাস করা বিদুষী মেয়ে পুত্তলিকার মতো ফরাসটার উপর জড়সড় হয়ে বসে রইল। কেন গেল সে গান করতে? কেন সে দৃপ্তকণ্ঠে বলল না যে আমি গান জানিনে, আমি যা জানি তাই জানি—তারই দ্বারা আমার বিচার হোক।’

‘আজকাল,’ ললিতা বলল, ‘শুধু শিক্ষার বিচারের উপর নির্ভর করে কোনো বিবাহযোগ্যা মেয়ের অভিভাবক নিশ্চিন্ত হতে পারেন না! দেশের হাওয়া বদলেছে। শ্বশুড় শাশুড়িরাও চান যে বউ গান করুক বা না-করুক অন্তত জানুক, জানুক বা না জানুক অন্তত জানাক।’

‘কুসংস্কার! কুসংস্কার!’ সোম ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, ‘একটার পর একটা কুসংস্কার এদের চিত্ত দখল করছে, আর এরা ভাবছে ওরই নাম শিক্ষা, ওরই নাম সভ্যতা। আমি বর্বর হতে চাই ললিতা। আমি সাঁওতাল মেয়ে বিয়ে করব।’

‘তা হলে,’ কুণাল হেসে বলল, ‘আমরা তোমার বাড়ি খাব না। খেতে দেবে সাপ কি গোসাপ।’

‘তার মানে,’ সোম বলল, ‘তুমি আমার প্রতি সেই ব্যবহার করবে, যে ব্যবহার করছেন ভবনাথ তোমার প্রতি। ভবনাথত্ব দেখছি আপেক্ষিক।’

‘সেই জন্যেই,’ কুণাল বলল, ‘রক্ত গরম হয়ে ওঠা উচিত নয়। সাঁওতালরাও যাদের হনুমান বলে তাদের প্রতি আচরণে ভবনাথবাবুর মতো। সাঁওতালের মেয়ে হনুমান বিয়ে করছে এমন গল্প ওদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।’

‘অতএব’, ললিতা হাসতে হাসতে বলল, ‘এই বিলিতি হনুমানটির বিয়ের আশা ছেড়ে দিলে ভুল করব, সাঁওতালের মেয়ে থাকতে।’

খোকা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ি পৌঁছে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল, ‘মামা।’

সোম বলল, ‘হুম হুম। আমি হনুমান আছে।’

খোকা বলল, ‘হনুমান আছে? কই হনুমান?’

সোম বলল, ‘হামি হনুমান।’

‘কই হনুমান কই?’

‘হুম হুম।’ বলে সোম তিন লাফ দিল।

‘হুম হুম।’ খোকা তার অনুকরণ করল।

‘ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো,’ বলতে বলতে ললিতা ছেলেকে ভিতরে নিয়ে গেল।

‘তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো হে,’ কুণাল বলল।

‘নাঃ। এই মেজাজ নিয়ে ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখব। একটু খেলা করতে হবে। আমার পক্ষে যা খেলা অপরের পক্ষে তা লঙ্কাকান্ড। আমি যে বিলিতি হনুমান।’

'আজ রাত্রেই?'

'আজ রাত্রেই।'

'সর্বনাশ! কী করবে তুমি?'

'তোমার এখানে তো টেলিফোন নেই। আমার একটা টেলিফোন দরকার।'

পাশের বাড়িতে টেলিফোন ছিল। অনুমতি নিয়ে সোম ডেকে বলল, 'দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি? আমি কল্যাণকুমার সোম।'

কল্যাণকুমার দ্বিজদাসকে স্মরণ করছেন এত লোকের মধ্যে। দ্বিজদাস খেতে খেতে উঠে ছুটে এলেন। 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। Good night, মিস্টার সোম।'

সোম বলল (ইংরেজিতে), 'আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে মাফ চাই।'

'না, না, না, না। বিরক্ত কীসের?..........'

'আজ আমি আপনাদের ওখানে সবাইকে জ্বালাতন করেছি এজন্যে আপনাদের সকলের কাছে আমি মার্জনাপ্রার্থী।'

'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। সকলেই আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ। মনু তো আপনাকে পূজা করছে। এমন অমায়িক নিরহংকার ভদ্রলোক বিলেতফেরতাদের ভিতর কেন, B N G S-দের ভিতরও দেখা যায় না।'

'ধন্যবাদ। এখন একটা জরুরি কথা আছে।'

'জরুরি কথা! জরুরি কথা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বিশেষ কাজে ওই রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিতে করে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

'নামবার সময় হবে না।'

'আচ্ছা।'

'মিস বোস যদি দয়া করে এক মিনিটের জন্যে ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে দেখা করেন আমি তাঁকে কিছু বলব।'

'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। অনায়াসে স্বচ্ছন্দ্যে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার দ্বিজদাস।'

'আর লজ্জা দেবেন না।'

ট্যাক্সি যখন 'ভবধামের' সামনে দাঁড়িয়ে ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক করল তখন রাত এগারোটা। গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে অমিয়া এসে ট্যাক্সির দরজার কাছে দাঁড়াল।

'সে কী! আপনি দাঁড়িয়েই থাকবেন! তা হয় না।' ইংরেজিতে এই কথা বলে সোম দরজাটা খুলে দিল—দিতে দিতে বলল, 'একসকিউস মি। গায়ে লাগল?'

'না না।' বলে যন্ত্রচালিতের মতো অমিয়া উঠে এল। কোনো অন্যায় বা অশোভন কাজ করছে কি না ভাববার সুযোগ পেল না। তার পিছনে একটু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ছিলেন দ্বিজদাস, মনু, নীহারকণা, নন্দুরাম (তখন সে খানসামার সাজ খুলে ফেলেছে) ও অন্যান্য জনকয়েক। ভবনাথবাবুর মাথা ধরেছে, তিনি নামেননি।

সোম যেন নিমেষের মধ্যে ছোঁ মেরে অমিয়াকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওঁরা সাক্ষীগোপালের মতো দারুভূত হয়ে থাকলেন। যখন ওঁদের সংজ্ঞা ফিরল তখন দ্বিজদাস বললেন, 'কই, টেলিফোনে তো অমন কোনো কথা হয়নি। কানে কি আমি কম শুনি? দাদাকে এখন আমি বোঝাব কী!'

ভবনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। যাতে ছাত থেকে না পড়েন সেজন্যে বাড়ির একটা কামরায় তাঁকে বন্দি করা হল। তিনি হুকুম করলেন পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু গৃহিণী ও-হুকুম নাকচ করলেন। দ্বিজদাসকে

তাঁর দাদা নির্বাসন দন্ড দিলে তাঁর বউদি তাঁকে পাঠালেন কুণালের ওখানে।

মনুর মনে পড়ল যে তার বন্ধু প্রস্তাব করেছিল তার দিদির সঙ্গে নির্জনে বাক্যালাপ করতে। এখন ওকথা সে মার কাছে খুলে বলল। মা বললেন, 'ধেড়ে কেষ্ট! ঘটে একটু বুদ্ধি ছিল না যে মাকে ওকথা আগে বলি। বয়স যতই বাড়ছে লক্ষ্মী ততই ছাড়ছে, তিন বছর আই এ ফেল-করা ছেলের আর কত বুদ্ধি হবে!'

মনু বকুনি সইতে না-পেরে বাইসাইকেল চড়ে গৃহত্যাগী হল। দিদিকে যদি উদ্ধার করতে পারে তবেই সে গৃহপ্রবেশ করবে নতুবা—নতুবা কী?

'ভবধাম' যখন লন্ডভন্ড তখন ট্যাক্সিতে অমিয়াকে সোম সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবে বলছে, 'Grand Hotel'-এ আগে কোনোদিন যাননি, না গেছেন মিস বোস?' (পরিষ্কার বাংলায়)

অমিয়া তখন স্বপ্ন দেখছে এই তো তার স্বপ্নের রাজপুত্র। বিলেতফেরত, Grand Hotel-এ নিয়ে যায়। সে সলজ্জস্বরে বলল, 'না।' চেয়েছিল সে বাইরের দিকে।

'তবে আপনি জীবনের কিছুই দেখেননি, মিস বোস। আপনার জীবনেরও আরম্ভ হয়নি।'

স্বপ্নে কথা বলতে লজ্জা কীসের? অমিয়া বলল, 'না।'

দৈবক্রমে সেদিন ছিল Gala night. সোম সাপারের ফরমাশ দিয়ে অমিয়াকে বলল, 'ভয় নেই। নিষিদ্ধ মাংস খেতে হবে না। কিন্তু মুশকিল এই ছুরি কাঁটা নিয়ে।'

এত আলো, এমন বাজনা, এরূপ নাচ,—অমিয়া কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এত সাহেব-মেম সে একত্র দেখেনি। সস্ত্রীক গুটিকয়েক ভারতীয়—বোধ হয় পারসি কি গুজরাটি—তাদের মধ্যে ছিটানো।

সোম শুধালো, 'নাচবেন?'

অমিয়া সবেগে ও সভয়ে মাথা নাড়ল!

সোম বলল, 'ও কিছু নয়। আধঘণ্টা অভ্যাস করলে দুরস্ত হয়ে যাবে।'

অমিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, 'না।'

তখন সোম একটা লেকচার দিল! 'মিস বোস, আপনারা শিক্ষিতা মেয়েরা এমন ক্ষীণজীবী কেন? কত ইংরাজি বই পড়লেন, প্রাণে কেন স্বাধীনতার হাওয়া লাগল না? ভাবছেন দেশ স্বাধীন হলে তারপর ব্যক্তি স্বাধীন হবে? ও যেন গাড়ি আগে চললে ঘোড়া পরে চলবে। স্বাধীন মানুষের দেশই হচ্ছে স্বাধীন দেশ—চলন্ত ঘোড়ার গাড়িই হচ্ছে চলন্ত গাড়ি।'

অমিয়ার তখন তর্ক করবার অবস্থা নয়। সে যে কী করেছে, কার সঙ্গে এসেছে, এসব ক্রমে ক্রমে তার ঠাহর হল। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—সে গোঁড়া হিন্দু বাড়ির আইবুড়ো মেয়ে, এসেছে এ কোন নরকে। কেন তার মতিচ্ছন্ন হল? না, তার তো এতে মতি ছিল না। ক্রমে তার স্মরণ হল, মিস্টার সোম তাকে গাড়িতে উঠিয়ে এক দৌড়ে এখানে এনেছেন। কেন তিনি এমন কাজ করলেন? কেন তিনি বাবার অনুমতি নিলেন না? অন্তত তার নিজের সম্মতি?

সোম লক্ষ করল অমিয়ার দুই গাল বেয়ে অশ্রুজলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তবু সে লেশমাত্র শব্দ করছে না। সোম ব্যঙ্গ করে বলল, 'সাবালিকা শিক্ষিতা তরুণী বটে। গ্র্যাজুয়েট এবং গ্রন্থকর্ত্রী।'

অমিয়া অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন।'

'সে কী! এখনও খাওয়া হয়নি যে!'

অমিয়া ফিসফিস করে বলল, 'খাব না।'

'না খান। খাওয়া দেখুন।'

অমিয়া ফিসফিস করে আর্তভাবে বলল,—

'বাড়ি যাব।'

'বাড়ি তো আপনার আলাদিনের বাড়ি নয় যে আপনার অসাক্ষাতে উড়ে যাবে। আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বাড়ি পুড়েও যাবে না, পড়েও যাবে না।'

অমিয়া কাতর স্বরে বলল, ‘দয়া করুন।’

‘দয়া? দয়া তো আপনারই করবার কথা। আপনার বাড়ি খেয়ে এলুম, তার ঋণ শোধ করতে দিন।’

অমিয়া তবু বলল, ‘খাব না। যাব।’

‘আপনারা নিমন্ত্রণ করলেন, আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম। আমার নিমন্ত্রণ আপনি রক্ষা না-করলে বুঝব আপনারা আমাকে হেয়জ্ঞান করেন! সেটা কি ভালো?’

অমিয়া তর্ক করল না, শুধু বলল, ‘যাব।’

অগত্যা সোম ফরমাশি খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে অমিয়াকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। বলল, ‘বাড়িও থাকবে, বাড়ির মানুষও থাকবেন, জীবনের দৈনন্দিন প্রক্রম থাকবে অক্ষুণ্ণ। থাকবে না একমাত্র আজকের রাতটি, রাত্রের একটি ছোটো ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টায় যে কয়টি কথা বলতে পারত একটি অচিন তরুণ সেই কয়টি কথা। অমিয়া দেবী, এখনও সময় আছে। ট্যাক্সিকে ঘুরতে বলব?’

বাড়ি পৌঁছে কী দেখবে তাই এতক্ষণ অমিয়ার কল্পনা অধিকার করেছিল, বিপরীত যাত্রার প্রস্তাব সেখানে প্রবেশ পেল না। অমিয়া ত্রস্তভাবে বলল, ‘না, না।’

ট্যাক্সি ছুটতে লাগল। ছুটতে লাগল পথের পাশের বাতি, ছুটতে লাগল সময়। সুযোগও ছুটতে লাগল।

সোম বলল, ‘আপনাকে আমার কিছু বলবার ছিল—নির্জনে। সেটা অ-বলা রইলে বিয়েও রয় অ-করা! সেই জন্যে আপনাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গেছলুম—যেখানে জনতা সেইখানে নির্জনতা। আপনি নিজের বিয়ে নিজের হাতে ভাঙলেন। এরপর যদি আপনার বাবা আসেন বাড়ি চড়াও করে ঝগড়া বাধাতে কিংবা যান আদালতে মামলা করতে তবে আর কি ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগবে? অমিয়া, এখনও সময় আছে।’

অমিয়া কেঁদে উঠল! উত্তর দিল না।

গাড়ি এসে বারান্দায় লাগল। অমিয়াকে নামিয়ে দিয়ে সোম বলল, ‘হাঁকাও।’

ললিতা ও কুণাল বাইরের ঘরে রাত জাগছিল। তাদের সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন দ্বিজদাসবাবু। কোন মুখে তিনি বাড়ি ফিরবেন? জিজ্ঞাসা করছিলেন, ‘কর্ণরোগের কোনো স্পেশালিস্টের নাম করতে পারেন? একবার দেখাই বাঁ কানটা। মিস্টার সোম আমাকে কী বললেন, আর আমি কী শুনলুম।’ এমন সময় সোম কপাটের কড়া নাড়ল। বলল, ‘কুণাল, জেগে আছ হে?’ পরিষ্কার বাংলা। দ্বিজদাস ভাবছিলেন আর-কেউ। কুণাল বলল, ‘বাঁচা গেল।’

সোম কুণালকে কী বলতে বলতে ঘরে ঢুকে দেখে—দ্বিজদাস। তিনিও সোমকে দেখে চমকালেন। ললিতা বলল, ‘কই, অমিয়া কই। ওকে কোথায় রেখে এলে?’

সোম নির্বিকার ভাবে বলল, ‘ওঁর বাপের বাড়িতে।’

‘যাওয়া হয়েছিল কোথায়?’ শুধালেন দ্বিজদাস।

‘রসাতলে।’ বলল সোম।

দ্বিজদাসের কেমন ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি কানে কম শোনেন। রসাতল নামে কোনো পাড়া তো কলকাতায় নেই। ওটা রসা রোড।

‘রসা রোডে এমন কী কাজ ছিল এত রাত্রে, আর অমিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী!’ তিনি সবিস্ময়ে বললেন।

‘ওকথা জানি আমি আর জানেন অমিয়া। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশনীয় নয়।’

ললিতা সাভিমানে বলল, ‘আমরাও শুনতে পাব না?’

কুণাল তাকে ইশারায় বলল, ‘চুপ চুপ।’

দ্বিজদাসবাবু অত্যন্ত দমে গেছলেন। পরের বাড়িতে অত বড়ো একজন বিলেতফেরতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে সাহস হবে কেন? তা ছাড়া লোকটিও তিনি গোবেচারি, মার্চেন্ট অপিসের কেরানি। সোমের

উপর তাঁর অখন্ড বিশ্বাস ছিল, অমন জেন্টলম্যান কি কখনো অন্যায় কাজ করতে পারে? এতক্ষণ তিনি নিজের কানকে দোষ দিচ্ছিলেন, এখন দিলেন নিজের নীচ মনকে।

দ্বিজদাস উঠতে যাচ্ছিলেন, সোম তাঁর দিকে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনারা তো আমাদের বাড়িতে বা আমাদের হোটেলে চা পর্যন্ত খাবেন না। আমাদের ঋণশোধ হয় কী উপায়ে?'

পরম আপ্যায়িত বোধ করে দ্বিজদাস বসে পড়লেন। নিলেন সিগ্রেট। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। কুণাল বলল, 'ডাবের জল কিংবা ঘোলের শরবত নেই, কিন্তু এক পেয়ালা চা হোক। কী বলেন দ্বিজদাসবাবু?'

'না ভাই, অসময়ে আর কেন ও সব?'

'চা তো যেকোনো সময় খাওয়া যায়।'—ওটা দ্বিজদাসেরই বচন।

দ্বিজদাস বললেন, 'অনেকটা দূর যেতে হবে, তাও পদব্রজে। শীতের হাওয়ায় হি হি করবার আগে শরীরটাকে একটু—হেঁ হেঁ—করা ভালো।'

ললিতা গেল চা তৈরি করতে।

এমন সময় 'খোলো, দরজা খোলো।' ঘন ঘন কড়া নাড়া। দুড়ুম দুড়ুম কিল, দড়াম দড়াম লাথি। কেমন অতিথি এরা? দ্বিজদাস ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সোম ললিতা-কুণালের জন্যে উদ্বিগ্ন হল। পুলিশ নয় তো?

কুণাল দরজা খুলে না-দিলে ভবনাথবাবু দরজা ভাঙতেন। 'এই যে কুণাল। এ মেয়ে আমার নয়। (এর) জাত ইজ্জত গেছে। ভবধামে (এর) ঠাঁই নেই। (একে) তোমার এখানে দিতে এলুম।'

ভবনাথের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে, তাঁর চাকর। কুণাল বলল, 'আসুন, আপনারা দয়া করে বসুন একটু।'

ভবনাথ বললেন, 'না। (তার) দরকার নেই।'

ললিতা কখন এসে ভবনাথপত্নীর হাত ধরেছিল। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি পত্নীকে টানলে পতি। বসবার ঘরে দ্বিজদাসকে আবিষ্কার করে ভবনাথ জ্বলে উঠলেন। 'ভাই (হয়ে) তুই এই চক্রান্তে লিপ্ত?' লক্ষ করলেন ভাইয়ের হাতে অর্ধদগ্ধ সিগ্রেট। 'ফ্যাল ওটা', বলে ভাইয়ের হাতের উপর কষিয়ে দিলেন এক ঘা। সিগ্রেটটা ছিটকে সোমের পায়ের কাছে পড়ল। সোম তার সিগ্রেটটাকে তারিফ করে টানছিল, ভবনাথের নাকের অদূরে ধোঁয়া ছাড়ল।

'কী সায়েব,' ভবনাথ বলেন সোমকে, 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে ষাঁড়ের মাথার ডালনা কেমন লাগল? ক-বোতল খুললেন?'

'সেটা আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেননি?' বলল সোম।

'যেমন দেবা তেমনি দেবী।' (ওর) গায়ের গন্ধ শুঁকেই (বুঝেছি) কী পড়েছে পেটে। 'ওয়াক—'

অমিয়ার চোখ খরগোশের মতো লাল। সে আবার চোখ মুছল।

'দিব্যি গ্র্যাণ্ড হোটেলি গন্ধ!' ভবনাথ বলতে থাকলেন। 'যে মানুষের নাক আছে সেই বুঝবে।'—নাক দিয়ে শুঁ শুঁ করে শুঁকলেন। তার দ্বারা নাকের অস্তিত্ব সপ্রমাণহল।

ভবনাথপত্নীরও বিশ্বাস অমিয়া কিছু খেয়েছে। তিনি একটা প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ভবনাথ বললেন, 'প্রায়শ্চিত্ত কোরো কাল সকালে, আজ রাত্রে আমি ও মেয়েকে বাড়িতে জায়গা দিচ্ছিনে, কে জানে কাল ঘুম থেকে উঠে ওঁর মুখ দেখব সব আগে!'

সোম অমিয়ার অবস্থা দেখে সীনিকের মতো হাসছিল। মনে মনে বলছিল, 'না খেয়ে এই। খেলে এর বেশি কী হত? বাড়ি যাব, বাড়ি যাব। কোনটা তোমার বাড়ি? ওটা না-এটা? ওঠো এখন এই বাড়িতে। কাল তোমাকে সত্যি সত্যি খাইয়ে আনব।'

ভবনাথবাবু বললেন, 'আসি তা হলে, কুণাল। ও মেয়েকে (কোনো) আর্যসন্তান গ্রহণ করবে না। দেখো যদি তোমাদের সংকর সমাজে ওকে পাত্রস্থ করতে পারো।'

সোম কুণালকে জিজ্ঞাসা করল, 'কায়স্থ আবার আর্য নাকি?'

কুণাল হেসে বলল, 'আমি তো জানতুম অর্ধেক মঙ্গল তিনি অর্ধেক কল্পনা।'

'কী!' ললিতা কৃত্রিম কোপ প্রকট করল।

'বলছিলুম অর্ধেক মঙ্গল তুমি অর্ধেক কল্পনা।'

ললিতা প্রশমিত হল কিন্তু ভবনাথবাবু হলেন না। 'জাত তুলে গালাগাল! তুমি বিলেত গিয়ে জাত দিয়ে এসেছ, লাঙ্গুলহীন শৃগাল, (তা বলে) আমি লাঙ্গুলহীনহব?'

সোম বলল, 'না, না, আপনি আপনার লাঙ্গুলটিকে ধুতি দিয়ে ঢেকে সযত্নে রক্ষা করবেন।'

'আসি কুণালবাবু, এ থাকল। দেখবেন।' বলে ভবনাথবাবু সত্যিই গা তুললেন। সেইসঙ্গে অমিয়াও। হঠাৎ একটা পতনের শব্দ হল। সকলে চেয়ে দেখল অমিয়া তার বাবার পায়ে মাথা খুঁড়ছে। তার মা তাকে তোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভবনাথ বলছিলেন, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

সোম খেপে গিয়ে বলল, 'I challenge you—I Challenge you—I challenge yon to prove যে উনি গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে কিছু মুখে দিয়েছেন?'

দ্বিজদাস একান্তে কুণালকে বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম রসা রোড।'

ভবনাথের ধারণা পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই রৌদ্ররসের অধিকারী! সোমকে রাগান্বিত দেখে তিনি ভাবলেন, তাই তো, এ তো সামান্য লোক নয়। তিনি তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, 'এ-এ-একই কথা। ঘা-ঘা-ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং।'

সোম যত না চটেছিল তার বেশি চটবার ভাণ করছিল। বলল, 'Damn your ঘ্রাণেন। আপনি কোনোদিন ভোজনের বদলে ঘ্রাণ করে স্কুলে গেছেন? You oldbully!'

ভবনাথবাবু পিছু হটতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন। ইংরেজি bully কথাটা তাঁর কানে গুলির মতো শোনাল। দ্বিজদাসও অবলার সাহস দেখে সাহস পেলেন, সোমের দুটো হাত পিছন থেকে চেপে ধরলেন।

কুণাল বলল, 'ছি, ছি, এ কী করছ কল্যাণ?'

ললিতা গিয়ে অমিয়াকে ধরাধরি করে তুলল।

সোম বলল, 'ও মেয়েকে রেখে যেতে চান রেখে যান। কিন্তু কাল খোঁজ করলে ওর পাত্তা পাবেন না। শেষকালে খবরের কাগজে Amiya, come back ছেপে পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে ভবনাথ বললেন, 'অ্যাঁ!'—তাঁর বদনের ব্যাদান তাঁর নয়নের বিস্ফারণের সঙ্গে ম্যাচ করল।

সোম তাঁর অনুকরণ করে বলল, 'হ্যাঁ।' তখন ভবনাথবাবু একহাতে অমিয়ার হাত ধরে অন্য হাতটা গিন্নির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি থেকে যেয়ো না। তোমার জন্যে (কাগজে) বিজ্ঞাপন দিতে (আমার) লজ্জা করবে।'

সোম ভেবেছিল আপদ চুকেছে, ভবনাথবাবুরা যেমন অপরিচিত ছিলেন তেমনি অপরিচিত হয়ে গেছেন। কিন্তু কই? পরদিন রবিবার, সোম ললিতাদের বেড়াতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে, বারংবার তাগিদ দিয়ে বলছে, 'ললিতা, দেশে এত বড়ো নারী জাগরণ ঘটল, তবু তোমাদের মেয়েলি কাপড় পরার সময় সংক্ষেপ হল না।'

হেনকালে মনুর আবির্ভাব।

সোম একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কী বন্ধু, কী মনে করে?'

মনুও একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমাকে যে আজ আসতে বলেছিলেন!'

'ওঃ ঠিক, ঠিক। বাড়ির ওঁরা আসতে দিলেন?'

'আমার আসা-যাওয়ার উপর কর্তৃত্ব করা,' মনু স্পর্ধাভরে বলল, 'বুঝলেন দাদা, শিবের আসাধ্য।'

'নাও নাও, সিগ্রেট নাও।...তারপর ওদিকের খবর কী?'

'খবর তো আপনিই ভালো জানেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলেন, আমাকে নিলেন না! আমাকে নিলে কি এত কথা উঠত?'

'যা বলেছ।' সোম মনে মনে বলল, তোমাকে নিলে কথা উঠত না বটে, কিন্তু কথাটাও উঠত না।

যাক, ওসব দুদিন বাদে থেমে যাবে। মনু মুরুব্বিয়ানা ফলিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'অমন হয়ে থাকে, সংসার করতে গেলে অমন একটু আধটু শুনতে হয়, সইতে হয়।' তারপর বলল, 'বড়ো পিসিমা বাবাকে সেই কথা বোঝাচ্ছিলেন আজ সারা সকাল।'

'বাবা বুঝলেন?'

'বোঝা তো উচিত। বিয়ে যখন ধরতে গেলে হবেই তখন দুদিন আগে বরের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ও হোটেলে খাওয়া খুব একটা গর্হিত কাজ নয়। অন্তত আমরা তরুণরা তো তাই বুঝি।'

'তরুণরা কী বোঝেন,' সোম প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বরে বলল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তরুণীরাও কি তাই বোঝেন?'

'তরুণীদের কথা যদি বলেন,' মনু মাতব্বরের মতো বলল, 'আমাদের যুব-সমিতিতে আমরাই তরুণী সেজে বসে আছি। জগদা বসু, জ্যোৎস্না দত্ত, সান্ত্বনা পাল এসব নাম আমাদেরই।'

'জগদা কেটে জগদম্বা করলেও তোমাকে আমার তরুণী বলে ভ্রম হবে না বন্ধু। অন্তত তোমার দিদি বলে। এখন বলো দেখি তোমার দিদি কী বুঝলেন?'

'দিদির একটা স্বতন্ত্র মন আছে নাকি? বাবা যা বুঝবেন ও তাই বুঝবে। যা করাবেন বাবা ও করবে তাই।'

'ধন্য ধন্য অমিয়া বসু। কিন্তু তুমি যে, বন্ধু আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দিলে দুদিন বাদে, তুমি তো ওঁর বাবা নও, তোমার নির্দেশ উনি মানবেন কেন?'

মনু বিস্মিত হল। বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু।

সোম বলল, 'অর্থাৎ তোমার বাবা যে দুদিন বাদে আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবেন এ তুমি কার কাছে জানতে পেলে?'

'দেখবেন আমার কথা ফলে কি-না।' মনু বলল সাহংকারে।

'আহা!' সোম বলল, 'তুমি যত বড়ো জ্যোতিষী হও না-কেন, এই সোজা জিনিসটা তো বোঝো যে আমার মতো একটা চরিত্রহীন যুবককে তোমার দিদি স্বেচ্ছায় বিয়ে করবেন না? এবং এটা তো বিশ্বাস করতে পারো যে আমিও অনিচ্ছুককে বিয়ে করতেঅনিচ্ছুক?'

মনু হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সোমকে নিরীক্ষণ করল।

'কী নিরীক্ষণ করছ?' সোম বলল, চরিত্রহীন কি-না তা কি চেহারায় লেখা আছে? তুমি কি জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিকও জানো?'

'যাঃ!' মনু উড়িয়ে দিল সোমের কথা। 'যাঃ! আপনি কখনো চরিত্রহীন হতে পারেন?'

'ধরো যদি হয়ে থাকি?'

'তবে,' মনু গম্ভীর হয়ে গেল। 'তবে অবশ্য বিয়ে হতে পারে না!'

'পারে না তো?' সোম বলল, 'আমিও তাই বলি। তাই আমার সিদ্ধান্ত। এখন তুমি যেমন করে পারো প্রসঙ্গটা তোমার দিদির কাছে পাড়লে ওঁকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়। কে জানে হয়তো তিনি আমাকে যেমনটি পাচ্ছেন তেমনটি নিতে ইচ্ছুক হবেন। আর তিনি যদি ইচ্ছুক হন তবে আমি তাঁকে আবার একদিন লুট করে নিয়ে সোজাসুজি বিয়ে করে ফেলব। তারুণ্যের প্রথম সূত্র হচ্ছে গুরুজনকে—middle man-কে—eliminate করা।'

মনুর তখন মাথা ঘুরছিল। সে প্রথমে ঠাওরেছিল ওটা ঠাট্টা, তারপর ওটা একটা কল্পিত সমস্যা। ওটা—ওই চরিত্রহীনতা—যে সত্য তা কি মনু বিশ্বাস করতে চেয়েছিল? কিন্তু সত্য ওটা। বড়ো কুৎসিত সত্য।

দিদির কাছে ওই কুৎসিত প্রসঙ্গ পাড়বে কেন সে? সে সবেগে মাথা নেড়ে বলল। 'না, না, না, না, না।' সোম যে লুট করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে, শেষের এ কথা তার কানে ঢুকল না। সে গোড়ার কথাটা নিয়ে মাথা নেড়ে বলতে থাকল, 'না, না, না, না, না।'

সোম বুঝল উলটো। বলল, 'আচ্ছা, না-হয় লুট করব না। প্রাজাপত্য বিবাহ যদি সম্ভব হয় তবে রাক্ষস বিবাহ কে চায়? কিন্তু গোড়ার কথাটা জরুরি। দিদিকে বলাচাই-ই।'

মনু বলল, 'না।'

'কী? বলা উচিত নয়?'

'উচিত বই কী।'

'তবে?'

'আমি বলতে পারব না।'

সোম চুপ করে থাকল। তারপর ললিতাকে ডাক দিয়ে বলল, 'তোমার কিন্তু বড্ড দেরি হচ্ছে। কুণালটার হল কী? লুকিয়ে কবিতা লিখছে না-তো?'

ললিতা নেমে বলল, 'কই? কোথায় তিনি?'

খোকা ডাকল, 'বাবা?'

সোম ডাকল, 'ওহে!'

বোঝা গেল কুণাল তখন কোন ঘরে।

বলবে না বলে গেল মনু, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার প্রথম কাজ হল মা-র কাছে হাজিরা দেওয়া। মা-কে বলল, 'কাল তো তুমি আমাকে খুব বকে দিলে আগে তোমাকেও-কথা জানাইনি বলে। আজ কী জেনে এসেছি শুনবে?'

মা শুনে জিভ কাটলেন। তাঁর ধারণা ছিল কল্যাণ ছেলেটা একটু বেশি রকমের সাহেব, কাল তাঁর মেয়ের সঙ্গে সাহেবি ব্যবহার করেছে, হোক না-কেন তা অসামাজিক। আজ তিনি নিঃসন্দেহ বুঝলেন যে সাহেব নয় লম্পট। তার উদ্দেশ্য ছিল অমিয়ার ধর্ম নাশ করা।

যেই একথা মনে আসা অমনি সুর করে কেঁদে ওঠা।

কাল মেয়ের গান শুনতে যে সকল লোক জড়ো হয়েছিল আজ মায়ের কান্না শুনতেও সেই সকল লোক এল। ওরা শুধায়, 'কী হয়েছে, টুলীর মা?'

টুলীর মা বলেন, 'ওগো আমার কী হবে গো! ওরে আমার টুলী রে!' কাঁদতে কাঁদতে আছাড় খেয়ে পড়েন। তাঁর দুঃখ দেখে সকলের চোখে জল। ছোটো ছোটো মেয়েরা বলে, 'কেঁদ না মা, কেঁদ না।' অথচ তারা নিজেরাই কেঁদে আকুল।

যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এ পর্যন্ত টুলী ছাড়া অন্য কেউ চোখের জল ফেলেনি, টুলীর মা-ও বড়োজোর গম্ভীর হয়ে রয়েছিলেন। হঠাৎ এই অট্টকান্নার অর্থ কী! কেউ কাউকে এর উত্তর দিতে পারে না। সকলে ভাবে টুলীর মা বড়ো চাপা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু শেষপর্যন্ত সামলাতে পারলেন না। আশ্রিতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'টুলীর মা-র মতো দুঃখিনী ক-জন আছে? আমরা তো দেখিনি বা শুনিনি।' আত্মীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলেন, 'কেঁদে কী হবে, টুলীর মা, (বা দিদি, বা মাসিমা, বা কাকিমা) ভালোয় ভালোয় বিয়েটা তো হয়ে যাক।'

টুলীর মা প্রবোধ মানেন না। 'ওগো আমার দুঃখের অবধি নেই গো! আমার টুলী রে!'—কাঁদতে কাঁদতে বিষম খান।

সবাই যখন তাঁর কান্নার জ্বালায় উক্ত্যক্ত তখন ভবনাথ ও দ্বিজদাস প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিয়ে ফিরলেন। দুই ভাইয়ে আগের মতো সৌহার্দ্য। কাল সোমের হাত চেপে ধরে দ্বিজদাস ভবনাথের প্রাণ না-হোক মান রক্ষা

করেছেন। লক্ষ্মণ সমান ভাই।
'কী হয়েছে, টুলীর মা? কী হয়েছে!'
টুলীর মা এতক্ষণ কথাটা বহু কষ্টে চেপে রেখেছিলেন সব আগে স্বামীকে শোনাবেন বলে। আধখানা ভেঙে বলেন, 'শুধু খাওয়া নয় গো!'
'কী বলছ?'
'ওগো শুধু খাওয়া নয় গো!'
ভবনাথ দ্বিজদাসের দিকে তাকালেন। 'ভূতে পেয়েছে নাকি? ওঝা ডাকানো দরকার মনে করো?'
'ওগো শুধু খাওয়া নয়। ওটা সাহেবি কাপড় পরা গুণ্ডা গো! আমার কী হবে!'
(তারপরে সহজ স্বরে)
'কলকাতায় তো বেশ শান্তিতে ছিলুম। কিন্তু—'
(আবার রোরুদ্যমানভাবে)
'টেগার্ট সাহেব চলে গিয়ে কত রাজ্যের গুণ্ডা যে এসেছে, আর কলকাতায় তিষ্ঠনো যায় না, তুমি এখান থেকে চলো।'
ভবনাথ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'টেগার্ট সাহেব বিলেত চলে গেছেন (বলে) আমিও বিলেত চলে যাব। বলে কী হে দ্বিজু!'
'বউদি,' দ্বিজদাস দোভাষীর কাজ করলেন, 'দাদাকে কোথায় চলে যেতে বলছ? ভেঙে বলো।'
'কাশী গো কাশী। তোরা সব যা এখান থেকে। যা তোরা।'
দ্বিজদাস তাদের খেদিয়ে নিয়ে গেলেন। তবু দুটো একটা লেপটে থাকল।
'ওগো শুধু খাওয়া নয়। নাতি হবে।'
ভবনাথ লম্ফ দিয়ে বললেন, 'কী!'
দ্বিজদাস কম্পমানভাবে বললেন, 'ক ক কী!'
ভবনাথ দাপাদাপি করে বেড়ালেন। হাঁকতে লাগলেন, 'আমার বন্দুক। আমার বন্দুক। আমার বন্দুক।'
তাঁর গৃহিণী সহসা প্রকৃতিস্থ হয়ে দ্বিজদাসকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী, ঠাকুরপো? টুলীকে সরাও। নইলে তারই উপর গুলি চলবে।'
টুলীর উপর গুলি। একথা ভাবতেই দ্বিজদাস আঁতকে উঠলেন। দাদার সম্মুখীন হয়ে বললেন, 'দাদা, লুঠি তো ভান্ডার, মারি তো গণ্ডার। আসুন গুণ্ডা মারতে যাই।'
দাদা বললেন, 'কিন্তু বন্দুক?'
'না, না, বন্দুক ঘাড়ে করে বেরোলে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি মারবেন কিল আমি মারব লাথি, তা হলেই মরে যাবে।'
'উহুঁ। আমি (মারব) লাথি, তুমি (মারবে) কিল।'
'বেশ, তাই হবে।'
দু-ভাই ট্রামে চড়ে খুন করতে চললেন। ট্রামের অন্যান্য আরোহীরা কেমন করে জানবে যে এরা দু-জন হবু খুনে ও গবু খুনে। হায়! এমন কত খুনে যে নিরীহ ভদ্রলোকের বেশে নিরীহ ভদ্রলোকের পাশে বসে কার্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করতে করতে কার্যস্থলে যায়।
কিন্তু খুনের কাছ থেকেও ট্রাম কোম্পানি টিকিটের পয়সা চায়। এঁদের অতটা খেয়াল ছিল না। হড় হড় করে নামিয়ে দিল।
শুভকর্মের মতো অশুভকর্মেও বহু বিঘ্ন। পায়ে হেঁটে যাওয়ার বাধ্যতায় ভবনাথবাবুর উৎসাহ মন্দীভূত হল। অতখানি হাঁটলে লাথির জোর থাকবে না। দ্বিজদাসটা মনের সুখে কিলোবে, চড়াবে, গুঁতোবে,

চিমটাবে, আর তিনি মারবেন মাত্র গোটাকয়েক দুর্বল লাথি। 'না,' তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমি (মারব) কিল-চড়, তুই (মারিস) লাথি।'

দ্বিজদাস কার্যকারণ বিনির্ণয় না-করতে পেরে আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

কুণালের বাড়িতে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন পাখি উড়ে গেছে। বাড়ি খালি।

ভবনাথ বললেন, 'এখন কী করা যায়, দ্বিজু।'

দ্বিজদাস বললেন, 'তাই তো।'

ভবনাথ বললেন 'পার্কে (গিয়ে) একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।'

ভবনাথ বললেন 'সেটা ভালো।'

অশুভকর্মেও এত বিঘ্ন। অশুভকর্মের সংকল্প আর টেঁকে কই? ভবনাথ এতক্ষণ চিন্তার অবকাশ পেলেন। তখন দ্বিজদাস ভয়ে ভয়ে বললেন, 'দাদা, ভেবে কি দেখেছেন?'

'কী?'

'আপনার ও আমার ফাঁসি কি দ্বীপান্তর হলে আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কী দশা হবে?'

ভবনাথ বললেন, 'হুঁ।'

'আমি বলি,' দ্বিজদাস ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করলেন, 'আগে একবার বিয়ের জন্যে শাসানো যাক। তাতে যদি ফল না-হয়—'

'তাহলে?'

'তা হলে গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে হবে।'

'ঠিক বলেছ। কণ্টকেনৈব কণ্টকং। গুন্ডার পিছনে গুণ্ডা।'

বিশ্রাম করে দুই ভাই আবার কুণালের ওখানে চললেন। এবার দেখলেন আলো জ্বলছে।

'দেখ, তুমি যদি ও মেয়েকে বিয়ে না করো—' দ্বিজদাসের সোমকে 'আপনি' বলতেও অভিরুচি হল না।

'বিয়েই তো করতে চাই।' সোম বলল।

'তবে?' দ্বিজদাস আনন্দের আবেগে বুঝি মারা যান।

'তবে তার আগে জানতে চাই তিনি আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক কি না।'

'এক-শো বার ইচ্ছুক।' দ্বিজদাস হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

'আমি চরিত্রহীন একথা তিনি শুনেছেন?'

'শুনতে হবে না। জেনেছেন।'

'তার মানে?'

'তার মানে তোমার কাজের দ্বারাই তোমার পরিচয়, ওহে ন্যাকারাম।'

ভবনাথ জুড়ে দিলেন, 'ওহে নারকী।'

সোম বলল, 'আপনারা এ সমস্ত কী সাজেস্ট করছেন?'

দ্বিজদাস বিশ্রী হেসে একটা অশ্লীল উক্তি করলেন। তা শুনে সোম তো হতবাক। ভবনাথ লজ্জিত বোধ করল। ভাগ্যক্রমে ললিতা ওখানে ছিল না। কুণাল পলায়ন করল।

দ্বিজদাস তাগাদা দিলেন। বললেন, 'কি হে সুন্দর, বিদ্যাকে এখন তুমি ছাড়া আর কে বিয়ে করবে? বিদ্যা রাজি না-হয়ে পারে?'

সোম বলল, 'কী করে আপনারা জানলেন? বলেছেন তিনি ওকথা?'

'বলতে হয় না, বলতে হয় না। 'Men may lie, but circumstances cannot' আমি যে সেদিন জুরর হয়ে স্বকর্ণে শুনে এসেছি।'

এর উত্তরে কী বলতে পারে? সোম চুপ করে রইল।

দ্বিজদাস পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'বলো ও মেয়েকে বিয়ে করবে কি না।'

'যদি তিনি নিজমুখে বলেন ও আমি নিজের কানে শুনি যে আমার চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তবেই আমি তাঁকে বিবাহ করব, নতুবানয়।'

সোমের এই উক্তির পর দ্বিজদাস ও ভবনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়িকরলেন। ভবনাথ বললেন, 'আচ্ছা।'

তখন দ্বিজদাসও বললেন, 'আচ্ছা।'

তাঁরা সোমকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। ডাকা হল অমিয়াকে। সে কেঁদে কেঁদে চোখের এক ফোঁটা জল অবশিষ্ট রাখেনি, কলঙ্কের ওপর কলঙ্ক তাকে অসাড় করে তুলেছে। প্রিয়তম পিতামাতার কাছ থেকে বারংবার অপমান ও অবিচার পেয়ে পেয়ে তার মনটা হয়ে উঠেছে কঠিন। তার রোখ চেপেছে সে বিয়ে করবে না।

সোম বলল, 'অমিয়া দেবী, আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল নিভৃতে। এখানে সুযোগ না-পাওয়ায় যেখানে সুযোগের অন্বেষণে আপনাকে নিয়ে গেলুম সেখানে আপনি স্থির থাকলেন না। আজ যেমন করে হোক আমার সেই কথাটা আপনার কানে পড়েছে। এখন যদি আপনি আমাকে বিয়ে করতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে আমি আপনাকে সাধ্যানুসারে সুখী করবার দায়িত্ব নেব।'

অমিয়া বলল, 'না।'

তা শুনে ভবনাথ চমকে উঠে ধমকে দিলেন। 'না কী! হাঁ বল।'

দ্বিজদাস প্রতিধ্বনি করলেন, 'হাঁ বল।'

অমিয়া তবু বলল, 'না।'

ভবনাথ হুকুম করলেন, 'বেতখানা নিয়ে আয় তো রে।' দ্বিজদাস ইশারা করলেন। বেত এল।

ভবনাথ বেত নাচিয়ে বললেন, 'বল হাঁ।'

অমিয়া বলল, 'না।'

ভবনাথ বেত লাগাবেন এমন সময় সোম সেটা কেড়ে নিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

ভবনাথও বিনাবাক্যব্যয়ে সোমের পিঠে একটি ভাদ্র মাসের পাকা তাল স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজদাস তার পাছাকে ভুল করলেন ফুটবল বলে।

সোম নীরবে সইল।

ভবনাথ অমিয়াকে বললেন, 'দেখলি তো? যতবার (তুই) 'না' বলবি (ততবার) এর পিঠে তাল পড়বে।'

'আর এর পাছা হবে ফুটবল।'

অমিয়া বলল, 'না।'

ভবনাথ ও দ্বিজদাস কথা রাখলেন। সোম এবারেও প্রতিবাদ করল না।

ভবনাথ ও দ্বিজদাস বললেন, 'আবার?'

অমিয়া বলল, 'না।'

ভবনাথ ও দ্বিজদাস এই নিয়ে সোমকে বার বার তিনবার মারলেন। সোম বেশি কিছু করল না। দ্বিজদাসের টাকের উপর বসাল একটি কিল, তিনি বসে পড়লেন। আর ভবনাথের দাঁতের উপর দিল একটু ঘুঁসি। তিনি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

উভয়ের গৃহিণী ও সন্তানাদি এক পাল ভেড়ার মতো একসঙ্গে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল। সোম দেখল আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অমিয়াকে বলল, 'আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছে। ভরসা করি আপনার এই দৃঢ়তা আপনাকে বিপন্মুক্ত করবে। বিদায়।'

৫
প্রতিমা

ক্রমওয়েল রোডে সোম কদাচ যেত, কিন্তু যখনি যেত দেখত অত্যন্ত বেশিরকম সাহেব, অতীব নির্লজ্জ, একটি ছেলে অম্লানমুখে স্বদেশনিন্দা করছে। এই ভারতবর্ষীয় পুরুষ মিস মেয়োটির সঙ্গে কথা বলতে বা তর্ক করতে সোমের প্রবৃত্তি হত না, তবু কৌতূহলাপন্ন সোম তার নামটি জেনে রেখেছিল। বীরেন দত্ত।

এই মহাপ্রভুর সঙ্গে পরে যে ভারতবর্ষের কালোমাটিতে কোনো দিন সাক্ষাৎ হবে সোম তা কল্পনা করেনি। ইনি কেমন করে সোমের ঠিকানা পেলেন বলা যায় না, কিন্তু একদিন সকাল বেলা কুণালকে অকালে জাগিয়ে তুললেন ও পাছে সে ইংরেজি না বোঝে এইজন্যে তাকে হিন্দিতে সমঝিয়ে দিলেন যে সোম তাঁর আদ্যিকালের বন্ধু এবং সোমকে তিনি নিতে এসেছেন। বাড়ির মালিক যে কে তা তিনি জানতেও চাইলেন না, বাড়ির মালিকের অনুমতি চাওয়া তো দূরের কথা। সোজা হুকুম করলেন 'ড্রাইভার, টুম যাকে সাবকা সব চিজ লে আও।'

কে একটা লোক তার শোবার ঘরে ঢুকে তার সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে টানাটানি করছে দেখে সোমের চক্ষুঃস্থির। লোকটা একটা সেলাম ঠুকে বলল হিন্দিতে—'হুজুরের এই ক-টা জিনিস না আরও আছে?'

যাক, চোর নয়। কিন্তু কে তাও বোঝা যায় না। সোম বাইরে গিয়ে কুণালের খোঁজ করল। শুনতে পেল সে নিজের শোবার ঘরে ললিতাকে বলছে, 'কল্যাণের বড়োলোক বন্ধু বি আর ডাট, বার-অ্যাট-ল, তাকে নিতে এসেছেন। সেই ভালো। আমাদের মতো লোকের দ্বারা তার তেমন আদর আপ্যায়ন হচ্ছে না, হতে পারে না।' ললিতা বলছে, 'তুমি তাহলে যাও, কল্যাণকে জাগাও। ব্যারিস্টার সাহেবকে বসতে বলেছ তো?' কুণাল বলছে, 'তিনি তাঁর মোটরগাড়িতেই বসা পছন্দ করলেন।'

সোম তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে ভাবল, কে এই বি আর ডাট? কবে ইনি আমার এমন প্রবল প্রতাপ বন্ধু হলেন? কুণাল-ললিতাকে এখন কী বলে খুশি করা যায়?

এমন সময় কুণাল ডাকল, 'কল্যাণ। ও কল্যাণ।'

'ভিতরে এসো।'

'মিস্টার বি আর ডাট, বার-অ্যাট-ল তোমাকে নিতে এসেছেন। শিগগির তৈরি হয়ে নাও। সায়েব গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন।'

'কে এই ভদ্রলোক? তোমার কোনো মুরুব্বি বুঝি?'

'সে কি হে! তোমার অত বড়ো বন্ধু, তাঁর লোক এসে তোমার জিনিসপত্র নামাচ্ছে দেখতে পেলুম,।'

'তুমি তো ভারি সরলবিশ্বাসী হে! ভদ্রলোক যদি ছদ্মবেশী বাটপাড় হয়ে থাকেন? আমার জিনিসগুলো হয়তো ইতিমধ্যে মোটরস্থ করে সরে পড়েছেন।'

'অ্যা! তোমার বন্ধু নেই ও নামের?'

'কই? মনে তো পড়ছে না? অন্তত আমি তো তাঁকে খবর দিইনি যে আমি কলকাতা এসেছি ও এ বাড়িতে উঠেছি।'

কুণাল ছোট্ট মানুষটি। ঠুক ঠুক করে ছুটল। সোমও তৈরি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে কুণাল ফিরে এল। এক গাল হেসে বলল, 'না, ভাগবেন কেন? দিব্যি পাইপ টানতে টানতে কী একটা বিলিতি সুর গুনগুন করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'সোম সাবকো সেলাম দো।' 'ভেবেছেন আমি বাড়ির চাকর।'

সোম চটে বলল, 'এত বড়ো আস্পর্ধা! তুমি তাকে দু-কথা শুনিয়ে দিলে না-কেন?'

'চাকর বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। বুঝলে হে? ওঁরা ইঙ্গবঙ্গ মানুষ, ওঁদের চাকরদের উর্দির বাহার আমার এই ছেঁড়া পাঞ্জাবির চেয়ে—বুঝলে হে! আর আমার এই বেমেরামত চটি। হাঁ করে ধুলো গিলে খায়!'

সোম তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখল চেনা চেনা ঠেকছে। কিন্তু কোথায় কবে চেনা তা মনে পড়ছে না।

'Hello, সোম! We meet after an age in a strange land, don't we?'

সোম মনে মনে বলল, তুমি কে বট হে।

'Well', মহাপ্রভু বললেন, 'for the life of me I can't conceive of a filthier human habitat than North Calcutta. Ugh!'

তখন সোমের স্মরণ হল ইনি সেই পুরুষ মিস মেয়ো, ক্রমওয়েল রোডের বীরেন দত্ত। বালিকাবিবাহের এত বড়ো পুংশক্র কলিতে অবতীর্ণ হননি। চোদ্দো বছর বয়সের দুধের মেয়ের কাছে কী করে যে মানুষ একটু প্রেম বা একটু সাহচর্য আশা করতে পারে তা ইনি for the life of me বুঝতে পারতেন না। একেবারে পাশব না-হলে কেউ অমন মেয়ে বিয়ে করতে পারে? এঁর মতে মেয়ের বয়স পঁচিশ না-হলে তার বিয়ে বেআইনি হওয়া উচিত।

ইংরেজিতে বললেন, 'তুমি এ পাড়ায় থাকলে আমাদের শুদ্ধ মান যায়। মা ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি নিজেই চলে এলুম তোমাকে নিতে। For goodness' sake আর দেরি কোরো না। Ugh!' এই বলে তিনি বাঁহাতের আস্তিন থেকে রুমাল বের করে নাকে দিলেন।

পরের ছেলের জন্যে কোনো মা-র এতখানি উৎকণ্ঠা পুরাণে অথবা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। সোম এর মধ্যে একটা নতুন রোমান্সের ইঙ্গিত পেল। বলল, 'তাহলে অবশ্য দেরি করা উচিত নয়। দাঁড়াবে এক মিনিট?'

ললিতাকে বলল, 'বোধ হয় ওর বোন টোন কেউ আছে, তাই। তোমরা কিছু মনে কোরো না, ললিতা। আমি পুনর্মূষিক হয়ে দিন দু-তিনের মধ্যে ফিরব।'

ললিতা বলল, 'প্রার্থনা করি যেন তোমাকে ফিরতে না-হয়। অনেক কান্ড করেছ, আর কেন? এবার ওই ভীষ্মের পণটি ভেঙে ভালোমানুষের মতো বিয়ে করো।'

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমি যেখানে যাই সেখানে রোমাঞ্চ ঘটাই।' জীবনটাতে একটু নুন মাখিয়ে না-দিলে ওই আলুনি তরকারিটা কার মুখে রোচে? জগতের boredom লাঘব করতে আমার জন্ম।'

'যাক, তুমি এ বাড়ি থেকে গিয়ে আমাদের নির্ভাবনা করলে। ভবনাথবাবু ও দ্বিজদাসবাবু আজ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবেন ভেবে কাল রাত্রে আমাদের ভালো ঘুম হয়নি কল্যাণদা।'

'আমার ক্ষমতার উপর তোমাদের তেমন আস্থা নেই দেখছি। ভবনাথ ও দ্বিজদাস আজ এলে তাঁদের ঠ্যাঙানোর জন্যে আমি যে বৃহৎ লাঠিগাছটি কিনে এনেছি সেটি তাঁদের হাতে উপহার দিয়ে বোলো, পিঠে উপহার দেওয়ার সুযোগ হল না। যেন কিছু না মনে করেন।'

পথে যেতে যেতে বীরেন দত্ত বলল, 'বন্ধুতা হয় সমানে সমানে। ওঁদের দেখে দেশি সাহেব বলেও তো বোধ হল না?'

'তবু ওঁরা আমার মতো বেকার নন।' বলল সোম। 'বেকার-s must not be choosers.'

'হা-হাআআ।' ডাট বিলিতি ধরনে হাসল। 'যা বলেছ। তোমার কথাগুলো এমন রসিকতাপূর্ণ।'

'কাজগুলোও তেমনি।'

'কিন্তু আমিও একরকম বেকার। তা বলে উত্তর কলকাতা! Ugh!'

'তুমি দেখছি মরলেও নিমতলা ঘাটে আসবে না।'

'ওকথা ভাবিনি,' ডাট গম্ভীরভাবে বলল, 'কিন্তু ভাবনার বিষয় বটে।'

মিসেস ডাটা এসে সোমকে অভ্যর্থনা করে ড্রইং রুমে বসালেন। ছেলের মতো তিনি দেশদ্বেষী নন। অন্তত একুশটা বুদ্ধমূর্তি ওই একটি ঘরে ধ্যানস্থ। দাম যে অনেক দিয়েছেন তার সন্দেহ নেই। তবে তাদের মধ্যে কোনটি আসল কোনটি নকল তার বিচার করেননি।

যদিও সোমের দৃষ্টি বুদ্ধিমূর্তির অন্তরালে কার অন্বেষণরত তবু মিসেস ডাট মনে করলেন সে দৃষ্টি বুদ্ধমূর্তির প্রতি প্রশংসমান।

বললেন, 'বুডঢা দেখছেন?'

চমকে উঠে সোম বলল, 'হাঁ।' তারপর উচ্চারণটাতে অস্পষ্টতা এনে বলল, 'বৃদ্ধা দেখছি।'

'ভালো বুডঢা?'

'শুধু বৃদ্ধা।'

ওই প্রশ্নের এই উত্তর মিসেস ডাটের বোধগম্য হল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জিনিসপত্র সঙ্গে করে এনেছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই তো ভালো ছেলের মতো। আমরা তোমার ধরতে গেলে আপনার লোক—আমাদের বাড়ি থাকতে অন্যত্র উঠবে কেন?'

'ঠিক।'

'তোমার কথা আমি বীরেনের কাছে অনেক শুনেছি। এতদিন পরে তোমাকে দেখে তাই তেমন নতুন ঠেকছে না, যেন চেনা মানুষের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হল। না? তোমার কী মনে হয়?'

'আমারও অবিকল তাই মনে হচ্ছে।'

'তুমি নাকি ওদেশে খুব খ্যাঁকশিয়াল শিকার করতে?'

'আজ্ঞে, তা তো করতুমই।'

'আর তোমার নাকি তিনটে কুকুর ছিল?'

'ছিল—টম, ডিক ও হ্যারি।'

'তুমি নাকি একবার বলেছিলে যে তুমি বন্যবরাহের মাংস খেতে ভালোবাসো?'

'ভালোবাসি বই কী?'

'আর হকি খেলতে খেলতে তোমার নাকি পা ভেঙেছিল?'

'সে হাড় এখনও জোড়া লাগল না!'

এমনি করে মিসেস ডাট যত উদ্ভট প্রশ্ন করেন মুখে মুখে বানিয়ে সোমও তার প্রত্যেকটির উত্তর দেয় প্রত্যুৎপন্নমতির সহিত। উত্তর দেয় আর আড় চোখে দরজাগুলোর দিকে তাকায়। এ বাড়িতে কি তরুণী নেই? নিরস্তপাদপ দেশ থাকতে পারে, কিন্তু তরুণী-বর্জিত ইঙ্গবঙ্গ পরিবার আছে নাকি? কোথায় তুমি রমলা, না বেলা, না ভায়োলেট, না প্যানসি, না লীনা, না মিনা, না রিনা। দেখা দাও, দেখা দাও। অয়ি সেকণ্ডহ্যাণ্ড ইংরাজ ললনা, এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মে-ফেয়ারে এসেছি তোমারই দেখা পেতে।

বীরেন দত্ত উত্তর কলকাতা থেকে ফিরে বাথ নিতে গেছল। প্রবেশ করে বলল, 'Do you know, Mummy, how awful the stench was।'

মা বললেন, 'I know, I know, wasn't it awful?'

সোম উশখুশ করছিল! তার মনে হচ্ছিল তারও আর একবার স্নান করা উচিত, নইলে এঁরা তাকে ধাঙড়ের মতো অশুচি জেনে অস্বস্তি বোধ করবেন। যেন সে নর্দমা থেকে এসে ড্রইং রুমে বসেছে।

ইংরেজিতে মাতাপুত্রে যেসব কথা হল তাতে সোমের মনোযোগ ছিল না। সে ক্রমে ক্রমে নিজের গায়ের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। যেন সত্যিই তার গায়ে নর্দমার গন্ধ; এত দিন তার গন্ধবোধ সক্রিয় ছিল না বলে টের পায়নি, এখন দূরে এসে সুদে-আসলে টের পেয়েছে। লণ্ডনের East End থেকে West End-এ —Bow থেকে Mayfair-এ—এলে যেমন সভ্য জগতে ফিরেছি ভেবে হর্ষ হয় এবং সেই সঙ্গে সভ্যমানুষের সমাজে নিজেকে অসভ্য ভেবে লজ্জা করে, এও কতকটা তেমনি।

সোম চাইল স্নান করতে।

মিসেস ডাট বললেন, ‘কিন্তু বেশি দেরি কোরো না, কী তোমার খ্রিশ্চান নাম?’

‘কল্যাণ।’

‘বেশি দেরি কোরো না, কলিন। এখনি ব্রেকফাস্ট দেবে। বীরেনের আবার কোর্টে যেতে হবে কিনা।’

বীরেন বলল, ‘সোম, তুমি কেমন করে সময় হত্যা করবে?’

সোম নিরাশার সহিত বলল, ‘ঘুমিয়ে।’

মা বললেন, ‘না না, তা কেন? আমরা যাব দোকানে, কলিন যাবে আমাদের সঙ্গে। কোনো আপত্তি আছে?’

সোম ‘আমরা’ কথাটা শুনে উৎফুল্ল হয়ে বলল, ‘কিছুমাত্র না।’

বীরেন পাইপ মুখে বলল, ‘Lucky fellow, খাটুনি যে কাকে বলে তা তুমি জানলে না।’

সোম বলল, ‘অর্থাৎ বার লাইব্রেরিতে বসে আড্ডা দেওয়া যে কাকে বলে তা আমি জানলুম না।’

‘Well! আমার মতো বাচ্চা ব্যারিস্টারের ও ছাড়া আর কী করবার আছে? বুড়োরা যতদিন না-মরছে আমরা ততদিন ব্রিফহীন থাকতে বাধ্য।’

‘অন্যের মোকদ্দমার শুনানির সময় উপস্থিত থাকলে তো হয়।’

‘Terribly boring! বিশ্রী একঘেয়ে। বড়ো বড়ো ব্যারিস্টারেরা আড্ডা দিয়েই বড়ো হয়েছেন, যেমন ভালো ভালো ছাত্রেরা না-পড়েই ফার্স্ট হয়।’

ঢং ঢং করে ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা বাজল।

টেবিলে সোমের ডান দিকে যিনি বসলেন মিসেস ডাট তাঁর পরিচয় দিলেন, ‘আমার ছোটো মেয়ে প্রতিমা, এই বছর সোসাইটিতে বেরিয়েছে।’

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর প্রতিমা বললেন, ‘I'm so sorry I couldn't meet you when you came along.’

প্রতিমার মা এর উপর টিপ্পনী কাটলেন, ‘Baby had such a beastly headache.’

প্রতিমাকে দেখে সোমের মনে যে বিপুল আশার উদ্রেক হয়েছিল তার বেবির মাথাব্যথার সংবাদে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হল। এ মেয়ে তাহলে বিবাহিতা।

কিন্তু দুই এক কথার পর জানা গেল এই বিশ-একুশ বছর বয়সের মেয়ের নিজেরই ডাকনাম বেবি। বাঁচা গেল।

সোম বেবির মাথাব্যথায় একান্ত ভাবনার ভাব দেখিয়ে সমবেদনা জানালে বেবি ইংরেজিতে বললেন, ‘সেরে গেছে।’

যাক, আবার বাঁচা গেল।

প্রতিমাকে বিধাতা সুন্দরী করে গড়েছিলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল এ মেয়ে সুন্দরীই থাকে। কিন্তু পড়েছে শক্ত হাতে। স্মার্ট হওয়ার শিক্ষা পেয়ে স্মার্ট হওয়াকেই মোক্ষ জ্ঞান করেছে। যে হতে পারত সুকেশী তার কেশ তৎকালীন ফ্যাশন মেনে খর্ব হল ল্যাজকাটা কুকুরের মতো, তারপর ফ্যাশন বদলে যাওয়ায় ধীরে ধীরে বাড়ছে, মুরগির ছানার রোঁয়ার মতো। বাঙালির মেয়ের পক্ষে যে যারপরনাই ফর্সা তাকে নিষ্ঠার সহিত পাউডার মাখতেই হবে এবং ঘামে যদি তার খানিকটা ভেসে যায় তবে সঙের মতো দেখাতেই হবে। মেয়েটি রোগা। তার বুকের হাড়গুলো ফুটে বেরোচ্ছে। সেই দৃশ্য উদঘাটন না করলেই নয়। তাই ব্লাউজ হয়েছে বেহায়া।

আর কিবা ইংরাজি! অনর্গল বলতে পারে বটে, কিন্তু অর্গল থাকলে হয়তো বিশুদ্ধি থাকত। ‘Fell inside the water!’

কিন্তু তার কী দোষ! যেমন শিক্ষা তেমনি সংসর্গ। সোমের হাতে পড়লে দুদিনে ঠিক হয়ে যেত। সোম তাকে শাসাত না, শেখাত না, শুধু হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিত তার ভুল ইংরেজি, তার স্মার্ট আচরণ,

তার নকলনবিশি। উপহাসই এই রোগের একমাত্র দাওয়াই। শুধু এই রোগের কেন সব রোগের। সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সোম লক্ষ করে এল পরমহংসদেবের প্রতিকৃতিকে মহাসমারোহে খাওয়ানো-শোওয়ানো হচ্ছে। যে মানুষ জীবনে কোনোদিন ঐশ্বর্যের-আরামের ভোগবিলাসের ছায়া দেখলেন না তিনি কায়াহীন হয়ে হঠাৎ বড়োলোক হয়েছেন, শোন মেঝের উপর মাদুর পেতে নয়, পালঙ্কের উপর ধবধবে তুলতুলে বিছানায়, খান যেদিন যা জোটে তা নয়, কিন্তু যাক সে কথা। সোম সেদিন একবার অট্টহাস্য করে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া উড়িয়ে দিল।

তেমনি হাসি হাসতে হবে প্রতিমাকে যদি পত্নীরূপে লাভ করে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা না-করে সোম আজকেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে হেসে ফেলল অন্যমনস্কভাবে। তার ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনি একটা হাসির কথা উঠেছিল। মিসেস ডাট আশা করেছিলেন যে সকলেই তাঁর কথায় হেসে সায় দেবে। কাজেই সোম ধরা পড়ে গেল না। মিসেস ডাট ভাবলেন ছেলেটার রসবোধ আছে। নইলে কেউ তো তাঁর হাসির কথায় এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না।

'জানো, মা,' বীরেন বলল, 'সোম কত বড়ো একজন হাস্যরসিক?'

'হাঁ, আমার মনে আছে। (সোমকে) তুমি নাকি Punch-এ লেখা দিতে?'

'এবং সে-লেখা ছাপাও হতো।'

'কই,' প্রতিমা বলল, 'নাম পড়েছি বলে তো স্মরণ হয় না?'

'সেটা আপনার স্মরণের দোষ নয়। লেখাগুলো বেনামি।'

'Wasn't that cute?' প্রতিমা বলল।

'হাস্যরসিকের বন্ধু হয়ে বিপদ আছে।' বীরেন বলল, 'কোনদিন আমাকেই সকলের হাস্যাস্পদ করে আঁকবে।'

'শুধু তোমাকে কেন,' তার মা বললেন, 'আমাকেও, বেবিকেও।'

প্রতিমা আতঙ্কের ভান করে বলল, 'My goodness! Go away Mr Shome, go away!'

'আপনাকে অভয় দিচ্ছি,' সোম বলল, 'আপনাকে দেখে নিজে হাসতে পারি, কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে পরকে হাসাব না।'

প্রতিমা ক্ষুণ্ণ হল। কাগজে তার নাম উঠুক, সকলে তাই নিয়ে আলোচনা করুক, তার সখীরা হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরুক, এই ছিল তার মনোগত সাধ।

'নিজে হাসবেন, কেউ জানতেও পারবে না, সে তো আরও ভয়ংকর। না, মা?'

'ভয়ংকর বই কী। অতি ভয়ংকর। কলিন যাতে না-হাসে তোমাকে তেমনি ব্যবহার করতে হবে, বেবি।'

'ইস। আমার খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। I am not one of those goody goody girls; I am a bad girl.'

'শোনো মেয়ের কথা।' মিসেস ডাট নতুন মানুষের কাছে অমন দুষ্টুমির অনুমোদন করলেন না, তা ওঁর গলার স্বরে ব্যক্ত হল।

খাওয়া সারা হলে পাইপ মুখে পুরে বীরেন মোটরে উঠল। হাত উঁচিয়ে বলল, 'Good-bye, Mummy. Good-bye, Baby. Cheerio, Shome.'

মা ও বোন সুর করে বললেন, 'Bye-bye Biren' সোম বলল, 'Cheerio Dutt.'

ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, পায়ে হাইহিল জুতো পরে, হাতে ব্যাগ ধরে প্রতিমা চলল তার মার সঙ্গে সওদা করতে, Hall and Andersonএর দোকানে। সোম হল সাথি।

সাথির কর্তব্য এক্ষেত্রে মাত্র একটি—যে মেয়ে একদিন তার স্ত্রী হতে পারে সে মেয়ে কী কিনতে ভালোবাসে ও কত দাম দিয়ে। সোম তার এই কর্তব্যকে অতিমাত্রায়গুরুতর বলে গ্রহণ করল, রোমান্সের প্রভাবমুক্ত চক্ষুষ্মান পুরুষমাত্রই যা করে থাকে। নতুবা ঋণং কৃত্বা প্রাণং যাবেৎ।

Hall and Anderson-এর দোকানে ওঁরা যে সকল ব্যবহার্য ও প্রদর্শনীয় বস্তু মূল্য দিয়ে আহরণ করলেন ওসকল বহন করাও হল সোমের অতিরিক্ত কর্তব্য। সংখ্যায়বড়ো অল্প বা ভারে নিতান্ত লঘু নয় সেগুলি। একখানা এক-শো টাকার নোট ওঁরা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, আর একখানারও প্রায় অন্তিম দশা উপনীত হল। যা প্রস্তুত পাওয়া গেল না তেমন দ্রব্যের অর্ডার দিয়ে ওঁরা সে যাত্রায় ক্ষান্ত হলেন এবং হলেন নিষ্ক্রান্ত।

তখন মিসেস ডাট বললেন, 'চলো দেখি নতুন কোনো বুড্ঢা এসেছে কি না।'

মিস ডাট বললেন, 'Oh, Buddha ! শুনবেন মিস্টার সোম, মা নাকি স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি শত বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করলে বীরেন হাইকোর্টের জজ হবে।'—বড়ো ভাইকে এঁরা দাদা বলেন না। ওটা স্মার্ট নয়।

সোম বলল, 'আপনি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন, মিসেস ডাট?'

'করি কলিন। তোমরা বলবে ওটা একটা কুসংস্কার, কিন্তু there are more things in Heaven and Earth —'

'যা বলেছেন। চলুন তবে বুদ্ধের সন্ধানে।'

এবার কেনা হল স্ফটিকের বুদ্ধ। প্রতিমা বলল, 'What a sweet little thing! এটি থাকবে আমার ড্রেসিং টেবিলের উপর।'

মা বললেন, 'না, না। একালের মেয়েগুলোর ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই। এটি হচ্ছে কলিনের প্রতি তার বন্ধুর মায়ের প্রথম উপহার।'

সোম মুখে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বলল, আশা করি দ্বিতীয় উপহার হবে বুড্ঢা নয় তরুণী।

'Now,' প্রতিমা বলল, 'আপনাকে কি আমি হিংসে করব না, মিস্টার সোম?'

'কে জানে,' সোম কথাটাকে একটু রহস্যময় করে বলল, 'এ জিনিস হয়তো একদিন আপনারও হবে।'

মিসেস ডাট বুঝলেন। প্রতিমাও। তার গালের রং ঠোঁটের রঙের সঙ্গে মিশ খেল। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কী করে?'

'বাঃ। কোহিনুর হিরে ইংল্যাণ্ডের রাজার হতে পারে আর এই স্ফটিক বুদ্ধ আপনার হতে পারে না? সুন্দর জিনিসমাত্রই হাত বদলায়।' মনে মনে জুড়ে দিল, সুন্দরী নারীও।

অমন উত্তর অবশ্য মা বা মেয়ে প্রত্যাশা করেননি। ভাবলেন উত্তরটা অকপট। খিন্ন হলেন।

অগত্যা সোম একছড়া মালা কিনল—এক প্রকার সবুজ পাথরের; মালা সমেত হাত দুটিকে জোড় করে ও ভঙ্গিপূর্বক ঘুরিয়ে মুদ্রার মতো করে বলল, 'অয়ি ঈর্ষান্বিতা, গ্রহণ করুন।'

প্রতিমা বিলোল কটাক্ষপাত করে চক্ষুতারকাকে ঊর্ধ্বচারী করল। তারপর নিম্নগামী করে মৌনের দ্বারা সম্মতিজ্ঞাপন করল।

'আহা, কেন তুমি অত খরচ করে ওসব কিনছ, কলিন? বেবির জন্যে অমন অপব্যয় করা এই ডিপ্রেশানের দিনে সংগত নয়।'

'আপনিও তো,' সোম বলল, 'আমার জন্যে কিছু কম খরচ করলেন না, মিসেস ডাট।'

'সে-কথা স্বতন্ত্র। বুড্ঢা আমি কিনতুমই, যাকেই দিই না কেন।'

সোম মনে মনে বলল, তরুণীকে আমি দিতুমই, যাই কিনি না কেন।

মালা পরে প্রতিমা বলল, 'Mummy, do I look too funny?'

মা বললেন, 'No, darling, you don't.'

তখন সোমকে প্রতিমা বলল, 'Thank you ever so much.'

সোম রঙ্গ করে বলল, 'Please.' তারপর ব্যাখ্যা করে বলল, 'জার্মানিতে সেবার গেছলুম। আমি যতবার বলি 'Thanks' ওরা ততবার বলে 'Please'; আর আমি যতবার বলি 'Please' ওরা ততবার বলে, 'Thanks' 'ভারি মজার। না?'

প্রতিমা মাথাটাকে চক্ষের নিমেষে তিনবার নেড়ে বলল, 'সত্যি'।

মিসেস ডাট বললেন, 'জার্মানরা ইংরেজি বলে তা হলে?'

'বলে বটে, কিন্তু আমাদের মতো যত্নের সহিত নয়। ওদের এক ভয়ানক বদ দস্তুর নিজের ভাষাটাকেই সব আগে শেখে ও সবাইকে শেখাতে চায়। পরের ভাষাকে ভাবে পরের ভাষা। এরকম উল্লুক এদেশে বেশি নেই, এইজন্যে আমাদের এমন প্রগতি।'

মিসেস ডাটের সন্দেহ হল, সোম হয়তো পরিহাস করছে। কিন্তু বিলেতফেরত কি কখনো ও-নিয়ে পরিহাস করতে পারে?

প্রতিমা একটু ভাবুকের মতো ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, জার্মানরা একটু বোকা, না?'

'একটু কেন, খুবই। এই দেখুন না, প্যারিস থেকে মেয়েদের ও লণ্ডন থেকে ছেলেদের পোশাক আনিয়ে নিতে কতই বা লাগে। তবু ওরা ভালো পোশাক পরবে না। পরবে স্বদেশি তৈরি খাদির মতো বিশ্রী কুরুচিকর বস্ত্র। আমরা কেমন বুদ্ধিমান, ল্যাঙ্কাশায়ারের লোককে তাঁতি বানিয়ে ছেড়েছি।'

প্রতিমা আগের মতো মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাস্তবিক।'

সোমের খাতিরে বীরেন সকাল সকাল ফিরল। টেনিসের চারজন যাতে হয় তার জন্যে সঙ্গে করে আনল যাঁকে তিনি তার বাগদত্তা, মিস কমলা সেন। কমলার উচ্চারণ কমলা। যেমন রমলার উচ্চারণ রমলা।

এদিকে কমলা ও বীরেন, অন্যদিকে প্রতিমা ও সোম। তুমুল সংগ্রাম। মান নিয়ে টানাটানি। সোম প্রতিমাকে বলে, 'জিতিয়ে দেব।' বীরেন কমলাকে বলে 'জিতিয়ে দেব।' শেষপর্যন্ত জয় হল সোমদেরই। তবে টায়টোয়। বীরেন শাসিয়ে বলল, 'কাল দেখে নেব। প্রতিমা খিল খিল করে হেসে বলল, 'Six to nil.'

কমলা দুষ্টুমি করে বলল, 'তার মানে love set.' সোম দুষ্টুমিতে যোগ দিয়ে বলল, 'Let's see whose love will set.'

পর পর তিনদিন টেনিস খেলায় জিতে সোম ও প্রতিমা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

সোম হেসে বলল, 'মিস ডাট, এবার আমরা টুর্নামেন্টে খেলব।'

প্রতিমা খুশি হয়ে বলল, 'তা হলে তো এ জন্মে কোনো খেদ থাকে না।'

বীরেন এ কথা শুনে বলল, 'অত গর্ব ভালো না। অতি দর্পে রাম মারা গেছলেন।'

কমলা শুধরে নিয়ে বলল, 'রাম নয়, রাবণ।'

সোম বলল, 'আপনি দেখছি রামায়ণখানা পড়ে মনে রেখেছেন, মিস সেন।'

মিস সেন বললেন, 'হাঁ, রোমেশ ডাটের রামাইয়ানা ও মহাবারাটা আমি ধর্মগ্রন্থের মতো পাঠ করেছি।'

সোম বলল, 'রামায়ণ ও মহাভারত ধন্য হল।'

তারপর কথা চলল টেনিসকে অবলম্বন করে। দেশি বিলাতি জাপানি খেলোয়াড়দের চুলচেরা সমালোচনা, তাদের ফর্ম, তাদের স্টাইল, তাদের ড্রাইভ, তাদের টিম-ওয়ার্ক, তারা কে কাকে হারাবে, কয় গেমে হারাবে ইত্যাদি। এরাই যে তাদের ভাগ্যবিধাতা সে বিষয়ে এদের কারুর সংশয় ছিল না। মিসেস ডাটও মাঝে মাঝে মন্তব্য পেশ করছিলেন। তিনি যে নিজে একজন টেনিস খেলোয়াড় তা নয়। তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতে সামাজিকতার অঙ্গ হিসেবে টেনিস খেলাটাও তাঁর জানা ছিল। স্বামী গেছেন, কিন্তু ভড়ং যায়নি। রাখবার মধ্যে রেখে গেছেন একখানা বাড়ি, সেটার গুণ এই যে সেটা বন্ধকমুক্ত। তার একটা পাশে ভাড়াটে বসিয়ে ভাড়ার টাকায় কায়ক্লেশে এদের দিন গুজরান হয়। বীরেন যে বিয়ে করতে পারছে না ওই তার কারণ। আগে প্রতিমার বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর বীরেনের বিয়ে, সেইজন্যে প্রতিমার বিয়ের জন্যে বীরেনের এমন চাড়, এতটা গরজ। পাত্রের খোঁজে সে উত্তর কলকাতার মাটি মাড়ায়। নইলে প্রতিমার প্রতি যে তার বিশেষ স্নেহমমতা তার লক্ষণ দেখা যায় না। পরের বোনকে যত তোয়াজ করে নিজের বোনকে তার আধুলি, কি সিকি কি দুয়ানিও না। তার বেলায় করে সর্দারি, কমলার বেলায় করে খিদমদগারি।

একটি আমেরিকান মহিলার গল্প সোমের মনে পড়ছিল। বিধবা হয়ে তিনি তাঁর স্বামীর লাইফ ইনশিওরেন্সের টাকা যা পেলেন তাতে তাঁর ও তাঁর বিবাহযোগ্যা দুই মেয়ের অতি কষ্টে দু বছর চলতে পারে। তিনি করলেন কী, না শহরের সবচেয়ে বড়ো হোটেলে মাস দুয়েকের মধ্যে সমস্ত টাকাটা ফুঁকে দেওয়ার সংকল্প করলেন। আত্মীয়েরা বলল, 'পাগল!' বন্ধুরা বলল, 'আমরা চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি, অমন করে আত্মহত্যা কোরো না।' বিধবার কিন্তু এক কথা।

মাস দুয়েক যেতে-না-যেতে দেখা গেল বড়ো মেয়েটি বাগদত্তা হয়েছে—যার বাগদত্তা তিনি এক নিযুতপতি (অবশ্য নিযুত সংখ্যক নারীর না)। বড়ো মেয়ের চেষ্টায় ছোটো মেয়েও তেমনি পাত্রে পড়ল। তখন বিধবার আহ্লাদ দেখে কে? তিনি বছর দুয়েক চাকরি করলেন, কিন্তু নিযুতপতিদের শাশুড়ি কি সোসাইটি থেকে সরে গিয়ে বনবাস করতে পান? তাঁর উপর সমাজের তো একটা দাবি আছে? কে একজন লাখপতি তাঁকে বিয়ে করে জাতে উঠল। বন্ধুরা বলল, 'সাবাস।' আত্মীয়রা বলল, 'এবার আমাদেরও একটা কিনারা করো।' বিধবাটি—না, না, সধবাটি—বললেন, 'আমি জানতুম যে আমার মেয়ে দুটি রূপসি, কেবল একবার নিযুতপতিদের চোখে পড়লে হয়। তাই সর্বস্ব পণ করে নিযুতপতিদের চোখের সুমুখে তুলে ধরলুম। যদি ব্যর্থ হতুম তবে ভিক্ষা ছাড়া আমাদের অন্য গতি ছিল না—অথবা ভিক্ষার শামিল চাকরি।'

হায়, দেশটা আমেরিকা নয়। তাই কোনো মাড়োয়াড়ি শেঠের বদলে বেকার সোমকে পাকড়াতে হয়। এঁরা আই সি এস, আই এম এস-এর আশায় আশায় থেকে নিরাশ হয়েছেন। একে তো তাদের সংখ্যা তাদের আশাপথবর্তিনীদের সংখ্যার অনুপাতে ক্ষীণাতিক্ষীণ, তার ওপর তারা আজকাল ডেপুটি মুনসেফের মেয়ে বিয়ে করে। ('They deserve no better') তাদের চেয়ে যেকোনো বেকার বিলেতফেরতা ভালো। অবশ্য যদি তার পৈত্রিক সম্পত্তি থাকে। সোমের বাবার বিজ্ঞাপনটা এরাঁ পড়েছিলেন। যে-কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল সে-কাগজ যদিও এঁদের চোখে পড়ে না তবু কে একজন হিতৈষী বন্ধু তার একটা কাটিং এঁদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে লিখেছে কায়স্থ পাত্রী চাই। মিসেস ডাটের মনে পড়ল তাঁর পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল তো কায়স্থ। অতএব তাঁর মেয়েও কায়স্থ। আর মেয়ে যে সুন্দরী, শিক্ষিতা ও কলাবতী এ বিষয়ে কোন জননীর দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব ঘটে, অন্তত তার বিয়ের বেলায়? 'You want the best brides? We have them.' বিলাতি দোকানদারদের এই জাতীয় বিজ্ঞাপনের পশ্চাতে যে আত্মপ্রত্যয় উহ্য থাকে বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা-দের মনেও থাকে তাই। তবে তাঁরা বিজ্ঞাপন নাও দিতে পারেন।

মিসেস ডাট একদিন আচমকা বললেন, 'জাত জিনিসটা খুব যে বেশি খারাপ তা আমি মনে করিনে, যাই কেন বলুক না ওরা (অর্থাৎ ইউরোপীয়রা)।'

সোম একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন বলুন তো?'

'জাত না থাকলে তার জায়গায় আর একটা কিছু থাকে, এই যেমন ক্লাস। আমরা ইঙ্গবঙ্গরা একটা ক্লাস হয়ে উঠেছি, সেটা ভালো নয়। আমি তো বলি, Back to the caste. তুমি শুনে সুখী হবে, কলিন, যে এ বাড়ির আমরা এখনও কায়স্থ আছি—রক্তে। এ বাড়ির আমরা পাশ্চাত্যকেও নিয়েছি, প্রাচ্যকেও ছাড়িনি।'

সোম মনে মনে বলল, প্রাচ্যকে যে ছাড়েননি তার প্রমাণ আপনার স্বপ্নে বিশ্বাস, আপনার বুড়ঢা, আপনার নিজের হাতের দেশি আমিষ রান্না। কিন্তু জাত? আপনার দুই মেয়ে কি অন্য জাতে পড়েনি? আপনার ছেলেও তো কায়স্থের মেয়ে ঘরে আনবে না। তা সত্ত্বেও আপনারা যদি কায়স্থ হন তো তাতে আমার সুখী হওয়ার কী আছে?

বলল, 'হ্যাঁ। জাত জিনিসটা রেখে মস্ত সুবিধে। আমিও ওর চেয়ে সুবিধের কিছু না পেলে ওটা দিচ্ছিনে, মিসেস ডাট।'

এরপর মিসেস ডাট সোমের বাড়ির প্রসঙ্গ পাড়লেন এবং পৃষ্ঠপোষকীয়ভাবে মাথা নোয়ালেন ও তুললেন।

প্রতিমার সঙ্গে নিভৃত আলাপের সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে সোম একদিন তা পেল। বোকাটা জানল না যে সুযোগ সে দৈবক্রমে পেল না, পেল না তার পুরুষকারের দ্বারাও। পেল মিসেস ডাটের গোপন অনুগ্রহে তথা আগ্রহে। সিনেমার বক্সে।

'মিস ডাট,' সে ঘটা করে বলল, 'আমি যে, এতদিন আপনাদের ওখানে থাকলুম সে কি শুধু টেনিস খেলবার জন্যে?'

মিস ডাট বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আরম্ভের সুরে তাঁর হৃদয় নৃত্যের জন্যে চরণ তুলল। তিনি বিস্ময়ের ভান করে বললেন, 'আপনার অন্যকোনো উদ্দেশ্য ছিল নাকি?'

'ছিল না?'

'ছিল?'

'এত যে love game-এ আপনি ও আমি পার্টনার হলুম তা কি শুধু খেলাক্ষেত্রে আবদ্ধ রইবে?'

'যান!'

'যাবই তো, কিন্তু যাওয়ার সময় কি একলাটি যাব?'

'আপনি ভা-রি দুষ্টু, মিস্টার ব্যাড ম্যান।'

'আপনিও তো বলে থাকেন আপনি ব্যাড গার্ল।'

'But fancy taking me away! O Mummy!'

'থাক থাক, মা-কে ডাকবেন না। বড্ড বেরসিক তো।'

'But do tell me, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'আপনার শ্বশুরবাড়ি।'

'ও মা, সেই পুর্ণিয়া না পুরুলিয়া। কোথায় সেটা, মধ্যপ্রদেশে?'

'বেশি দূর না, বেহারে।'

'সেখানে কি সভ্য মানুষের বাসের সব সুবিধা আছে, দক্ষিণ কলকাতার মতো?'

'না। কিন্তু কোনো সুবিধা না থাকলেই বা কী! সুবিধার চেয়ে যা বড়ো তা আছে—স্নেহ-মমতা।'

প্রতিমা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'যেখানে creature comforts নেই সেখানে বিংশ শতাব্দীই নেই। আমি সেই বর্বরযুগে ফিরে যেতে চাইনে, যে-যুগে মানুষ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ত, কেরোসিনের আলোতে পড়ত, কুয়োর জল খেত—যে-যুগে ছিল না টকি।'

সোম হতাশ হয়ে বলল, 'তাহলে আমি আজ রাত্রেই চললুম।'

'সে কি! কোথায়?'

'জানিনে কোথায়,—কুস্তোড় কলিয়ারি, কি নান্দিয়ার পাড়া, কি ডুমরাওন।'

'কেন, শিকার করতে?'

'হ্যাঁ, শিকার করতে। তবে বাঘ শিকার নয়, বউ শিকার।'

প্রতিমা নির্বাক।

সোম বকে গেল, 'হ্যাঁ। বউ শিকার। একটি বীণাপাণি, কি লক্ষ্মীরানি, কি জ্যোৎস্নাময়ী—বর্বর যুগের মানুষের বর্বরযুগীয় নাম—যদি পাই তবে আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক।'

'মিস্টার সোম! মিস্টার সোম! কী আপনার রুচি। আপনার উচিত হচ্ছে না আমার পাশে বসা।'

'তাই তো,' সোম বলল, 'আপনারা এ যুগের ব্রাহ্মণ, বর্বরের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলাই আপনাদের একমাত্র ভাবনা। আর আমি বর্বর বংশে জন্মেছি আমার বর্বর complex নেই। আমার খেদ কেবল এই যে, বর্বরের চেয়েও বর্বর আছে—যেমন সাঁওতাল—তাদের প্রতি আমার বন্ধুদের তেমনি অবজ্ঞা যেমন আমার বন্ধুদের প্রতি আপনাদের।'

প্রতিমা দেখল সোম ঠাট্টা করছে না। তখন বলল, 'মিস্টার সোম, আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না?'

‘কোনটা ঠাট্টা?’

‘যান! আমি বলব না।’

‘আপনি বর্বরদের দেশে যেতে প্রস্তুত আছেন?’

প্রতিমা চক্ষু নত করল। হঠাৎ তার ব্যাগটার প্রতি তার মনোযোগ একান্ত হল। সেটাকে নিয়ে সে লোফালুফি করতে থাকল।

‘আপনি সভ্যতার সব সুবিধা না-পেলে সেখানে টিঁকে থাকতে পারবেন?’

প্রতিমা একবার সোমের সঙ্গে চোখাচোখি করল। তারপর ব্যাগ নিয়ে তেমনি লোফালুফি।

সোম বলল, ‘খুব খুশি হলুম। কিন্তু—’

প্রতিমা চমকিয়ে উঠল।

‘কিন্তু,’ সোম বলল। ‘আমার পরিচয়ের এক স্থানে একটু কালিমা আছে।’

প্রতিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

‘ওটুকু,’ সোম বলল ‘আমার পরিচয়ের গায়ের আঁচিল। আমাকে গ্রহণ করলে ওটুকু স্বীকার করতে হয়।’

দৃশ্যের দিকে দুজনের কারুর লক্ষ্য ছিল না। গানের দিকে ছিল না কান। ওদের নিজেদেরই জীবনে এসেছে একটি সংকট মুহূর্ত। নায়ক-নায়িকার সংকটে তারা বিমনা হল না। প্রতিমা হল উন্মনা, সোম হল বাঙ্ময়।

‘মিস ডাট, যাকে বলে slip তা আমার জীবনে ঘটেছে।’

‘Eh?’

‘বললুম আমি সত্যিই ব্যাড ম্যান।’

‘You don't mean it, do you?’

‘আমি যা বলছি তার মানে তাই।’

‘No. It can't be. It can't be.’

‘আপনি বিশ্বাস না-করলে আমি কী করব বলুন।’

‘I can't believe it. Fancy—Oh!’ বলে প্রতিমা দুই হাতে মুখ ঢাকল ও মাথাটা নাড়তে থাকল! বলতে থাকল, ‘Oh! Oh! Oh!’

সোম তার কানে কানে বলল, ‘চুপ, চুপ। পাশের বক্সের ওরা কী ভাববে।’

প্রতিমা ক্ষিপ্তের মতো বলল, ‘You have broken my heart. You have. You have.’

সোমটা বোকা। যদি বলত, হ্যাঁ, আমি আপনার হৃদয়টিকে ভেঙে চুরমার করেছি তাহলে প্রতিমা গৌরব বোধ করত। ভগ্ন হৃদয় কার না গৌরবের সামগ্রী? ভ্রষ্ট কৌমার্য্যের মতো।

বলল, ‘কিন্তু, মিস ডাট, আপনিও তো ব্যাড গার্ল।’

‘না। আমি নই, আমি সে অর্থে নই।’

‘সে অর্থে হলেও কি আমি অপরাধ নিচ্ছিলুম? আমি তো সেই অর্থই বুঝেছিলুম।’

‘ভুল, ভুল, আপনার বোঝবার ভুল।’ প্রতিমা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, ‘O Mummy!’

সোম চঞ্চল হয়ে বলল, ‘ছি, ছি, মা-কে এসব কথা বলবেন কেন? আপনি তো নাবালিকা নন।’

মাকেই যদি না-বলবে তবে তার নাম বেবি হল কেন?

সোম টের পেল যখন মিসেস ডাটের মুখমন্ডল বিষাদের ছায়াঙ্কিত দেখল। যেন মুখমন্ডল নয়, silhouette.

তিনি বললেন, ‘কলিন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।’

সোম জানত কী সে কথা। ‘বলুন।’

‘কলিন, তুমি আমার ছেলের বন্ধু, ছেলের মতো। তোমাকে বিশ্বাস না-করলে বাড়িতে জায়গা দিতুম না। তুমি নিজেই বলো তুমি কি বিশ্বাসের যোগ্য?’

‘কেন, আমি কি কোনো জিনিস চুরি করেছি?’

‘না।’

‘কাউকে ঠকিয়ে কোনো জিনিস আত্মসাৎ করেছি?’

‘না।’

‘কারুর প্রতি গর্হিত আচরণ করেছি?’

‘না।’

‘তবে?’

‘তবে—তবে তুমি যে বেবির হৃদয়টিকে অমন কথা বলে smash করলে সেটা কি ভদ্রজনোচিত হল?’

‘যা সত্য তাই বলেছি, এখন না বললে পরে তো জানাজানি হত।’

‘তেমন জানাজানিতে,’ মিসেস ডাট বললেন, ‘কিছু এসে যেত না। বিয়ের আগে কার স্বামী কী করেছেন তা কি কোনো স্ত্রী ঘাঁটতে যায়? ওসব হয়তো তোমার ইউরোপে সম্ভব, কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দু কায়স্থ, আমাদের আদর্শ সীটা ও সাবিট্রী।’

‘এতেই বা কী এসে যায়?’ সোম দুঃসাহসিক প্রশ্ন করল।

‘কী এসে যায়? কলিন, কী এসে যায়? How dare you ask that question? How dare you?’

সোম থতোমতো খেয়ে বলল, ‘আমি ভালো মনে করেই ও প্রশ্ন করেছি।’

‘না, না। অমন প্রশ্ন ভালো নয়। বিয়ের পরের কথা এক, বিয়ের আগের কথা অন্য। কোর্টশিপের সময় অমন কথা permissible নয়, ওতে একটা বিশ্বস্ত হৃদয় ভীত চকিত ভগ্ন হয়। ও কথা শুনলে যাদের হিস্টিরিয়া নেই তাদেরও হয় হিস্টিরিয়া, আর যাদের আছে তাদের নিয়ে তাদের মা-দের কী যন্ত্রণা!’

তিনি বলতে লাগলেন, ‘না, কলিন, না। তুমি বিলেতফেরত, you ought to know better. তুমি যে একটা বাবুর মতো ব্যবহার করবে তা আমরা কেউ কল্পনা করতে পারিনি—তুমি আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলে না।’

‘তা হলে,’ সোম প্রস্তাব করল, ‘আমাকে বিদায় দিন, আমি আসি।’

‘সে কী?’

‘আমি যে ব্যবহার করেছি তার শাস্তি এ অঞ্চল থেকে নির্বাসন।’

‘না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে আমরা তৈরি জিনিসটি ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম! তুমি তা নও। এর প্রতিকার তোমাকে তৈরি করে নেওয়া।’

সোমের ধারণা ছিল সোমই প্রতিমাকে তৈরি করবে। তা নয়, প্রতিমা ও তার মা সোমকে তৈরি করতে উদ্যত। ইঙ্গ-বঙ্গ ফেরঙ্গের উপর সোমের উৎকট অবজ্ঞা অবশেষে শ্লাঘায় পরিণত হবে। বিচ্ছেদ ঘটবে তার পিতৃ-পিতামহের সমাজের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে। তার মাসিমা পিসিমারা তার স্ত্রীর ভাষা বোঝবার জন্যে বেণী গাঙ্গুলির ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধান কিনবেন। ‘ভারতীয় হিন্দু কায়স্থ’ হয়ে সে ধুতি পরতে পাবে না, পাছে তার বাবুর্চি-খানসামা-মশালচি তাকে বাবু মনে করে ও নিজেদের মধ্যে বাবু বলে উল্লেখ করে। এ বাড়িতে ধুতি একটা ফ্যান্সি ড্রেস। অথচ সোম বিলেতেও ধুতি পরে এসেছে।

‘মিসেস ডাট’, সোম বলল, ‘একা আমাকে তৈরি করে আপনাদের কী হাতযশ হবে? যদি পারতেন আমার মা-বাবাকে, ভাই-বোনকে, কাকি-মামি-মাসি-পিসিকে কাকা-মামা-মেসো-পিসেকে তৈরি করতে তবেই জানতুম আপনাদের হাতের গুণ। আমাকে বিদায় দিন, আমি আসি।’

মিসেস ডাট কী ভাবলেন। বললেন, ‘বুঝেছি, বুঝেছি তুমি যা mean করছ। ওঁরা পৌত্তলিক, ওঁদেরকে তো সদলবলে দীক্ষিত করতে পারিনে, কাজেই একা তোমাকে দীক্ষিত করে কী হবে। কিন্তু ওসব আজকাল উঠে

গেছে। চাও তো হিন্দু মতেই তোমাদের বিয়ে হবে, শালগ্রাম সাক্ষী করে।'

'বিয়ের মত নিয়ে আমার মাথাব্যাথ্যা নেই', সোম বলল। 'আমি চাই বিয়েতে মত। আপনার মেয়ের কি তা আছে?'

'নেই আবার,' মিসেস ডাট এতক্ষণ বাদে হাসলেন।

'আমি যা বলেছি তা সত্ত্বেও?'

'তার জন্যে,' মিসেস ডাট করুণার সহিত বললেন, 'তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, কলিন?'

'কেন?'

'সেইটেই ফর্ম।'

'আমি ফর্ম-এর চেয়ে সত্যকে বড়ো বলে জানি। তাই সত্যের বিরোধী হলে ফর্ম মানিনে।'

মিসেস ডাট জীবনে এত বড়ো শক পাননি! সোম যদি বলত, আমি নাস্তিক, ভগবান মানিনে, কিংবা আমি ফ্রি থিঙ্কার, ধর্ম মানিনে, কিংবা আমি স্বৈরাচারী, নীতি মানিনে, কিংবা আমি কমিউনিস্ট, পরের সম্পত্তিতে পরের অধিকার মানিনে, তাহলে তিনি হাসতেন, কিংবা অনুমোদন করতেন, কিংবা উপদেশ দিতেন, কিংবা চটতেন। কিন্তু 'ফর্ম মানিনে!' তার মানে জেন্টালম্যান নই, সভ্য মানুষ নই, উলঙ্গ নরখাদক।

মিসেস ডাট মূর্ছা যেতেন, কিন্তু এক বাড়িতে দু-জন মূর্ছারোগী হলে কাকে, কে দেখাশুনা করবে। তিনি আর একটি কথা না-বলে সোমের দিকে আর একটিবার না চেয়ে সোমকে cut করলেন (অর্থাৎ কাটলেন না, উপেক্ষা করলেন)।

বিদায় না নিয়ে চোরের মতো সরে পড়া যায় না! সোম বীরেনের প্রতীক্ষায় বসে বসে 'Good Housekeeping' পড়তে থাকল।

বীরেন এসেই বলল, 'শুনবে একটা সুখবর? কমলাদের ওখানে তোমার আজ নিমন্ত্রণ।'

'কিন্তু,' সোম বলল, 'আমি যে এখনি চলে যাচ্ছি।'

'সে কী হে! কোথায়?'

'জানিনে কোথায়। জানি যাচ্ছি।'

বীরেন মুখ ভার করে মা-র কাছে গেল। দেখল যে মা-ও মুখ ভার করে সেলাই করছেন। 'মা, সোম কেন যাচ্ছে?'

মা জ্বলে উঠে বললেন, 'He is no better than a cannibal.'

বীরেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'No better than what?'

মা পুনরুক্তি করলেন। বীরেন ধপ করে বসে পড়ে ভাবল, সোম মানুষের মাংস খায়! এ কি কখনো হতে পারে! মা-কে কি রাঁচি পাঠানো আবশ্যক?

'সে ফর্ম মানে না।'

'কী—কী মানে না?'

'ফর্মে বিশ্বাস করে না সে।'

'ফর্মে বিশ্বাস করে না!' বীরেন উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করল। 'তবে ঠিকই বলেছ—নরখাদকের অধম।'

চলল সে সোমের কাছে কৈফিয়ত দাবি করতে। বলল, 'তুমি নাকি ফর্মে বিশ্বাস করো না?'

'সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষ না-বাধলেই করি, বাধলে করিনে—' এই হল সোমের কৈফিয়ত।

বীরেন ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি দেখছি সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধী। কেবল পোশাকটা অন্যরকম।'

'তা হলে আসি?'

'আরে থামো, থামো। ঠাট্টাও বোঝো না। বলছিলুম ওসব সত্য-টত্য আমাদের মুখে সাজে না, গান্ধীর মতো fanatic-দের দলে আমরা নেই। ফর্মটাকে সর্বদা সব অবস্থায় বাঁচিয়ে তারপরে অন্য কথা, সত্য বা শিব

বা সৌন্দর্য।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা নেই,' সোম বলল, 'আমাকে শুধু একবার সকলের কাছে বিদায় নিতে দাও।'

বীরেন গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ।' সোমকে উপরে নিয়ে ছেড়ে দিল ও নিজে কমলার বাড়ি গেল!

মিসেস ডাট বললেন, 'যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হও তবে I shall be ever so happy.'

প্রতিমা বলল, 'আমার নিজের বলবার কী থাকতে পারে? মা-র যা বক্তব্য আমারও তাই।'

'আপনার স্বাধীনতা তাহলে চিন্তারও নয় বাক্যেরও নয়? কেবল চলাফেরার?' বলল সোম।

প্রতিমা অপমানে কাঁপতে থাকল।

মিসেস ডাট বললেন, 'তুমি তো অত্যন্ত বেয়াদব হে। তুমি কি মনে করো, যে তার মা-র অনুমতি না-নিয়ে সে চলাফেরাও করে?'

সোম অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তাহলে তাঁর স্বাধীনতা কীসে? খিদে পেলে খাওয়াতে, না ঘুম পেলে শোওয়াতে? না শাড়ি দেখলে কেনাতে? না রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে?'

'না, ওর সভ্য মানুষ হবার সত্যিই সম্ভাবনা নেই,' মিসেস ডাট মেয়ের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'ও আর আসবে না।'

প্রতিমা বিচলিত হয়ে বলল, 'Will you really never—' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

সোম হেসে বলল, 'কাঁদার স্বাধীনতা তো আছে বলে মনে হয়।'

প্রতিমা কাঁদতে কাঁদতে তর্জনী উঁচিয়ে কোপ ব্যঞ্জনা করল। তার মা বললেন, 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আপনারও কি সেই অভিলাষ?' সোম শুধাল প্রতিমাকে।

'ও ছাড়া আপনি আর কী প্রত্যাশা করেন?' প্রতিমা বলল ঝাঁঝের সঙ্গে।

সোম অম্লানবদনে বলল, 'আমি প্রত্যাশা করি যে আপনি আমার সঙ্গে আসবেন।'

'কী? কী?'—মিসেস ডাট চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'O my!'—প্রতিমাও দাঁড়াল।

'কোই হ্যা—য়?' মিসেস ডাট চিৎকার করলেন।

'আবদু—ল!' প্রতিমা ডাক দিল।

তিন তিনটে দাড়িওয়ালা ভৃত্য হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হল ও 'হুজুর' বলে সেলাম ঠুকে হাঁপাতে লাগল।

সোম বলল, 'লোক জড় করবার কী দরকারটা ছিল? আমি তো এঁকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলুম না। ইনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন।'

মিসেস ডাট বললেন, 'চোপ। এখন মানে মানে বেরিয়ে যাও।'

'যাবই তো। কিন্তু এতগুলো পার্শ্বরক্ষী তো আমি চাইনি, চেয়েছি একটিমাত্র পার্শ্ববর্তিনী।'

প্রতিমা গালে হাত দিয়ে বলল, 'That beats me!'

মিসেস ডাট বললেন, 'বীরেন থাকলে গলাধাক্কা দিয়ে নীচে রেখে আসত। আবদুল, আবু ও মামুদ সাহস করবে না। কিন্তু সাহস জোগাবে। আমিই ওকাজ করি।'—এই বলে তিনি সোমের ঘাড়ে হাত তুললেন।

সোম হেসে একটি bow করল—প্রতিমাকে। মিসেস ডাটের হাতটাকে নিজের হাত দিয়ে আস্তে হটিয়ে দিল।

বলল, 'ফর্ম-এর চূড়ান্ত হয়েছে। এইটুকু চাক্ষুষ করবার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করা। এখন তবে আসি।'

৬
মায়া

আবার উত্তর কলকাতা।

ললিতা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'কই, মেম বউদিকে আনলে না?'

সোম বসে পড়ে বলল, 'আসল মেমের চেয়ে নকল মেমে নাকাল বেশি। না খেলেন একটা চুমো, না বললেন একবার ডার্লিং, সূর্যমুখী ফুলের মতো তাঁর একই লক্ষ্য—মা-র মুখ।'

কুণাল বলল, 'ললিতার যে মা ছিলেন না সে আমার ভাগ্য।'

ললিতা বলল, 'আমার মা থাকলেও তোমার স্ত্রীভাগ্য একই হত।'

সোম বলল, 'প্রতিমার মা না-থাকলে আমার স্ত্রীভাগ্য একই হত কি না সে বিষয়ে কিন্তু আমার সন্দেহ থাকল।'

সোমের মে-ফেয়ার কাহিনি শেষ হলে ললিতা বলল,—'ভালো কথা, কে একজন কেষ্টবাবু তোমার খোঁজ নিতে এসে ফিরে গেছেন, বলে গেছেন, তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেষ্টবাবু?'

'বললেন শুধু কেষ্ট মামা বললেই তুমি চিনবে।'

'তাই বলতে হয়—কেষ্ট মামা। হ্যাঁ, কেষ্ট মামা। চা-বাগানের কেষ্ট মামা। হোঁদলকুতকুতের মতো চেহারা—না?'

ললিতা বলল,—'আহা, কী মাতুল-ভাগ্য!'

কুণাল আড়চোখে সোমের দিকে চেয়ে বলল, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ।'

সোম বলল,—'তার মানে আমিও একটি হোঁদলকুতকুত! বেশ, বন্ধু, বেশ। তবু যদি আপন মামা হতেন!'

ললিতা বলল, 'হোঁদলকুতকুত না-হলে কোথাও বউ জোটে না-কেন? বিয়ের ফুল ফোটে না-কেন?'

সোম বলল,—'তোরা কেউ পারবিনে গো ফোটাতে ফুল ফোটাতে।' এই বলে দার্শনিকের মতো অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সোম মামার সঙ্গে তাঁর মেসে গিয়ে দেখা করলে তিনি বললেন, 'এই যে ভজা।' একমুখ পান চিবোতে চিবোতে তখন তাঁর অসামাল অবস্থা। আর কিছু বলতে পারেন না। 'এই যে ভজা।'

ও নাম অনেক দিন বাতিল হয়েছে। সোম একটু বিরক্ত হল!

'তারপর। কবে ফিরলি?'

'মাস দেড়েক আগে।'

'হুঁ; কোথায় চাকরি হল? না, হয়নি?'

সোম বিমর্ষভাবে বলল—, 'কোথায় আর হল? বিলেত থেকে যা পুঁজি এনেছিলুম তাও ফুরিয়ে এল।'

'হবে, হবে। যেমন দিনকাল। একটু সবুর করতে হয়। প্রফেসারি করবি ঠিক করলি?'

'জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ যাতে দু-পয়সা আসে তাই করতে রাজি আছি।' তারপর মনে মনে জুড়ে দিল, তবে হব না মুচি, হব না, হব না, যদি না পাইমুচিনি।

'হা-হা-হা-হা। তেমনি ছেলেমানুষ আছিস। 'ভজগোবিন্দ পরমানন্দ' বলে তোকে খ্যাপাতুম মনে পড়ে? তোর মতো অত বড়ো স্কলার। বংশের গৌরব। দ্যাখ, ও সব কাজ আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ার। কোন কাজে হাত না দিয়েছি—বল। অবশ্য তুই সবটা ইতিহাস জানিসনে। মাইনিং, প্লান্টিং, মোটর ইমপোর্টিং। শেষে এই দারুণ ট্রেড ডিপ্রেশান। এবার খুলেছি বিয়ের ব্যাবসা।'

'কী! শেষকালে—'

'কেন রে! এতে শক পাওয়ার কী আছে! দেশের লোক খেতে পায় না বলে কি মেয়ের বিয়ে, ছেলের লেখাপড়া বন্ধ রাখবে? একটাও আঁতুড়ঘর, কি স্কুল খালি হয়েছে বলতে পারিস? তুই একটি বিয়ে কর না।

লক্ষ্মী যদি অন্তঃপুরে আসেন তো জীবনের সবদিক দিয়ে আসেন। পয়মন্ত দেখে বিয়ে করলে জীবনের half the battle জেতা গেল।'

'বিয়ে করতে কি আমার অনিচ্ছা? কিন্তু—'

'না, না, ওসব কিন্তু টিন্তু শুনব না। চল, চল আমার আপিসে চল।'

মামার আপিস কর্পোরেশন স্ট্রিটে। কামরার বাইরে লেখা—

MR. CARR

Hindu Marriage Broker

মামা কোট ও ভেস্ট খুলে গোল চেয়ারে বসে এক চক্কর ঘুরে নিলেন। তারপর ভাগনের দিকে একটি চুরুট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'Sorry, couldn't offer you a cigarette. দেশের লোকের সেন্টিমেন্টটাকে খাতির করতে হয়। আর বিলিতি সিগ্রেট কি প্রকাশ্যে কেনবার জো আছে?'

সোম পকেট থেকে তার ইটালিয়ান সিগ্রেটের কেস বের করে মামার সামনে ধরল। তিনি চোরের মতো ইতস্তত করতে করতে খপ করে মুখে পুরলেন। বললেন, 'Thank you. কতকাল পরে!'

সোম বলল, 'দেশের মস্ত পরিবর্তন হয়েছে, তা অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু বিয়ের বাজারটা—'

'আমাদের সমাজ,' তিনি সিগ্রেটটা ধরিয়ে এক টান দিয়ে বললেন, 'কোন brand বল তো?'

'সিগ্রেটের আবার brand কী?' সোম বলল, 'যেমন স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি তেমনি—'

'বোয়েছি (বুঝেছি)। বেড়ে লাগছে। আশা করি স্বদেশি নয়?'

'না, ইটালিয়ান। নেপলসে কেনা।'

'তাই বল।' পিঠ পিঠ কয়েক টান দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে নিজের কেসে তুলে রাখলেন। একসঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'ধোঁয়ারও কেমন মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস?'

তারপর তাঁর মনে পড়ল কী বলতে যাচ্ছিলেন। 'হ্যাঁ—আমাদের সমাজ যদিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই তবু পশ্চিমমুখো হতে হতে কোনো দিন মক্কা পেরিয়ে বিলেত পর্যন্ত—আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকা অবধি—যাবে কি না আল্লাই জানেন। আমরা আজকাল কেউ থাকি আকিয়াবে, কেউ করাচিতে, কেউ নেলোরে, কেউ ফতেপুর সিক্রীতে। আমাদের ছেলেমেয়েদের কোর্টশিপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে না-হয় ধরেই নিলুম, কিন্তু হওয়া কি geographically সম্ভব? দৈবাৎ কারো সঙ্গে কার চোখের দেখা ও চোখের দেখায় প্রেম হয়ে যেতে পারে বটে—অন্তত বাংলা নভেলে তো তাই লেখে ও তাই পড়ে মেয়েগুলো পর্যন্ত বকছে—কিন্তু গ্রেট মেজরিটির কথা ভেবে দ্যাখ ভজগোবিন্দ।'

আবার সেই মান্ধাতার আমলের নাম। সোম ব্যঙ্গ করে বলল, 'গ্রেট মেজরিটির জন্যে গ্রেট-থিঙ্কার প্রয়োজন। যেমন আপনি।'

'নেহাত ভুল বলিসনি, ভজা,' তিনি আর একবার চক্কর দিলেন। 'যে কাজটি আমি করছি সেটি এক হিসেবে social service. যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। যার যেমনটি পাত্র বা পাত্রী চাই তাকে ঠিক তেমনটি জোগাড় করে দিই। তোর বাবা তোর জন্যে নিজের চেষ্টায় জোর একশোটি সম্বন্ধ পাবেন কিন্তু আমার সাহায্য নিলে এক হাজারটি। Scope কত বেড়ে গেল হিসাব করে দ্যাখ। কে জানে হয়তো সাতশো সাতাত্তর নম্বর সম্বন্ধটি সবদিক থেকে নিখুঁৎ হত। দুই পক্ষের কারুর মনে কোনো ক্ষোভ থাকত না, প্রজাপতির স্বহস্তের নির্বন্ধ।'

সোম বলল, 'প্রজাপতির স্বহস্তের মহিমা অপার। আমার কিন্তু প্রাণান্ত হত হাজারটি পাত্রীকে স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকীয় উপায়ে পরীক্ষা করতে।'

কেষ্ট মামা কান দিলেন না। হাঁটু জোড়াকে সবেগে ঠোকাঠুকি করতে করতে বললেন, 'মুস্কিল এই যে লোকে এখনও এসব বিষয়ে এক্সপার্টের সাহায্য নিতে শেখেনি। হয় নিজেরা যা-তা একটা করে বসে, নয়

আনাড়িকে লাগিয়ে দেয়। তাতে পয়সা কি বাঁচে ভাবছিস? যাক, ধীরে ধীরে আমার পসার জমছে। কয়েক ঘর বাঁধা ক্লায়েন্ট হয়েছেন, ষষ্ঠী যাঁদের ঘরে বাঁধা। হ্যাঁরে তোর নামটা রেজিস্ট্রি করে রাখব?'

'না,। না।' সোম সাতঙ্কে বলল। 'আপনার খাতা দেখে ষষ্ঠী কোন দিন না আপনি এসে ধন্না দেন।'

'নামটা থাক না? বিয়ে তো কেউ জোর করে দিচ্ছে না। ইচ্ছে না-হয় না-করিস। কিন্তু মাঝে মাঝে তোকে ডাক দেব, মেয়ের বাপের ঠিকানা দেব। তুই যতদিন হাতে থাকবি ততদিন আমার লাভ। বিয়ে করলে তো হাত থেকেই গেলি। আমি কি তা বুঝিনে?'

টেলিফোনে কে ডাকল।

'Hallo! Yes, I am Mr Carr বলুন কী করতে হবে। মেয়ের বিয়ে দিতে চান? সে তো আনন্দের কথা। শুভস্য শীঘ্রম—শাস্ত্রেই বলেছে। মেয়েটির রং কেমন? হুঁ। পড়াশুনো? হুঁ। পণ যৌতুক মিলিয়ে কত দান করতে চান? মোটে। হুঁ। হুঁ। হুঁ। আপনারা? হুঁ। কোন শ্রেণি? হুঁ Alright, I'll fix you up. আজ সন্ধ্যার আগে খবর দেব। আপনার ফোন নম্বরটি কত! হুঁ। O K Thank you.'

নম্বরটা টুকে নিয়ে গুনগুন করে গান করতে করতে বেল টিপলেন। 'পিয়ন, সত্য বাবুকো সেলাম দো।' ওই একটিমাত্র পিয়ন, ওই একটিমাত্র কেরানি।

সত্যবাবু কেরানি এলেন। চশমা কপালে তোলা। ধুতির উপর শার্ট, তার কলার নেই, তবু ঘাড়ের উপর একটি stud আছে। প্রৌঢ়, রোগা, ছা-পোষা মানুষ।

'সত্যবাবু, বামুনদের রেজিস্ট্রারখানা নিয়ে আসুন।'

সত্যবাবুর তথাকরণ। কেষ্টবাবু রেজিস্ট্রারের দুই তিন জায়গায় লাল পেনসিলের দাগ দিলেন। তারপর ফোন তুলে নিলেন।

'৫৩২১ (অপ্রকাশ্য)। Hallo, শরৎবাবু বাড়ি আছেন? আমি মিস্টার কার, ম্যারেজ ব্রোকার, যাকে বাংলায় বলে ঘটক।...এই যে শরৎবাবু। একটি ভালো পাত্রী পেয়েছি। রং ধরতে গেলে ফরসাই। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবার আশা আছে। দেওয়া-নেওয়া এই—আজকালের বাজারে—আপনারও তো জানা আছে! একবার দেখতে চান? কখন যাবেন বলুন? আমাকে যেতে হবে? বেশ তো। আমি আরও হাজার খানেকের জন্যে বলে দেখতে রাজি আছি। যদি আমার কমিশনটা ভুলে না যান। শতকরা এক টাকা মাত্র।'

সোম শুনছিল আর মনের রাগে হাসছিল।

'এই হচ্ছে, বাবাজি, আমার কাজ।' কেষ্ট মামা আর এক চক্কর দিয়ে দু-চার বার হাত তুলে স্যাণ্ডো করলেন—বিনা ডাম্বেলে। 'তা তুই তৈরি থাকিস। কলকাতা ছাড়িসনে। সত্যবাবু, কায়স্থদের রেজিস্টারখানা নিয়ে আসুন দেখি।'

দিন চারেক পরে সোম পেল কেষ্ট মামার চিঠি। লিখেছেন, মায়া মেয়েটির নাম। পিকেটিং করে ছ-মাস জেল খেটে ফিরেছে। পাছে আবার ওদিকে ওর মতি যায় সেই ভয়ে বাপ-মা ওকে এই মাসেই পাত্রস্থ করতে ব্যগ্র। বড়োলোক। তোর সঙ্গে যদি হয় তবে আমরাও হব কুটুম্ব। তুই সোজা আমার আপিসে চলে আসিস, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ভবানীপুরে কুমারী মায়া মল্লিকের বাড়ি।

মামা-ভাগ্নে সেই বাড়িতে পৌঁছে বৈঠকখানার পথ খুঁজে পেলেন না—এমনি বিরাট ব্যাপার। একজন বলে, 'কাকে চান? ওঃ! যান, ওইদিকে যান।' আর একজন বলে, 'কিসকো মাংতে হেঁ। বগলমে তল্লাস কিজিয়ে।' তৃতীয় একজন বলে, 'আরে, কুআড়ে যাউছ ম।' (কোথায় যাচ্ছ?)

মহা বিভ্রাট। কেষ্ট মামা বললেন, 'এ বাড়ির একটা নিজস্ব ডাইরেক্টরি থাকা দরকার।'

সোম বলল, 'এবং এক সেট ভাষা শিক্ষার বই।'

এই সময় কে একজন সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোক হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কেষ্ট মামা তাঁর পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, বাংলা বোঝেন?'

'দেখছেন না, মশাই, আমি ডাক্তার? ছাড়ুন, ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।' ভদ্রলোক যে patient নন তাঁর গতির দ্বারা তা প্রমাণ হল।

একজন নরসুন্দর সেই পথ দিয়ে হেলে দুলে চলেছিলেন। কেষ্ট মামা বললেন, 'ও ভাই সাহেব, বলি তুমি তো সবাইকার দাড়িগোঁফের খবর রাখ। এ বাড়িতে ফটিকবাবু বলে কাউকে চেনো?'

'কৌন ফটিকবাবু? যিসকো লড়কী গান্ধীমাঈ বন গই?'

'ঠিক, ঠিক, সোহি।'

'ও ক্যা?' নরসুন্দর আঙুল দিয়ে কাকে বা কোন জিনিসকে নির্দেশ করলেন তিনিই জানলেন। কেষ্ট মামা ও সোম সেই দিকে গিয়ে দেখেন গারাজ।

'নরসুন্দরের চাতুরীর প্রবাদ আছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত আজ প্রত্যক্ষ করা গেল।'—সোম বলল।

'ব্যাটাকে আবার দেখলে চড় দিয়ে দাঁত উড়িয়ে দেব। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি।' বলে কেষ্ট মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলতে থাকলেন।

সেই গারাজের লোক তাঁদের একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবার পরামর্শ দিল, বলল, বাবুরা নীচে নামেন না। কার যে কোন মহল তা উপরে খোঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যাবে।

ফটিকবাবু বললেন, 'আপনারা সোজা তেতালায় চলে এলেন না কেন? আমরা তো ভেবে আকুল। ইনিই পরম কল্যাণীয় কল্যাণ? দেখে সুখী হলুম। ওদেশ থেকে কবে আসা হল?'

সোম এর উত্তর দিল। অমনি আরও কত মামুলি প্রশ্নেরও। কেষ্ট মামা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা ফলাতে থাকলেন। দেখতে দেখতে বাবুর মোসাহেবদের মুখ ছুটল। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন দেখি, সার, ওদেশের ঝি-চাকর কি এই দেশ থেকে গিয়ে বসবাস করছে, না-আফ্রিকা থেকে? ...কী বললেন? ওরাও সায়েব? অ্যাঁ! ঝি-চাকর সাহেব-মেম!'

আর একজন সবজান্তার মতো মন্তব্য করলেন, 'কেমন? আমি বলিনি ওকথা? সিনেমায় যা দেখায় তা নেহাত যা-তা নয় হে। ওদের সমাজের জ্বলজ্বলে ছবি।'

সোম বলল, 'আপনি ওঁর চেয়ে আরও ভুল করলেন।'

তাই নিয়ে সোমকে অনেকক্ষণ বকবক করতে হল। এক পেয়ালা চায়ের অভাবে তার গলা যখন শুকিয়ে এসেছে তখন তিনটে চাকরের ছয় হাতে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করে তাদের পিছু পিছু এল মায়া। সে জেলে ছয় মাস কাটিয়েছে বলে কায়া তার শীর্ণ শুষ্ক রুগ্ন নয়। বরঞ্চ তার নিটোল অঙ্গ অনাবশ্যক মেদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেনি। তার চক্ষু অসাধারণ দীপ্ত। কিন্তু চপল নয় তার চরণ। আপনি সে সংহত। কিন্তু ঢেউ ওঠে তার চতুর্দিকে।

চাটুকারেরা বলাবলি করল, 'আগুনের ফুলকি। জেলে মন পড়ে আছে।'

'জানো না বুঝি, সার্জেন্টের ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'শুধু দাঁড়ায়নি, লাগাম ধরেছিল।'

'নাম মায়া, কিন্তু প্রাণের মায়া নেই।'

'কিসের মায়াই বা আছে? ঐশ্বর্যের? গৃহের?'

'যা বলেছ, এমনটি দেখা যায় না।' 'নকল অনেক হয়েছে, কিন্তু আসলের ধার দিয়েও যায় না।'

মহিলাকে সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যে সোম আসন ছেড়ে দাঁড়াল। মায়া তার কাছে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৈলাতিক সম্ভাষণ করল ও তার পাশের চেয়ারে বসল।

সোম বলল, 'আপনি ও আমি প্রায় এক সময়েই বাড়ি ফিরেছি, যদিও এক জায়গা থেকে নয়।'

মায়া বলল, 'কদিনের জন্যে ফেরা আমার! আবার তো যাচ্ছি।'

ফটিকবাবু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তোর না-হয় প্রাণের মায়া নেই, আমাদের তো সন্তানমায়া আছে।'

চাটুকারগণ ব্যস্ত হয়ে গুঞ্জন করল। সেইসঙ্গে ভুঞ্জনটাও চলছিল পরিপাটি রূপে।

'আমিও', সোম হেসে বলল, 'ঘুরে আসব ভাবছি। কাজকর্মের বাজার যেমন মন্দা, গভর্নমেন্টের ভাত থাকতে ঘরের ভাত খাই কেন? তবে ছুটন্ত ঘোড়ার সুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সত্যি বলছি আমার সাহসে কুলাবে না।'

'আমি বুঝি দু-বেলা তাই করে বেড়াই?' মায়া বলল স্তোক দিয়ে।

'দু-বেলা দূরে থাক, জীবনে একবারও আমি পারব না।'

'আমিও কি দ্বিতীয়বার পারব ভেবেছেন? আর লোকে যতটা বাড়িয়ে বলে ততটা নয়।'

চাটুকারেরা বললেন, 'কী বিনয়! সাধে কী লোকে বলে গান্ধীমায়ী!'

কেষ্ট মামা এতক্ষণ খাদ্যবস্তুর শ্রাদ্ধ করছিলেন। সব কথা শোনেননি। একটা কিছু বলতে হয়, তাই বললেন, 'ঘোড়ায় চড়তে পারো তো মা?'

মায়া বিষম অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নীচু করল। ফটিকবাবু বললেন, 'ওর দোষ নেই, আমিই ও-শিক্ষা দিইনি।'

মোসাহেবরা বললেন, 'তাতে কী?'

'দোষটা কীসের?'

এবার স্তোক দেবার পালা সোমের। সে বলল, 'ঘোড়ায় চড়তে যে সে পারে, আমিও। কিন্তু ছুটন্ত ঘোড়ার সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন বিলেতের সাফ্রেজটরা আর পারেন বাংলার আপনি!'

মায়া কৃতজ্ঞ হয়ে লজ্জা চেপে বলল, 'এটা কিন্তু অত্যুক্তি।'

সেদিন কথাবার্তা হল প্রচুর, কিন্তু কেউ কারুর নতুন বা গভীর কোনো পরিচয় পেল না। ওঠবার সময় সোম বলল, 'আমার বন্ধুদের বাড়ি একদিন চা খেতে আসুন।'

মায়া বলল, 'দেখলেন না, চা আমি খাইনে? অভ্যাস গেছে, আবার করলে আবার যাবেও।'

'তাহলে এমনি বেড়াতে আসুন। এত বড়ো বীরাঙ্গনার দর্শন পাবার জন্যে ওরা সবাই আগ্রহ বোধ করবে। না করলে ওদের ওপর আমি এমন রাগ করব।'

কেষ্ট মামা ভরা-পেটে বললেন, 'বাস্তবিক, আমার এত বড়ো কারবার, কত পাত্রী নাড়াচাড়া করতে হয়, কিন্তু ওরা সবাই অঙ্গনা, কেউ বীরা নয়। এতদিনে কুমারী মায়া মল্লিক আমার ব্যবসায়ী জীবন সার্থক করলেন। ওরে ভজা, তুই আর দ্বিধা করিসনে, আমি জাহ্নবীদাকে লিখি যে ছেলের পছন্দ হয়েছে, ছেলের মামারও—মা তো নেই, ধরে নিতে হয় যে মামাই এক্ষেত্রে মা, দুগ্ধাভাবে ঘোলং দদ্যাৎ—এখন ছেলের বাপ 'হাঁ' বললেই বাকি থাকে মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ।'

মোসাহেবরা বললেন, 'সে আমরা জানি আর জানেন ফটিকদা।'

ফটিকবাবু বললেন, 'ফটিক শুধু চান সঠিক খবর যে তাঁর বড়ো মেয়ে মায়া ঘোড়ার পায়ে না পড়ে মানুষের হাতে পড়েছে।'

মায়াকে সোম একান্তে বলল, 'তা হলে?'

মায়া চোখ নামিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

'আসুন কেষ্ট মামা', সোম পা বাড়িয়ে বলল, 'ওসব পরে হবে। মায়া দেবীকে যে জেলে যেতে দেওয়া হবে না অন্তত কিছুদিন এই আপাতত যথেষ্ট।'

পথে কেষ্টমামা সোমকে ভর্ৎসনা করলেন। 'তুই কেন দেরি করছিস, বল তো? আমি কারবারী মানুষ, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে অমন মাল আমি কোনোদিন নাড়াচাড়া করিনি, বিশ্বাস হল না? দেখলি তো কত বড়ো বাড়ি, তিন তিনখানা মোটর, ঝি-চাকর অগুণতি, মোসাহেবই বা কত! অর্ধেক রাজকন্যা—না, না অর্ধেক রাজত্ব—ফটিকবাবুর অংশের আট আনা তুইই তো একদিন পাবি, ওঁর যদি ইতিমধ্যে পুত্রসন্তান না-হয়।'

'জমিদার বুঝি?'

'নয়? দেশ ওদের রংপুর জেলায়। এক তামাক থেকে ওঁদের আয় কত! আমার ক্লায়েন্ট তা না-হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোর মতো বহু যোগ্য পাত্রের দরখাস্ত পেত। তোকে কি এতটা সমীহ করত রে ভজা?'

সোম বলল, 'আমি দরখাস্তই করতুম না।'

মামা বললেন, 'সেই ভজাই আছিস। সংসারের তুই বুঝিস কী? সংসার কেবল একটি অক্ষে ঘুরছে—নাম তার টাকা। সেই টাকার জন্যে মানুষ না করছে কী! আর তুই করবিনে বিয়ের দরখাস্ত! যাক, তোকে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে না। আমি একরকম সব গুছিয়ে এনেছি। এখন তোর মত হলেই আমি কমিশন যা পাব তুই নাই-বা জানলি। ওসব কনফিডেনশিয়াল!'

'কিন্তু', সোম বলল, 'কংগ্রেসি মেয়ে আমি বিয়ে করতে চাইলেই বাবা অমনি রাজি হয়ে যাবেন ওটা তোমার ভুল ধারণা, কেষ্ট মামা। ওঁকে এখনও সরকারি চাকরি করে খেতে হয়, সরকারি পেনসন ওঁর শেষ বয়সের ভরসা, আর আমাকেও সরকারি চাকুরে করবেন বলে ওঁর তদ্বিরের ত্রুটি নেই।'

কেষ্ট মামার উৎসাহের তেজ মুহূর্তে নিভে গেল। ট্যাক্সিও মেসের নিকটবর্তী হয়েছিল। তিনি নেমে পড়ে বললেন, 'গুড বাই, ভজা।'

মায়া বলেছে আসবে। কিন্তু সত্যি আসবে কি না, এলেও সোমের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিবিড়তর হবে কি না, যে পুরুষ সরকারি চাকরি পেলেও পেতে পারে তাকে বিয়ে করবে কি না, বিয়ে করলে কংগ্রেসের কাজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে কি না—এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সোম পৌঁছে গেল।

ললিতাকে বলল, 'কাকে দেখে এলুম ও ডেকে এলুম জানো? মায়া মল্লিক!'

ললিতা থমকে দাঁড়াল। বলল, 'সর্বনাশ। ও মেয়েকে সামলাতে পারবে?'

'তুমি চেনো ওকে?'

'সাক্ষাৎভাবে না-হোক পরোক্ষে।'

'আমার তো বিশেষ শ্রদ্ধা হল ওর উপর। দেখা যাক তোমার কী হয়!'

ললিতা বলল, 'তুমি যাকে বউ করবে সেই হবে আমার বউদিদি, তাকেই করব ভক্তি। কিন্তু মায়া মল্লিক কি বউমানুষের মতো ঘরে চুপ করে থাকবে?'

সোম বলল, 'কে বলছে তাকে গৃহলক্ষ্মী হতে! সে যা হতে চায় তাই হোক, মেকি না হলেই হল। ভণ্ডামি ছাড়া আমি বোধ হয় আর সব সইতে পারি, ললিতা।'

'কী জানি বাপু, আমি অত বুঝিনে। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের মতো না-দেখলে আমার মাথা বিগড়ে যায়।'

কুণাল বলল, 'কল্যাণ যা বলছে তা তোমার প্রতিপক্ষের কথা নয় গো, তোমারই কথা। মেয়েমানুষ যদি খাঁটি হয় তবে মেয়েমানুষই থাকে, দেখতে যারই মতো হোক। ঘোমটার আকার মেপে যদি নারীত্ব নির্ণয় করতে হত তবে তুমিই তোমার ঠাকুরমার চেয়ে নারীত্বে খাটো হতে।'

'যাও', বলে ললিতা তর্কে ভঙ্গ দিল। 'শোনো, ললিতা শোনো', সোম তাকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে বলল, 'আমার একটু উপকার করতে হবে। মায়ার সঙ্গে যাতে আমার নিভৃত আলাপ হয় তার কৌশল তোমরা চিন্তা করো। তার সঙ্গে যদি আসেন কোনো মহিলা তবে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে ভুলিয়ে পাশের বাড়িতে। আর যদি কোনো পুরুষ আসেন তবে কুণাল যেন তাঁকে জমিয়ে রাখতে পারে।'

কুণাল বলল, 'ওবাড়ির গল্প-দাদাকে নিমন্ত্রণ করলে ভাবনা থাকে না। ভদ্রলোক যা তিব্বতের গল্প করেন, না-শুনলে বিশ্বাস করবে না, শুনলেও বিশ্বাস করবে না।'

ললিতা বলল, 'মায়াকে ও তোমাকে এক ঘরে রেখে যাওয়া সম্ভব হলেও সংগত কি না তাই প্রশ্ন। হয়তো তুমি আদর করে কিছু বলবে আর সে অমনি তোমার জিব উপড়ে নেবে।'

সোম বলল, 'না, না, যতটা শুনেছ ততটা অরসিক সে নয়। রসের নিবেদন স্থান-কাল ও নিবেদকের ব্যক্তিত্ব অনুসারে সাড়া পায়। আমি পটীয়ান ব্যক্তি, আমার জিব আস্ত থাকবে, ভয় নেই।'

মায়ার সঙ্গে এল তার বোন ছায়া আর তাদের অভিভাবকরূপে এলেন তাদের বাড়ির সরকার মশাই। সরকারের যা বিদ্যার দৌড় তিব্বত তার মানসিক ভূগোলে দেশ কি পর্বত তার ঠিক নেই। গল্পদাদা তাকে বৃথাই শোনালেন যে, 'মশাই, আমার তিব্বতি বন্ধু বিদেশে যাবার সময় তার বউমাকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, ভাই এ তোমারও।' সরকার খাপ্পা হয়ে বলল, 'আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার মুখে এসব কী কথা। রামঃ রামঃ।' দাদা বললেন, 'ওহে ওটা যে পঞ্চপাণ্ডব ও এক দ্রৌপদীরদেশ।'

যাহোক সরকারকে নীচে আটকে রাখা গেল। এদিকে ছায়া কি সহজে দিদির কাছ থেকে নড়তে চায়? বছর তেরো চোদ্দো বয়স তার, দিদির স্বেচ্ছাদাসী। এমন দিদি কার আছে? ললিতা তাকে পরিশেষে খোকা-কল্যাণের দ্বারা আকর্ষণ করল। খোকার কী জানি কেন তাকেই পছন্দ হল বেশি। 'এসো, এসো, এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তুমি বুঝি খুব পড়ো? তোমার চোখে এই বয়সেই চশমা' ইত্যাদি পাকা পাকা কথা বলে খোকা তো নিয়ে গেল তার শাড়ি ধরে টেনে।

সোম বলল, 'মায়া দেবী, জেলে কি আপনি সত্যি আবার যেতে চান?'

মায়া বলল, 'কী করব বলুন। জেলের বাইরে আমি বন্দিনী, জেলেই আমি মুক্ত। বাড়িতে আমি নিজের হাতে এক গ্লাস জল খাব তার জো নেই—দশটা চাকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে। লেখাপড়া করতে চাই, দু-বেলা আধডজন প্রাইভেট টিউটার হাজিরা দেন। কোথাও যাব—সঙ্গে লোকলস্কর, হই চই উপদেশ, পরামর্শ, তোষামোদ। জেলে আমি গোটাকয়েক নিয়ম মেনে নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট।'

'কিন্তু মায়া দেবী', সোম ব্যথার ব্যথীর মতো বলল, 'জেল তো কারও চিরদিনের নয়। এমন দিন আসবেই যে দিন মেয়েরা দলে দলে তীর্থযাত্রীর মতো কারার পথ ধরবেন না। তখন আপনার কী গতি হবে?'

'সেটা ভাবিনি।'

'সেইটে ভাবুন।'

'দেখুন, বাইরে যতক্ষণ থাকি দেশের কত দাবি। চাই অন্ন, চাই স্বাস্থ্য, চাই মুক্ত বায়ু,—কিন্তু এ চাওয়া মেটাবে কে? আমারই কানে এসে বাজে, প্রাণে পীড়া লাগে, কিন্তু কী আমার ক্ষমতা! মোটে তো দুখানি হাত।'

সোম হেসে বলল, 'হাত রাখেও যেমন মারেও তেমনি। দু-খানা হাত নিয়েই ইউরোপের লোক যা লড়াই করছে তা বনের চতুষ্পদের অসাধ্য। আপনি কী করবেন কে জানে।'

'সত্যি!' মায়া বলল, 'ক্ষমতা যার অল্প মমতা তার বেশি হওয়া উচিত নয়—ভগবানের ভুল।'

'ভগবান তো এও চেয়েছেন', সোম বলল, 'যে, মমতা যাদের বেশি তারা রইবে ঘরে আর ক্ষমতা যাদের বেশি তারা বইবে বাইরের ঝুঁকি। মেয়ে-পুরুষে ওই যে অধিকারীভেদ ওটা মানলে তো ভগবানের ভুল ধরতে হয় না।'

'কিন্তু কই', মায়া এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'ছায়া কোথায় গেল?'

'তিনি', সোম বলল, 'এখন নিরাপদ দূরবর্তিনী।' তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু নিভৃত আলাপের আবশ্যক আছে।'

মায়া সচকিতভাবে বলল, 'ছায়া থাকলে ভালো হত না?'

'কিছুমাত্র না। Two is company, three is a crowd.'

মায়া চুপ করে বসে দেয়ালে কুণাল-ললিতার ফোটো নিরীক্ষণ-করণে মন দিল।

সোম বলল, 'মায়া দেবী, জেলে আবার নাই গেলেন?'

মায়ার চুড়িগুলো কনকনিয়ে উঠল। কিন্তু মুখ ফুটল না।

‘জেল আপনার যে কারণে ভালো লাগে ঘরও ভালো লাগবে সেই কারণে, অধিকন্তু বাইরের সঙ্গে তার যোগ থাকবে অবারিত।’

‘সে তো এখনও আছে,’ মায়া কড়াসুরে বলল।

‘এখন যা আছে,’ সোম সহিষ্ণুভাবে বলল, ‘তাতে আপনার প্রকৃত কর্তৃত্ব নেই, আছে প্রভূত মান। যা হতে পারে তা ঠিক এই জিনিস নয়।’

মায়া সশব্দে হেসে বলল, ‘সোজা কথায় বলুন। অত আকার ইঙ্গিত কেন? আমি কি কালা, না আপনি বোবা?’

‘এই তো চাই।’ সোম হৃষ্ট হয়ে বলল, ‘আমার গৃহিণী হবেন?’

‘আপনার কাছে কী পাব?’ মায়া ফস করে জিজ্ঞাসা করল।

‘আর যাই পান টাকা দিয়ে যেসব সুবিধা কেনা যায় সেসব পাবেন না।’

‘বাঁচা গেল। তারপর?’

‘পাবেন একটি পরিশীলিত বিদগ্ধ মন—বহুদেশ দর্শনে যার যাবতীয় কোণীয়তা—angularities—ঘর্ষিত হয়েছে।’

‘অমন মনের প্রতি আমার লোভ আছে। তারপর?’

‘তারপর! কী, আপনি কেবল মন নিয়ে সন্তুষ্ট নন এত বড়ো আধ্যাত্মিক দেশের নারী হয়েও!’

মায়া অপ্রতিভ হয়ে নীরব রইল।

‘জানতে যখন চাইলেন তখন শুনুন। অবশ্য না-জানতে চাইলেও শোনাতুম।’

মায়া উৎকর্ণ হয়ে আরক্তবর্ণ হল।

সোম বলল, ‘আর পাবেন একটি অনুশীলিত অভিজ্ঞ দেহ।—’

মায়া শিউরে উঠল।

‘শিউরে উঠলেন যে বীরাঙ্গনা। দেহ কথাটা এতই অশ্লীল? যদি বলতুম পাঁচ বছর ধরে অম্বলের ব্যারামে ভুগছি, এদিকে মাথাধরাও অনিত্য জীবনে নিত্য সত্য, পায়ে বাত, পিঠে বিষফোঁড়া তাহলেও তো সেই দেহের কথাই হত। কিন্তু আপনি শিউরে উঠতেন কি? ব্যাধিজীর্ণ বিষাক্ত দেহ বলিনি, বলেছি অনুশীলিত অভিজ্ঞ দেহ।’

মায়া জিজ্ঞাসা করল, ‘তার মানে?’

সোম থেমে থেমে বলল, ‘দেখুন, প্রথমে আমার কাছে সত্য করুন যে আমার মতো সামান্য প্রাণীকে—আমি ঘোড়াও নই, সার্জেন্টও নই—বাধা দেবেন না, আমার কথার মাঝখানে উঠে যাবেন না, ছায়াকে ডেকে নির্জনতাকে জনতায় পরিণত করবেন না।’

‘কী সাংঘাতিক শপথ!’ মায়া মৃদু হেসে শপথ পাঠ করল।

‘এরূপ ক্ষেত্রে করমর্দনের ও কিঞ্চিৎ পানের বিধি আছে। আপনি কি অন্তত করমর্দনও করবেন না?’

মায়া ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। সোম তাতে এমন বিপুল ঝাঁকুনি দিল যে বালাতে চুড়িতে জলতরঙ্গ বাজল।

সোম তর্জনী আস্ফালন করে বলল, ‘সত্য রক্ষা করবেন, ভুলবেন না!’

মায়া টিপে টিপে হাসতে থাকল।

‘মায়া দেবী’, সোম সাড়ম্বরে আরম্ভ করল, ‘মেয়ে-পুরুষে তফাতটা বাস্তবিক কীসে? আত্মায় নয় নিশ্চয়। আপনার আত্মা স্ত্রী-আত্মা আর আমার আত্মা পুরুষ আত্মা এ আমি অস্বীকার করি, আপনিও—’

‘আমিও অস্বীকার করি।’

'তাহলে হয়তো মনে। কিন্তু মন তো দেহের শামিল। আমার মনটা পুরুষের মন। এর অর্থ এমন নয় যে আমার মনটা পুরুষের বলে আমি পুরুষ। এর অর্থ আমি পুরুষ বলে আমার মনটা পুরুষের। আমি পুরুষ, সে কেবল আমার দেহ পুরুষের বলে। তেমনি আপনি নারী আপনার দেহ নারীর বলে।'

মায়া আবার শিউরে উঠল। এবার অগোচরে।

'তাহলে', সোম বলল, 'দেহই আমাদের ভিন্ন করেছে।'

মায়া বলল, 'সমস্তটাকে অমন বিশ্লেষণ করা আমার মতে অনুচিত। আমি সব জড়িয়ে নারী, আপনি সব জড়িয়ে পুরুষ।' এইটুকু বলে সে শরমে অরুণ হল।

'আপনাকে', সোম বলল, 'একটু আগে আমি বলেছি আমার গৃহিণী হতে। যদি আপনি তাই হন ও আমাদের একটি সন্তান হয় তবে তার জন্মমুহূর্তে সকলে যখন জানতে চাইব খোকা হল না-খুকী হল তা নির্ণয় করবার কী উপায়?'

মায়া লজ্জায় নিরুত্তর। তার উজ্জ্বল চোখ দুটি দিয়ে চুরি করে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। কিন্তু কেউ আড়ি পেতে শুনল কি না কে জানে।

সোম হাসিমুখে বলল, 'আর একটা উদাহরণ দিই। মা-বাপ যখন স্থির করেন যে এই বেলা বিয়ে না-দিলে নয়, মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, নইলে লোকে নিন্দে করবে তখন কি পিতামাতা বা সমাজ কন্যার আত্মার পরিণতি পরখ করেন? আত্মা তো অজরামর। না মনের পরিণতির খবর নেন? বর্ণপরিচয় পড়া বোকা মেয়ের বাপ ও ম্যাট্রিক পাস করা বুদ্ধিমতীর বাপ কেউ কি কারুর চেয়ে কম ভাবনায় পড়েন মেয়েকে পাত্রস্থ করা নিয়ে? বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তারপর যতখুশি পাস করুক, একথা কি যত্রতত্র শোনেননি, মায়া দেবী?'

মায়া মুচকে হেসে বলল, 'শুনেছি।'

'তবে?' সোম জয়ের গর্বে বলল 'তবে? আমার দেওয়া দুটো দৃষ্টান্ত মিলিয়ে ধরুন। স্ত্রী পুরুষকে জন্মকালে ভিন্ন করে দিল প্রকৃতি—কীসের দ্বারা? না দেহের দ্বারা। যৌবনকালে যুক্ত করে দিল সমাজ—কীসের দ্বারা না দেহেরই দ্বারা। জন্মত আমরা স্ত্রী এবং পুরুষ না-হলে বিবাহের কি কোনো আবশ্যকতা থাকত, না সম্ভাব্যতা থাকত? আর স্ত্রী ও পুরুষ হয়ে যে জন্মিয়েছি তার নিদর্শন আমাদের আত্মায় আছে, না মনে আছে?'

মায়া ভাবতে লাগল আনত আননে।

'ভাবছেন কি মায়া দেবী', সোম বলল। 'নিন একটা সিগ্রেট নিন। নেবেন না? বিলিতি নয়, ইটালিয়ান। দোষ হবে না।'

মায়া দৃঢ়ভাবে বলল, 'না।'

'না? চাও খাবেন না, সিগ্রেটও না। অতিথি হিসেবে আপনি অতি নির্দয়। আপনাকে দিতে পারি এমন খাদ্য আর কী আছে—এক আছে 'চ' দিয়ে আরম্ভ দুই অক্ষরের শব্দ, অথচ 'চড়' নয়।'

মায়া কোপদৃষ্টি হানল। সোম ভুরু উঁচিয়ে জিব কাটল।

'কিন্তু,' সোম বলল, 'আমার কথাটি ফুরোয়নি, নটে গাছটি মুড়োয়নি। বলছিলুম দেহ শব্দের মানে। আশা করি বুঝেছেন যে দেহের মানে বিয়ের একমাত্র উপকরণ।'

'বুঝেছি,' মায়া বলল। 'কিন্তু মানিনে।'

'জানিনে আপনি কী মানেন। হয়তো অলংকার, হয়তো বস্ত্র, হয়তো সানাই, হয়তো মন্ত্র।'

'এগুলোর কোনোটা নয়।'

'তবে?'

'মনের মিল।'

‘ওইটে,’ সোম বলল, ‘আধুনিকদের কুসংস্কার। মনের মিলই যদি বিয়ের কারণ হয় তবে চোখের আড়াল হলে এত বেদনা কেন? বিরহ তবে নিরর্থক। মনের মিল বিয়েরই বা কারণ হবে কেন? দুই পুরুষ বন্ধুতে দুই মেয়ে বন্ধুতে মনের মিল লক্ষ করা যায়।’ তারা কি বিয়ে করে?

মায়া পরাজিত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

তার আর ভালো লাগছিল না এই বক্তৃতা, কিন্তু কথা দিয়েছে সবটা শুনবে।

বিজেতা বলল, ‘দেহ, দেহ, দেহ। সংস্কৃত কবিরা তা মানতেন। আপনি কবি না হতে পারেন কিন্তু সংস্কৃত হবেন না কেন? সংস্কৃত হয়েও আধুনিক থাকা যায়।’

বিজিতা বলল ‘আমি উঠি?’

‘না, না, বসুন। এখনও একটা শব্দের মানে বলা হয়নি।’

‘অভিজ্ঞ দেহ’। দেহের মানে বলেছি। বাকি আছে অভিজ্ঞ।’

মায়া মনোযোগ করল।

‘দেহই যখন উপকরণ তখন সব জিনিসের মতো তার ইতরবিশেষ আছে। অভিজ্ঞ দেহ দেহান্তরকে কোমল লীলার সহিত ধারণ করে, যেমন গুণীর হাত ধরে বীণাকে। অভিজ্ঞের স্পর্শ নিশ্চিত, অকম্পিত, স্বচ্ছন্দ। অভিজ্ঞ হচ্ছে রসোত্তীর্ণ, তার লোভ নেই, উদ্বেগ নেই, শঙ্কা নেই। সে ভুল করে না। সে জানে, বোঝে, ক্ষমা করে।’

মায়া ব্যঙ্গ করে বলল, ‘আমি জানলুম না, বুঝলুম না, ক্ষমাও করলুম না। কী আবোল-তাবোল বকছেন, মিস্টার সোম? আমি উঠি।’

সোম রহস্য করে বলল, ‘তার থেকে ধরা পড়ল আপনি অনভিজ্ঞ।’

‘বেশ, আমি অনভিজ্ঞ। আমরা বিলেতও যাইনি, অভিজ্ঞ হইনি। তা নিয়ে উপহাস করতে চান, করুন বসে। আমি কিন্তু উঠি।’

‘আরে, আরে, ভালো করে না-শুনে, না-বুঝে অমনি রাগ করা হল। অহিংস অসহযোগীদের কি রাগ করা সাজে? বসুন, মায়া দেবী, বসুন।’

ছায়া অনেকক্ষণ গেছে, ফিরছে না কেন? সরকার মশাইয়ের দরকার মায়াকে ওঠাবার তাগাদা দেওয়া, কিন্তু তিনি তিব্বতের গল্প শুনে চীনের সেচুয়ান প্রদেশের বিপ্লব কাহিনিতে মনোনিবেশ করেছেন। একজন মুসলমান বণিক তাঁর একমাত্র কন্যা ও বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সমেত গল্পদাদার Consulate-এ উপস্থিত হয়ে বললেন, জনাব, জান বাঁচান। অবশ্য চীনা ভাষায়। যেহেতু মুসলমানটি হিন্দুস্থানের নন, চীনের। দাদা তাঁদের দুজনকে ও তাঁদের সোনার ঘড়াগুলিকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন যে চীনে ব্যাটারা তাঁর দাড়িটি দেখতে পেল না। বিপ্লবের অন্তে বণিক বলললেন, সাহেব,—দাদার তখন সাহেবি পোশাক, Consulate এর বড়োবাবু—যে উপকার করলেন তার বিনিময়ে আপনাকে কী দেব? দাদা বললেন, কিছুই দিতে হবে না। বণিক বললেন, তা কি হয়? আপনি আমার এই কন্যারত্নটিকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আমাকে ও আমার সোনার ঘড়াগুলিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে চলুন; চাকরি আপনাকে করতে হবে না। দাদা হচ্ছেন গোঁড়া কায়স্থ, এখন যেমন, তখনও তেমনি। বণিককে বললেন, আমার যে দেশে একটি আছেন। বণিক দাড়ি নেড়ে বললেন, অধিকন্তু ন দোষায়—অবশ্য দেবভাষায় নয়। বণিক এবং বণিককন্যা দুজনেই দাদাকে কত কাকুতিমিনতি করলেন, কিন্তু দাদার নামগৌরীশংকর।

সরকার মশাই বললেন, ‘মশাই, অতগুলো টাকা!’

‘কেন আপনার আফশোস হচ্ছে নাকি?’

‘হবে না? বিয়ে না-করলেন, রাখতেও তো পারতেন।’

‘ওরে বাপরে! কোন দিন জল তেষ্টায় অন্ধ হয়ে তার হাতে জল খাই আর ফুড়ুত করে জাতটি উড়ে যাক! আমার বাপ-মা-কে গয়ায় পিন্ডি দেবে কে? আপনি?’

কোন কথা থেকে কোন কথা উঠল। কুণাল হল যারপরনাই লজ্জিত।

হঠাৎ একটা গুরুভার পতনের শব্দ শুনে সরকারের হল কম্প, দাদা দিলেন লম্ফ। কুণাল ক্ষণবিলম্ব না-করে উপরে ছুটল। 'কী হল,' 'কী হল' বলে ওদিক থেকে ললিতা ছায়া ও পাশের বাড়ির জন কয়েক বেরিয়ে এলেন।

কুনাল দেখল সোমের চেয়ারটা চারটে পায়া তুলে দিয়ে ছটফট করছে, সোম ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে গিয়ে পড়ছে। মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্ত। মায়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে খোলা চোখে ধ্যান করছে।

কুণাল সোমকে উঠিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কী হয়েছে, কল্যাণ? কী হয়েছে?'

সোম কথা বলতে পারছিল না। মায়ার দিকে তাকিয়ে কষ্টের হাসি হাসল।

'কী হয়েছে, কল্যাণদা, কী হয়েছে?' একই প্রশ্ন ললিতার মুখে।

সোম মাথা নেড়ে জানাতে চাইল কিছুই হয়নি।

পাশের বাড়ির মহিলারা বললেন, 'ওঁকে ও-ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিন, ডাক্তারের জন্যে আমরা ফোন করছি।'

ছায়া দিদির কাছে গিয়ে দিদির গা ঘেঁসে দাঁড়াল। দিদি বলল, 'চল, যাই।'

ললিতা কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। গম্ভীরস্বরে মায়াকে বলল, 'ও কী! কিছু মুখে দিয়ে যাবেন না?'

মায়ার রাগ হচ্ছিল ললিতার উপর, সে কেন মায়াকে সোমের সঙ্গে একা রেখে গেল। উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। তরতর করে নেমে গিয়ে মোটরে চেপে বসল। ছায়া ললিতাকে নমস্কার করল। বলল, 'আসবেন একদিন আমাদের ওদিকে।' খোকা-কল্যাণকে চুমু খেয়ে বলল, 'তুমিও এসো, জ্যাঠামশাই।'

গাড়ি যখন চলল ছায়া জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, কী হয়েছিল বলো তো?'

'কিছু না।'

'কিছু হল না তো মিস্টার সোম গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন কেন?'

'আমি জানিনে। তুই ছেলেমানুষ, তোর জানবার দরকার?'

'ছেলেমানুষ বই কী। তুমি ওঘরে ছিলে, তুমি জানো না কী রকম।'

'বেশ জানি তো জানি। তুই আমাকে জেরা করবার কে?'

'বলো না ভাই, লক্ষ্মীটি।'

মায়া দৃঢ়তার সহিত বলল, 'না।'

ছায়া যদি চুপ করল সরকার মশাই মুখ খুললেন। 'কীসের শব্দ রে, মা? আমি তো ভাবলুম বোমা ফাটল না-কী হল।'

মায়া বলল, 'মিস্টার সোম চেয়ারশুদ্ধ পড়ে গেলেন, তারই শব্দ, সরকার কাকা।'

'আহা। পড়ে গেলেন। লাগেনি তো?'

'যার লাগে সেই জানে। আমি কেমন করে বলব?'

'আহা! বড়ো ভালো ছেলেটি।'

'ভালো না আর কিছু।'

সরকার মশাই চুপ করলেন।

ওদিকে গল্পদাদা কুণালকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'চোট লাগেনি তো?'

'লেগেছে একটু।'

'পরিতাপের বিষয়। আমারও একবার অমন হয়েছিল। আমি তখন সিকিমে। চেয়ারে বসে চিন্তা করছি। পা দুটি দিয়েছি তুলে টেবিলের উপর। একটু দোল খাচ্ছি পা দিয়ে টেবিলটাকে ঠেলে, চেয়ারের পিছনদিকের পায়া দুটোর উপর ভর দিয়ে। দোল খাচ্ছি আর ভাবছি। ভাবছি আর দোল খাচ্ছি। আরাম লাগছে। হঠাৎ শুনি দুড়ুম করে একটা আওয়াজ। বন্দুকের নয়। চেয়ারের। আমার পিঠটা ফুটবলের মতো ঢপ করে পড়ল,

আবার উঠল, আবার পড়ল। পা দুটো বাদুড়ের মতো উপরের দিকে তোলা। নামল যখন, তখন আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম আমি উঠে দাঁড়িয়েছি ডিগবাজি খাওয়া জাপানি পুতুলের মতো।'

দিন দুই পরে সোম মাথায় ফেটি বেঁধে অর্ধশয়ান অবস্থায় কুণাল ও ললিতাকে বৃত্তান্তটা আনুপূর্বিক শোনাচ্ছিল।

ললিতা শুনে বলল, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল। আমি কি তোমাকে সাবধান করে দিইনি?'

সোম বলল 'আমি তো ওকে আদরের কথা বলিনি, আদরও করিনি। আমি বলছিলুম নারীদেহ আমার নিকট অজ্ঞাত রাজ্য নয়, আমি দেশাবিষ্কারক, explorer. অমনি আমার কপাল টিপ করে নারীহস্তের অশিক্ষিতপটু এক ঘুষি। দেশ আবিষ্কারক আমি ভূপৃষ্ঠ আবিষ্কার করলুম।'

'বেশ হয়েছে।'—বলল ললিতা।

'তুমি সবাইকে নাকাল করলে, কিন্তু মায়া তোমাকে হাটিয়ে দিল।'—বলল কুণাল।

'ইংরেজের ইতিহাস', সোম বলল, 'তুমি পড়েছ ও পড়িয়েছ। তার কোনোখানে দেখেছ যে ইংরেজ কোনো যুদ্ধে হেরেছে? আমিও তেমনি অপরাজিত। মায়ার হাতের মার তো আমার জয়ের মালা। হার যদি তাকে বলো, তবে সে আমার সোনার হার।'

'তুমিও ওরকম হার পরবে কি গো?' ললিতা শুধাল তার স্বামীকে।

'প্রিয়ে তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়।' কুণাল দিলীপকুমার রায়ের শরণ নিল।

'কিন্তু মায়া তো দাদার প্রিয়া নয়', বলল ললিতা।

'কেন নয়?' বলল সোম।

'সবে দুবার দেখা—তাতেই এত?'

'প্রেম কি দুবার দেখার অপেক্ষা রাখে? Whoever has loved that has not loved at first sight? আমার তৃতীয়ার কাহিনি তো জানো। দেখা না হতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা।'—অথ সোম।

'বরং বলো দেখা না হয়েই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেখা হলে প্রেমের প্রতিপরাকাষ্ঠা, anticlimax'—অথ কুণাল।

'তাহলে মায়া তোমার প্রিয়া। কয় নম্বর?' শুধাল ললিতা।

'পাগল?' বলল সোম। 'আমি কি এতবার ঠেকে এইটুকু শিখিনি যে যাকে ভালোবাসা যায় তাকে বিয়ে করা যায় না, যাকে বিয়ে করা যায় তাকে ভালোবাসা যায় না।'

কুণাল ও ললিতা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তাদের মনে আঘাত লাগল। সোম বুঝল।

বলল, 'তোমরা যদি বিয়ের খাঁচায় ভালোবাসাকে পুষতে পারো, বন্ধু, তবে তোমরা অসাধ্য সাধন করলে, তোমরা মানবকুলের নমস্য। আমি প্রেমের সঙ্গে বিবাহের সংগতি কোনোমতেই ঘটাতে পারলুম না বলে ওদুটোর একটাকে বেছে নিয়েছি—বিবাহকে! তাই সুলক্ষণাই বলো মায়াই বলো যাদের প্রতি খুব সম্প্রতি আমার হৃদয়ে আবেগ অনুভব করেছি তারা আমার নায়িকা নয়, তারা আমার সম্ভবপর জায়া। সে হিসেবে তারা অমিয়া, কি প্রতিমা, কি শিবানীর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।'

'দাদা দেখছি নির্বিকার ব্রহ্ম হয়েছেন', টিপ্পনী কাটল ললিতা।

'তুমি ওকে সত্যি নির্বিকার ভেবো না', কুণাল ললিতাকে সতর্ক করে দিল। 'ওর ওই পণটি, ওটির ভিতরে নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে। কোন মেয়ে ওর পণ শুনে ওকে সহজ মনে বিয়ে করবে বল? প্রায় মেয়েই বিকার বোধ করবে, কেউ ওকে ঘটা করে ক্ষমা করতে চাইবে, কেউ শাসিয়ে বলবে আর অমন কাজ কোরো না, কেউ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, পুরুষমানুষ তো? আর কত হবে! হাজারের মধ্যে হয়তো একজন ওকে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে ওর দেহকে, বিকারের পরিবর্তে পুলক বোধ করবে, দেহের ইতিহাস মনে রাখবে না। পরের দেহকে যে মেয়ে ভালোবাসতে জানে সে-মেয়ের আপন দেহ স্বাস্থ্যবান, শুচি ও সুশ্রী না

হয়ে পারে না, কল্যাণও তার দেহকে অবলম্বন করে তাকে ভালোবাসবে। বিবাহ সেই ভালোবাসাকে কেন যে ঘুম পাড়াবে তার সংগত হেতু নেই, বিবাহ তাকে জাগিয়েই রাখবে, কেননা বিবাহ মানে তো সঙ্গ? অঙ্গের পক্ষে সঙ্গই সর্ব।'

কুণালের আজ মন খুলে গেছল। মনের বাহন মুখ। কুণাল বলতে লাগল, 'বাল্মীকির প্রথম শ্লোক স্ফূর্ত হয়েছিল কীসের সমবেদনায়? সঙ্গচ্যুতির। বিরহ যেক্ষেত্রে কেবল উদ্বেগ আনে—প্রিয়জন যথাসময়ে আহার করছেন কি না, প্রিয়জনের হঠাৎ অসুখ করল বুঝি, প্রিয়জন না-জানি কত অসুবিধা ভোগ করছেন—সেক্ষেত্রে তার মতো হাস্যকর আর কী আছে?'

'বাহবা, বন্ধু বেশ।' সোম হেসে বলল, 'তোমাকে তো নেহাৎ ভালো মানুষের মতো দেখায়, তুমি এত কথা শিখলে কোথায়? ও যে আমার কথা।'

'হয়তো তোমারই কাছে শুনেছি ছাত্রকালে।' কুণাল বলল নম্রভাবে।

ললিতা লজ্জায় গম্ভীর হয়ে গেছল। তার ভালোবাসাকে সে কোনোদিন বিশ্লেষণ করেনি। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবে এইরকম একটা আশঙ্কা তার অবচেতনায় অবস্থিতি করছিল। দেহ মানুষের চিরদিন সতেজ থাকে না, আধি আছে ব্যাধি আছে দারিদ্র্য আছে অনশন আছে। তাকে প্রেমের ভিত্তি করলে প্রেম একদিন টলবে। প্রেম অর্থে অসীম মমতা, অনন্ত সহিষ্ণুতা, অখন্ড ধৈর্য, অবিরত স্বার্থত্যাগ। এই তো ছিল তার ধারণা। স্বামীর মুখে অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনে সে লজ্জায় বাক্যহারা হয়েছিল।

সোম বলল, 'এই দু-দিন ভেবে কী ঠিক করেছি জানো?'

কুণাল বলল, 'থট রিডিং তো শিখিনি, অপরের ভাবনা কী উপায়ে জানব?'

সোম ঘোষণা করল, 'তবে শোনো। আমি পাঁচ বছরের জন্যে লোকান্তরিত হব।'

কুণাল ও ললিতা সচমকে বলল, 'কী! কী!'

'ভয় নেই', সোম আশ্বাস দিল, 'আত্মহত্যা যে নয় তা পাঁচ বছর পরে জানতে পাবে। আত্মগোপন।'

'না?' কুণাল বলল অবিশ্বাসের স্বরে।

'অসম্ভব', ললিতা বলল প্রত্যয়ের ভরে।

'কঠিন কিছু নয়। পাঁচ বছর তোমরা আমার ঠিকানা পাবে না, চিঠি পাবে না—এই তো ব্যাপার। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো আমি সভ্যতার আসল ও নকল দুইই দেখেছি, দেখে মরিয়া হয়ে উঠেছি। 'Good-bye to Civilisation' বলতে পারবার সামর্থ্য নেই, তাই পাঁচ বছরের জন্যে বলছি 'পুনর্দর্শনায় চ।'

'তুমি কি সত্যি বনে যাবে?' শুধাল কুণাল।

'সে কিছুতেই হতে পারে না,' জবাব দিল ললিতা।

'বাবাকে লিখো আমি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছি, আমার শব উদ্ধার করতে পারা যায়নি।' সোম বলল।

'কিন্তু তুমি যাবে কোথায় শুনি? সুন্দরবনে?'

কুণালের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সোম জানাল যে, 'যাবে সাঁওতাল—কোল-ভীল-কুকি-নাগা-জৈন্তিয়া-খাসি-চাকমা-গারো খোন্দ গোন্দ জুয়াঙ্গদের ট্রাইবে স্ত্রীরত্নের অন্বেষণে। পাঁচ বছর পরে যখন সে ফিরবে তখন তাকে জীবিত দেখে তার বাবা এত উল্লসিত হবেন, যে তার অর্ধাঙ্গিনীর জন্মপরিচয় সন্ধান করবেন না।'

'অতিরিক্ত আনন্দবাজার,' 'টেলিগ্রাফ, বাবু, নয়া টেলিগ্রাফ,' 'তাজা খবর। গান্ধীমায়ী গ্রেপ্তার।'

কুণাল একখানা কিনল। বেচারা দেশের জন্যে ত্যাগ করবার মধ্যে করছে সকাল বেলা দুটি ও বৈকালে কোনো কোনো দিন একটি পয়সা।

কুমারী মায়া মল্লিক। আবার ছয় মাস। 'এ' ক্লাস কয়েদি। মায়া মল্লিকের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি। মায়া মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। সেই ছুটন্ত ঘোড়ার সম্মুখে ঝাঁপ দিয়ে লাগাম ধরার বিবরণ। এবার কিন্তু ওসব কিছু

নয়। ডিক্টেটার হয়ে ঘরে বসে গ্রেপ্তার ১৯৩৩।

কন্যা

অন্বেষণের পূর্বাহ্ণ

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালটা যাঁরা পুরীতে কাটিয়েছিলেন তাঁদের কারও কারও হয়তো মনে আছে, লাটসাহেবের বাড়ির কাছে বালুর উপর একটা নৌকোর ছায়ায় একসঙ্গে বসে থাকতে বা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে প্রায়ই দেখা যেত চারজন তরুণকে। কী সকাল কী সন্ধ্যা কী দিন কী রাত।

ওই যার পরনে পট্টবস্ত্র আর ফিনফিনে রেশমি পিরান তার নাম কান্তি। গৌরবরণ সুপুরুষ। মাথায় বাবরি চুল, সুঠাম সুমিত গড়ন, প্রাণের চাঞ্চল্য প্রতি অঙ্গে। চলে যখন, চরণপাতের ছন্দে নাচের লহর ওঠে। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। হাতে চাঁদ কপালে সূয্যি।

আর ওই যার পোশাক সাদা জিনের ট্রাউজার্স, সাদা টেনিস শার্ট, অথচ গায়ের রং শামলা তার নাম তন্ময়। তন্ময়কে বোধ হয় সুপুরুষ বলতে বাধে, কিন্তু পুরুষোচিত চেহারা বটে ওই ছ-ফুট লম্বা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নওজোয়ানের। তন্ময় না-হয়ে বিনোদ যদি হত তার নাম তা হলেই মানাত। একটা বিনোদ-বিনোদ ভাব ছিল তার চোখে-মুখে চালচলনে। কান্তিকে রাজপুত্র বললে তন্ময়কে বলতে হয় কোটালপুত্র।

ন-হাত খদ্দরের ধুতি খদ্দরের ফতুয়া যার গায়ে তার নাম অনুত্তম। দিন নেই রাত নেই সবসময় একজোড়া নীল চশমা তার চোখে। ইস্পাতের মতো কঠিন উজ্জ্বল ধারালো তার মুখ। পদক্ষেপে দৃঢ়তা। কাঁধ থেকে পৈতের মতো ঝোলানো থাকে একটা খদ্দরের ঝোলা। তাতে তকলি পাঁজ ও লাটাই। যখন খেয়াল হয় সুতো কাটে। বলা যাক মন্ত্রীপুত্র।

আর একজনের হাতে কালো ছাতা। বেলা পড়ে গেছে, মাথায় রোদ লাগছে না, সুজন তবু ছাতাবন্ধ করবে না। যেন ওটা ছাতা নয়, ঘোমটা বা বোরখা। মানুষটি মুখচোরা, লাজুক। নয়ানসুকের পাঞ্জাবি ও মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরে। গোলগাল নরম নধর নন্দদুলালকে সওদাগরপুত্র বলব না তো বলব কাকে! অবশ্য রূপকথার সওদাগরপুত্র। সত্যিকারের নয়।

বি এ পরীক্ষা দিয়ে চার বন্ধু এসেছিল হাওয়াবদল করতে। হাওয়াবদলটা উপলক্ষ্য। আসলে ওরা এসেছিল ওদের জীবনের একটা চৌমাথায়। কয়েকটা মাস একসঙ্গে কাটিয়ে চারজন চার দিকে যাত্রা করবে। কান্তি বেরিয়ে পড়বে নাচ শিখতে, মণিপুরী দক্ষিণী গুজরাতী উত্তরভারতী। নাচের দলে যোগ দিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরবে। নিজের দল গড়বে। তন্ময় তো বিলেতফেরতা ক-ভাইয়ের ন-ভাই। বিলেত না গেলে তার জাত যাবে। অক্সফোর্ডে তার জন্যে জায়গা পাওয়া গেছে। জাহাজেও। টেনিস ব্লু হতে তার শখ। জীবিকার পক্ষে ওর উপযোগিতা নেই বলে কষ্ট করে পড়াশোনাও করতে হবে। অনুত্তম ফিরে যাবে জেলে। গান্ধীজি সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি কর্মীদের ডাক দেবেন গণ-সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হতে। অনুত্তম আবার পড়া বন্ধ করবে অনির্দিষ্টকাল। দেশ স্বাধীন না-হওয়া পর্যন্ত সেও স্বাধীন নয়। জীবিকার জন্যে তৈরি হবার স্বাধীনতা তার নেই। সুজন ফিরে যাবে কলকাতা। এম এ পড়বে। তার পরে হবে সম্পাদক ও সাহিত্যিক। তার ধারণা সংসার চালানোর পক্ষে ওই যথেষ্ট। নিজের লেখনীর ’পর অসীম বিশ্বাস। কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে জোরালো।

বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই তাদের চার জনের মন কেমন করছিল চার জন্যের জন্যে। ততই যেন তারা পরস্পরকে কাছে টানছিল চার জোড়া হাত দিয়ে চার গুণ করে। কেউ কাউকে ছেড়ে একদন্ড থাকবে না, একজন অনুপস্থিত হলে বাকি তিন জন অস্থির হয়ে ছুটবে তার সন্ধানে। তন্ময় উঠেছে এক ইউরোপীয় হোটেলে। কান্তি তার মাসিমার বাড়ি। অনুত্তম ও সুজন ধর্মশালায়। বলাবাহুল্য তাদের দু-জনের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। সুজন পড়ে স্কলারশিপের টাকায়। আর অনুত্তম চালায় ছেলে পড়িয়ে। একসঙ্গে থাকতে পারে না বলে তাদের চার জনের মনে খেদ আছে। ধর্মশালাতেই চারজন উঠত, কিন্তু তন্ময়রা ব্রাহ্ম, আর কান্তির মাসির বাড়ি থাকতে সে কী করে ধর্মশালায় ওঠে! সম্ভব হলে সে-ই বরং তার মাসির ওখানে সদলবলে উঠত। কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা মাসের পর মাস দলবল নিয়ে থাকলে মাসির উপর উৎপাত করা হয়। এক ধর্মশালা থেকে আর এক ধর্মশালায় বদলি হতে হতে চললে তিন-চার মাস কাউকে

কষ্ট না দিয়ে দিব্যি কাটানো যায়। অনুত্তম জেল খাটিয়ে মানুষ। নিজে কষ্ট পেতে জানে ও চায়। ওটা তার প্রস্তুতির অঙ্গ। কিন্তু সুজনের হয়েছে মুশকিল। সে একটু যত্ন-আত্তি ভালোবাসে। একটি মাসি কি পিসি কি দিদি পেলে সে বর্তে যায়। অথচ এমন মুখচোরা যে যাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় তাঁদের কাউকে মুখ ফুটে একবার মাসিমা কি দিদি বলে ডাকবে না।

আর কান্তি? কান্তি ঠিক তার বিপরীত? ওই যে মাসিমা উনি কি তার আপন মাসিমা নাকি? আরে না। পাতানো মাসিমা। কবে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই পুরীতেই। তারপর যতবার পুরী এসেছে প্রত্যেক বার তাঁর ওখানে উঠেছে, তিনিও তাকে অন্যত্র উঠতে দেননি। হোটেলের খাওয়া তার মুখে রোচে না। ধর্মশালায় থেকে মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে বেশ একরকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে রোজ নতুন লোক আসছে রোজ নতুন লোক যাচ্ছে সেখানে বেশি দিন থাকতে মন লাগে না, মন চায় ওদের সঙ্গে পালাতে। কিংবা ওদের সঙ্গ এড়াতে। কান্তি সেইজন্যে মাসিমা-পিসিমার খোঁজে থাকে। পেয়েও যায়। তার আলাপ করার পদ্ধতি হল এই। হঠাৎ দেখতে পেল মন্দিরের পথ দিয়ে কে একজন মহিলা যাচ্ছেন। সঙ্গে একটি ছোটো ছেলে কি মেয়ে। পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'এই যে মাসিমা। কবে এলেন? আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কান্তি।' আশ্চয্যি! দশটা ঢিল ছুঁড়লে একটা লেগে যায়। মহিলাটিও বলে ওঠেন, 'অ! কান্তি! কবে এলি?' দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। আত্মীয়তা হয়ে যায়।

জীবনের একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছেছে তারা চার বন্ধু। যেমন পৌঁছেছিল রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। তেপান্তরের মাঠের সীমায় চার দিকে চার পথ। চার পথে চার ঘোড়া ছুটবে। আর কত দেরি? প্রত্যেকে অধীর। কেবল সুজন অধীর নয়। সে ধীর স্থির আত্মস্থ প্রকৃতির মানুষ। তার জীবনযাত্রা দু-দিন পরে বদলে যাচ্ছে না, বদলে যাক এটাও সে চায় না। চলতে চলতে যেটুকু বদলাবে সেটুকুর জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্যে তাকে কলকাতা ছাড়তে হবে না। এমনকী তাকে তার ট্যামার লেনের বাসা ছাড়তে হবে না। তার পথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিকপত্রের অফিসে। সেই পথে ছুটবে তার ঘোড়া। ছুটবে, কিন্তু কদম চালে নয়, দুলকি চালে।

চার ঘোড়া চার দিকে ছুটবে, দিগবলয়ে মিলিয়ে যাবে তাদের ছায়া। কেউ কি কাউকে দেখতে পাবে আর এ জীবনে? একজনের সঙ্গে একজনের দেখা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া একটা অর্ধোদয়যোগ কি চূড়ামণিযোগ-বিশেষ। হবে না তা নয়। হবে, কিন্তু কবে? হয়তো বিশ বছর বাদে। হয়তো শেষজীবনে। তখনকার সেই চৌমাথায় পৌঁছে গাছতলায় ঘোড়া বাঁধবে চার কুমার। গল্প করবে সারা রাত। কে কী হয়েছে, কে কী পেয়েছে, কে কী করেছে, তার গল্প। আবার চার জনে একসঙ্গে বাস করবে, একসঙ্গে বেড়াবে বসবে ও শোবে। সে তাদের দ্বিতীয় যৌবন। দ্বিতীয় যৌবনে উপনীত হয়ে প্রথম যৌবনের দিকে ফিরে তাকাবে তারা। কিন্তু তার আগে নয়। তার আগে ফিরে তাকাতে মানা।

তন্ময় বলল, 'ভাই, আবার আমরা এক জায়গায় মিলব তা আমি জানি। কিন্তু তার আগে আমাদের কৃতী হতে হবে সফল হতে হবে। জীবনটা তো হেলাফেলার জন্যে নয়। আর জীবনের সেরা সময় তো এই প্রথম যৌবন।'

কান্তি বলল, 'সত্যি। আবার যখন আমরা মিলব তার আগে যেন যে যার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকি। তখন যেন বলতে না হয় যে পরিকল্পনায় খুঁত ছিল।'

অনুত্তম বলল, 'না, পরিকল্পনায় খুঁত নেই। চিন্তা করতে করতে, আলোচনা করতে করতে রাতকে দিন করে দিয়েছি, দিনকে রাত করে দিয়েছি, মাসের পর মাস। খুঁত থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত। হয়তো কাজ করতে করতে ধরা পড়বে। তার জন্যে ফাঁক রাখতে হবে।'

সুজন বলল, 'ফাঁক রাখতে হবে না। ফাঁক আপনি রয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে কান্তি বলল, 'সে কী!' তন্ময় বলল, 'সে কী!' অনুত্তম বলল, 'তার মানে?' কেবল বিস্মিত নয়, বিরক্ত। কেবল বিরক্ত নয়, ক্ষুব্ধ। যাবার বেলা পিছু ডাকলে যেমন বিশ্রী লাগে। অযাত্রা ঘটে গেল।

সুজন বলল, 'কী করে বোঝাব! কীসের একটা অভাববোধ করছি কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। তোরা যদি বোধ না করিস তোরা এগিয়ে যা।'

স্তম্ভিত হল তন্ময়, কান্তি, অনুত্তম। এই যদি তার মনে ছিল এত দিন খুলে বলল না কেন সুজন? এখন ওরা করে কী। জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কি ঢেলে সাজাতে হবে? তার সময় কোথায়!

সুজনকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তবে কান্তিকে বিশ্বাস কী! তাই ভেবে তন্ময় শুধোলো কান্তিকে, 'তুইও কি কীসের একটা অভাব বোধ করিস?'

কান্তি এর উত্তর না দিয়ে পালটা সুধোলো তন্ময়কে, 'তুইও কী—'

অনুত্তম অন্যমনস্ক ছিল। ঠাওরালো তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ, আমিও।'

বিচলিত হল তন্ময় ও কান্তি। সামলে নিয়ে তন্ময় বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

তখন কান্তি পড়ে গেল একলা। অভিভূত হয়ে বলল, 'তা হলে তাই হবে।'

সকলেই বুঝতে পেরেছিল এর পরে কী আসছে। এর পরে পরিকল্পনায় রদবদল। তাতে সুজনের তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু বাকি তিন জনের যাত্রাভঙ্গ। ওহ! কী পাষন্ড এই সুজনটা! অভাববোধ করিস তো কর না, বাপু। বলতে যাস কেন?

অনুত্তম ওদের মধ্যে বয়সে বড়ো। নীল চশমা চোখে থাকায় তাকে প্রবীণের মতো দেখায়। পরামর্শের জন্যে অন্যেরা তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ভয় আমাদের এই যে চরম মুহূর্তে আমাদের জীবনের পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে যায়। কিন্তু পরিকল্পনা তো আমাদের তাসের কেল্লা নয়। কত কাল ধরে আমরা জীবনের মূলসূত্রগুলো নিয়ে অবিশ্রান্ত আলোচনা করেছি। কোনোখানে এতটুকু কাঁচা রাখিনি। ভিত আমাদের পাথরের মতো পাকা। তারই উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের পরিকল্পনা। গড়তে গেলে অদলবদল হয়েই থাকে। গড়ছি তো আমরাই। তবে এত ভাবনা কীসের?'

তন্ময় বলল, 'ভাবনা কীসের তা কি তুই জানিসনে? যে অভাববোধ একদিন আগেও ছিল না সে যে অনাহূত অতিথির মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসে বলছে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছ দেখি। ব্যবস্থা করা কি এতই সহজ যে জীবনটা যেমনভাবে কাটাব স্থির করেছিলুম তেমনিভাবে কাটাতে পারব বলে ভরসা হয়?'

কান্তি বলল, 'না, ভরসা হয় না। তবে জীবনের মূলসূত্রগুলোর উপর একবার হাত বুলিয়ে যাওয়া যাক অর্গ্যানের কীবোর্ডের মতো। প্রাণের কানে ঠিক বাজে কি না পরখ করা যাক।'

এবার ওরা তাকাল সুজনের দিকে। সুজন যেন জীবনের কীবোর্ডের উপর আঙুল বুলিয়ে বলে দিতে পারে কোন চাবিটা বাজছে, কোনটা বেসুর, কোনটা অসাড়। বন্ধুদের দশা দেখে সে দুঃখিত হয়েছিল। সে তো ইচ্ছা করে তাদের এ দশা ঘটায়নি। উদ্ধারের পন্থা যদি জানত তবে নিশ্চয় জানাত। কান্তি যা করতে বলছে তাই করে দেখা যাক। জীবনের মূলসূত্রগুলো স্থির আছে না অবোধ্য এক অভাববোধের টানে বিপর্যস্ত হয়েছে।

সুজন তখন ধ্যান করতে বসল। চোখ মেলে।

ধ্যানযোগে উপলব্ধি করল, করতে করতে বলতে লাগল, 'আদি নেই, অন্ত নেই এ বিশ্বজগতের। কেউ যে কোনোদিন একে সৃষ্টি করেছে বা কোনোদিন একে ধ্বংস করবে আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। নাস্তি থেকে এ আসেনি, নাস্তিতে ফিরে যাবে না। এর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। নিঃসংশয় হতে পারছিনে কেবল আমাদের নিজেদের বেলা। আমরাও কি এসেছি অস্তি থেকে অস্তিতে, ফিরে যাব অস্তিতে? আমাদের ইন্টেলেক্ট বলছে, কী জানি! কিন্তু ইনটুইশন বলছে, হ্যাঁ। আমরা অস্তি থেকে অস্তিতে এসেছি, অস্তিতে রয়েছি, অস্তিতেই অস্ত যাব সন্ধ্যারবির মতো। এক্ষেত্রে আমরা ইনটুইশনের উক্তি বিশ্বাস করব। বহির্জগতের মতো অন্তর্জগৎ সত্য। বহির্জগতের নিয়মকানুন বুঝে নেবার জন্যে ইন্টেলেক্ট, আর অন্তর্জগতের তল পাবার জন্যে ইনটুইশন। অন্তর্জগতের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই তারও আদি নেই, অন্ত নেই। যখন তাতে ডুব দিই তখন দেখি জরা নেই, মৃত্যু নেই, বিকার নেই, বিচ্ছেদ নেই, নিত্য বসন্ত, নিত্য যৌবন।

বহির্জগতের সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও অন্তর্জগতের বা অন্তর্জীবনের আদি নেই, ব্যাধি নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, কিছুই সেখানে হারায় না, ফুরোয় না, পালায় না, ঝরে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেখি অমৃতময় দেবতা। দর্শন করি তাঁর মহিমা। দীনের মধ্যে দেখি লক্ষ্মীশ্রী, হীনের মধ্যে নারায়ণ। পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে শান্তম শিবম। বিপন্নের মধ্যে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। সেই আমাদের দেবপূজা। আমাদের পূজা আমাদেরই কাছে ফিরে আসে। আমরাও পূজা পাই। হ্যাঁ, আমরাও দেবতা। আমাদের কীসের অভাব! আমরা কি—'

'এই বার ধরা পড়ে গেছে সুজন।' কান্তি বলল স্মিত হেসে। 'কে যেন বলছিল কীসের একটা অভাববোধ করছে! সুজন নয় তো!'

তন্ময় হো-হো করে হেসে উঠল। 'মূলসূত্র শিকেয় তোলা থাক। এখন বল, তোর কীসের অভাব। এই, সুজন।'

'ডুবে ডুবে জল খেতে কবে শিখলি রে!' বলল অনুত্তম। 'তোর কীসের অভাব তা আগে থেকে জানতে দিলি নে কেন!'

মূলসূত্রের খেই ছিঁড়ে গেল। সুজন বেচারি করে কী! চুপ করে সহ্য করল হাসি মশকরা। তার দশা দেখে কান্তি বলল, 'থাক, ওকে আর ঘাঁটিয়ে কী হবে। অভাব নেই সে-কথা ঠিক। অভাব আছে একথাও বেঠিক নয়। ইনটুইশন তো সবসময় খাটে না। ইনস্টিংক্ট যখন বলে খিদে পাচ্ছে তখন খিদেটাই সত্য। সাপ দেখলে সুজনও ভয় পায়।'

হাসির হররা উঠল। কিন্তু তাতে সুজন যোগ দিল না। লক্ষ করে নিরস্ত হল কান্তি। বলল, 'থাক, সুজনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আমার একটা প্রস্তাব আছে। অবধান করো তো নিবেদন করি।'

অনুত্তম বলল, 'উত্তম!'

'কাল চিঠি পেয়েছি,' কান্তি বলল, অধ্যাপক জীবনমোহন আসছেন এখানে। তাঁর হোটেলের ঠিকানা দিয়েছেন। সকলের তিনি অধ্যাপক, আমাদের তিনি সখা, দার্শনিক ও দিশারি। তিনি এলে পরে একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করতে হবে, খুলে বলতে হবে, কার মনে কী আছে। যা আমাদের একজনের কাছেও স্পষ্ট নয় তা হয়তো তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কেমন? রাজি?'

তন্ময় বলল, 'নিশ্চয়।' অনুত্তম বলল, 'আচ্ছা।' সুজন বলল, 'দেখি।'

জীবনমোহন তাঁর অর্ধেক জীবন দেশ-দেশান্তরে কাটিয়ে অল্প দিন হল অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। ক-দিন টিকতে পারবেন বলা যায় না। ছাত্ররা সাক্ষাৎ করতে গেলে তাদের সিগারেট অফার করেন। এই নিয়ে কথা উঠলে বলেন, 'কেন, আমিও তো ছাত্র।' কর্তারা তাঁর অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট, কিন্তু তাঁর বেহায়াপনায় রুষ্ট। ছাত্ররাও প্রসন্ন নয়। কারণ তিনি পলিটিকসের ধার ধারেন না, ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অনুযোগ করলে বলেন, 'মদ আমি খাইনে, অহিফেন ছুঁইনে।'

বয়স চল্লিশের ওপারে। বিয়ের ফুল ফুটল না এখনও। মাথার মাঝখানে টাক। দু-দিকের কেশ কাঁচা-পাকা। জহরলালের মতো সাজপোশাক। তেমনি তরুণ দেখায়। তবে টুপিটা আরও শৌখিন। চাউনিতে এমন কিছু আছে যার থেকে মনে হয় তিনি অনেক দূরের মানুষ। কে জানে কোন সুদূর মানস সরোবরের হংস।

জীবনমোহনের হোটেলে দেখা করতে গেল চার বন্ধু। তিনি তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ছাদের উপরে। সেখানে বেশ নিরিবিলি। পায়ের তলায় সাগরের ঢেউ ফেনায় ফেনায় ফেটে পড়ছে, ছুটে আসছে, লুটিয়ে যাচ্ছে। আবার পা টিপে টিপে পিছু হটছে। ঝাঁপ দেবার আগে দম নিচ্ছে। দম নেবার সময় মুখে শব্দ নেই, ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় তর্জন-গর্জন, ফিরে যাবার সময় সে কী মধুর মর্মর!

যত দূর দৃষ্টি যায় অসীম নীল। তার সঙ্গে মিশে গেছে অসীম কালো। অন্ধকার রাত। কিন্তু অন্ধকারও ফেনিয়ে উঠছে, ফেটে পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে মুঠো মুঠো তারায়, ফোঁটা ফোঁটা তারায়। তবে তার মুখে সোর নেই। থাকলেও শোনা যায় না, এত অস্ফুট ধ্বনি।

জীবনমোহন হাতজোড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারা বলে যেতে লাগল যা বলতে এসেছিল। বলল প্রধানত কান্তি। মাঝে মাঝে তন্ময়। ক্বচিৎ অনুত্তম। একবারও না সুজন। তবে তার নীরবতাও বাঙ্ময়।

এরপরে যখন জীবনমোহনের পালা এল তিনি ছোটোখাটো দুটো একটা প্রশ্ন করতে করতে কখন এক সময় শুরু করে দিলেন তাঁর বক্তব্য। বললেন কথাবার্তার মতো করে। সহজভাবে। বিনা আড়ম্বরে।

বললেন, 'বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, তোমাদের বয়সে আমারও মনে হত কীসের যেন অভাব। সব কিছু থেকেও কী যেন নেই। কী যেন না হলে সব কিছু বিস্বাদ। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কোনোটাতে নেই লবণ। আমারও একজন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকের অধিক। তাঁর কাছে গেলুম উপদেশ চাইতে। তিনি বললেন, জীবনমোহন, রত্ন কারও অন্বেষণ করে না। রত্নেরই অন্বেষণ করতে হয়। যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, যা সুদূর, তোমার জীবনকে করো সেই সুদূরের অন্বেষণ। জানতে চাইলুম, কী সে নিধি? কী তার নাম? তিনি বললেন, খুঁজতে খুঁজতে আপনি জানতে পাবে।'

সমস্ত মন দিয়ে শুনছিল তারা চার জন। জীবনমোহন আর কিছু বলবেন ভেবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না।

তখন তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'যদি আপত্তি না থাকে তবে জানতে পারি কি স্যার, কী সে নিধি!'

'না, আপত্তি কীসের?' তিনি একটু থামলেন। একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, 'The Eternal Feminine.'

চমক লাগল তাদের চার বন্ধুর। আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল তাদের বুকে ও মুখে। দেখতে পেল না কেউ।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং জীবনমোহন। বললেন, 'তোমরা হয়তো ভাবছ এটা এমন কী অসামান্য কথা, কী এমন বিশেষত্ব আছে এটার! অসামান্য এইজন্য যে এর সন্ধান রাখে এমন লোক 'লাখে না মিলল এক'। বিশেষত্ব এইখানে যে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে এমন দু-পাঁচজন তরুণ পাওয়া গেছে যারা এ অন্বেষণ বরণ করেছে, এ অন্বেষণে বাহির হয়েছে। তারা সিদ্ধার্থ হয়েছে একথা বলতে পারলে সুখী হতুম। কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়েছে একথাও বলব না। তারা আর কিছু পারুক না-পারুক আদিকাল থেকে চলে আসতে থাকা একটা অন্বেষণের ধারাকে আজ অবধি বহমান রাখতে পেরেছে।'

অভিভূত হয়েছিল চার জনেই। উচ্ছ্বসিত স্বরে কান্তি বলে উঠল, 'এ অন্বেষণ আমি বরণ করব। আমি বাহির হব। আমি ব্যর্থ হতেও প্রস্তুত।'

আবেগভরে তন্ময় বলে বসল, 'ব্যর্থ হব জেনেও আমি তৈরি।'

মুখচোরা সুজন, সেও মুখর হল। 'ব্যর্থতাই আমার শ্রেয়।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অনুত্তম। 'হায়! আমি যে স্বাধীন নই। দেশ যতদিন না স্বাধীনতা পেয়েছে ততদিন আমার আর কোনো অন্বেষণ অঙ্গীকার করার স্বাধীনতা নেই।'

তার ব্যথায় ব্যথী হয়ে জীবনমোহন বললেন, 'বেচারা অনুত্তম!' তাঁর প্রতিধ্বনি করে তন্ময় কান্তি সুজন এরাও বলল, 'বেচারা অনুত্তম!'

ফেরবার সময় দেখা গেল মাটিতে পা পড়ে না তাদের চার জনের। অনুত্তমেরও? হ্যাঁ, অনুত্তমেরও। থাক, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব না, শুধু এইটুকু ফাঁস করলে চলবে যে অনুত্তমের নীল চশমা সূর্যের ভয়ে নয়, বালুর ভয়ে নয়, ধরা পড়ার ভয়ে। সুজনের কালো ছাতাও তাই।

তন্ময় সারা পথটা 'আহ' 'ওহ' করে কাটাল। যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু যন্ত্রণায় নয়। আনন্দে।

কান্তি বলল, 'এতদিন পরে জীবনের একটা তাৎপর্য মিলল। জীবনটা একটা অন্বেষণ। হয়তো নিষ্ফল অন্বেষণ। তবু নিষ্ফলতাও শ্রেয়।'

'অবিকল আমার কথা।' বলল সুজন।

'আমারও।' তন্ময় সায় দিল।

অনুত্তম বলল, 'মাটি করেছে দেশটা পরাধীন হয়ে। নইলে আমিও—'

কান্তি বলল, 'দেশ স্বাধীন হোক পরাধীন হোক, এ অন্বেষণ স্বীকার করতে ও একে জীবনের কাজ করতে প্রতি জেনারেশনে দু-চার জন লোক থাকবে। নয়তো অন্বেষকদের পরম্পরা লোপ পাবে। আমাদের জেনারেশনে আমরাই সে দু-চার জন লোক। আমি আর তন্ময় আর সুজন।'

অনুত্তম অনুযোগ করে বলল, 'কেন? আমি কী দোষ করেছি? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? যে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে সে কি শাশ্বতী নারীর ধ্যান করতে পারে না?'

কান্তি খুশি হয়ে বলল, 'এই তো চাই। তোকে বাদ দিতে চায় কে?'

তন্ময় বলল, 'কেউ না।'

সুজন বলল, 'তোকে নিয়ে আমরা চতুরঙ্গ।'

পরের দিন আবার জীবনমোহনের সঙ্গে ছাদের উপর বৈঠক। আবার সন্ধ্যার পরে। অনুত্তমকে তিনি প্রত্যাশা করেননি। বিস্মিত ও সস্মিত হলেন। বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম তোমরা হবে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স।'

কান্তি বলল, 'না, স্যার, আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স হব না। হব রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। তবে যার অন্বেষণে যাব সে হবে রাজকন্যা।'

'যার নয়, যাদের। সে নয়, তারা।' সংশোধন করল অনুত্তম।

'তাদের একজনের নাম হবে রূপমতী।' তন্ময় বলল উত্তেজনাভরে।

'আর একজনের নাম কলাবতী।' সুজন বলল মুখ নীচু করে।

'আর একজনের নাম', অনুত্তম বলল, 'পদ্মাবতী। পদ্মিনী।'

'হায়!' কপট দুঃখ প্রকট করল কান্তি। 'সব ক-টি ভালো ভালো নাম তোরাই লুটে-পুটে নিলি। আমার জন্যে বাকি রইল কী! কান্তিমতী!'

'বা!' জীবনমোহন তারিফ করে বললেন, 'তোমাদের চার বন্ধুর প্রত্যেকের পছন্দ খাসা। কিন্তু চার জনের কোন জন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র কোন জন, সওদাগরপুত্রটি কে, কোটালপুত্র কোনটি?'

এর উত্তরে ওরা চার জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে অনুত্তম আমতা আমতা করে বলল, 'স্যার, আমি ঠিক জানিনে।'

জীবনমোহন হেসে বললেন, 'উত্তর দেবার দায় পরীক্ষকের উপর চাপালে! কিন্তু উত্তর তো একরকম দেওয়াই আছে। কান্তি, তোমার পছন্দ রাজপুত্রের মতো। আর অনুত্তম, তোমার পছন্দ মন্ত্রীতনয়ের যোগ্য। আর সুজন, তোমার পছন্দ সওদাগরসুতের উপযুক্ত। আর তন্ময়, তোমার পছন্দ কোটালনন্দনের অনুরূপ। তা বলে তোমরা কেউ কারও চেয়ে খাটো নও। তোমাদের কন্যারাও সকলে সকলের সমতুল।'

তাঁর আশঙ্কা ছিল অনুত্তম সুজন তন্ময়—বিশেষ করে তন্ময়—হয়তো আঘাত পাবে। কিন্তু তন্ময় হল স্পোর্টসম্যান। সে কান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অভিনন্দন! কিন্তু একালের রাজপুত্রদের দৌড় কতটুকু! কোটালনন্দনেরই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।'

'আর মন্ত্রীতনয়দের হাতেই আসল ক্ষমতা।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল অনুত্তম।

'আর সওদাগরসুতদের হাতেই পুতুলনাচের অদৃশ্য তার।' সুজন বলল হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

কান্তি কপট দুঃখে বিগলিত হয়ে বলল, 'তাই তো, আমি তো খুব ঠকে গেছি।'

জীবনমোহন উপভোগ করছিলেন তাদের অভিনয়। বললেন, 'কেউ ঠকে যায়নি। কেউ ঠকে যাবে না। এটা এমন একটা অন্বেষণ যে অন্বিষ্ট যদি না-ও মেলে, যদি মেলে কিন্তু মিলে হারিয়ে যায়, যদি মেলে কিন্তু ভুল মেলে, তা হলেও পরিতাপের কিছু নেই। এটা এমন একটা দিল্লিকা লাড্ডু যা খেলেও কেউ পস্তায় না, না খেলেও কেউ পস্তায় না।'

'তার পরে,' তিনি আরও বললেন, 'ক্ষমতার ক্ষেত্র এ নয়। ক্ষমতার কথা অপ্রাসঙ্গিক। তোমার হাজার ক্ষমতা থাকলেও তাকে তুমি পাবে না, অনুত্তম। তাকে অধিকার করতে গেলেই তাকে হারাবে, তন্ময়।

সুজন, ইটার্নাল ফেমিনিন যাকে বলেছি তার অন্য নাম ইটার্নাল বিউটি। কান্তি, তুমি চিরসৌন্দর্যের অভিসারে চলেছ।'

চিরসৌন্দর্যের অভিসার! কী গুরুভার তাদের উপর ন্যস্ত! শাশ্বতী নারীর অন্বেষণ! কী ক্ষুরধার পন্থা! জীবনমোহন তাদের কাছে যে অসাধ্যসাধন আশা করছেন সে কি তাদের সাধ্য! কেন তবে তারা ক্ষমতার কথা মুখে আনে! না, ক্ষমতা তাদের নেই। উদ্দীপ্ত অথচ বিনম্র বোধ করছিল চার বন্ধু। নিয়তি তাদের চার জনকেই মনোনয়ন করেছে তাদের যুগে ও দেশে। কী বিস্ময়কর সৌভাগ্য! কিন্তু সেই সঙ্গে কী দুশ্চর ব্রত!

তারা স্থির করেছিল বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু কীসের অভিমুখে তা স্থির ছিল না। তাদের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন জীবনমোহন। অতি দূর সে লক্ষ্য। কোনোদিন সেখানে পৌঁছোনো যাবে কি না সন্দেহ। স্বয়ং জীবনমোহন কি পৌঁছেছেন!

সে-কথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু তন্ময় তাঁকে আপন মনে গুন গুন করতে শুনেছে, ‘হায় কন্যা শামারোখ।’

শোনা অবধি কী যে হয়েছে তন্ময়ের, থেকে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, আর বলে, ‘হায় কন্যা রূপমতী!’

এ নিয়ে পরিহাস করে কান্তি। বুক চাপড়ে বলে, ‘হায় কন্যা কান্তিমতী!’

অনুত্তম তা শুনে বলে, ‘এ আবার কী নতুন খেলা শুরু হল! আমাকেও হা-হুতাশ করে বলতে হবে নাকি, হায় কন্যা পদ্মাবতী, হায় কন্যা পদ্মিনী!’

মুখচোরা সুজন মুখফুটে কিছু বলবে না। নইলে তাকেও বলতে শোনা যেত, ‘হায় কন্যা কলাবতী!’

কান্তি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ‘তন্ময়কে তা বলে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। একদিন তার মোহভঙ্গ হবে। কষ্ট পাবে।’

‘কেন বল দেখি?’ তন্ময় প্রশ্ন করে।

‘কেন?’ কান্তি বলে যায়, ‘চিরন্তনীকে কেউ কোনোদিন রূপের আধারে পায়নি।

পাবি কী করে? সে তো রূপে নেই, আছে রূপের ইঙ্গিতে। কোনো মেয়ের চাউনিতে, কারও হাসিতে, কারও কেশপাশে, কারও কণ্ঠস্বরে। রূপের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে, আভাস দিয়ে যায়, কারও ক্ষণিক পরশ, কারও ক্বচিৎ সঙ্গ। তুই আশা করছিস একজন কেউ আছে যে তিলোত্তমার মতো সুন্দরী। একজন কেউ আছে যাকে ধরা যায়, ধরে রাখা যায়, দিনের পর দিন, সারাবছর, জীবনভর!’

‘নিশ্চয়’। তন্ময়ের বচনে অবিচলিত প্রত্যয়। ‘কেন আশা করব না? কতটুকু দেখেছি এই পৃথিবীর! সেইজন্যেই তো আমি দেখতে বেরিয়েছি দেশ-বিদেশ। দেখতে বেরিয়েছি তাকে যার নাম দিয়েছি রূপমতী। সে আছে। এবং আমি তাকে ধরবই, ধরে রাখবই, ঘরে ভরবই। তবে হ্যাঁ, দশ-বিশ বছর সময় লাগতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে আয়ু ফুরিয়ে আসবে হয়তো। সেইজন্যেই তো বলছি, হায় কন্যা রূপমতী! একবার দয়া করে ঠিকানাটা তোমার জানাও।’

হাসির কথা। কিন্তু হাসতে গিয়ে হাসি পায় না একজনেরও। তন্ময়ের ব্যাকুলতা তাদের অভিভূত করেছিল।

সুজন বলে, ‘সে আছে বই কী। তবে তার রূপ তার দেহের নয়, তার আত্মার, তার অন্তরের। কাচের আড়ালে যেমন আলো থাকে, সে আলো কাচের নয়, সে আলো শিখার, এও তেমনি। আমি যার ধ্যান করি সে শুকতারার মতো প্রভাময়ী, তার প্রভা কোনো অদৃশ্য আলোকবর্তিকার। কিন্তু তাকে আমি কোনোদিন পাব এ আশা আমার নেই। এযেন তারকার জন্যে পতঙ্গের তৃষা।’

এবার অনুত্তমের পালা। ‘আমার পদ্মাবতী’, বলে অনুত্তম, ‘ভরা পদ্মার মতো রূপসি। রূপ তার দেহে নয়, আত্মায় নয়, শতধার ইঙ্গিতে নয়, রূপ তার গতিবেগে, রূপ তার ক্রিয়ায়। আমি যার ধ্যান করি সে সুন্দরী নয়, কিন্তু কাজ তার সুন্দর। দেশের জন্যে মাথার চুল কেটে দিতে পারে কে? পদ্মাবতী। আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে কে? পদ্মিনী। তাকে কি পাওয়া যায় যে আমি পাব! তবে সে আছে নিশ্চয়।’

চার জনের লক্ষ্য এক, কিন্তু ধ্যানরূপ বা রূপধ্যান চতুর্বিধ। এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন তন্ময় বলে, ‘চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে নারী তার পরে চিরন্তনী। যে নারীই নয় সে চিরন্তনী হবে কী করে। আমি যাকে চাই সে আমার সঙ্গিনী, আমার জায়া, আমার সন্তানের জননী। সে আমাকে আনন্দ দেবে, তাকে নিয়ে আমি সুখী হব। এই-সব কারণে তাকে আমার পাওয়া দরকার। ধরে রাখা দরকার। আমি চাই সহজ স্বাভাবিক জীবন, যাকে বলে গার্হস্থ্য আশ্রম। কিন্তু এই সব নয়। এর উপরে চাই রূপলাবণ্য, যার বিকাশ

দেহবৃন্তে। অনুপম রূপলাবণ্য, অসাধারণ সৌন্দর্য। যা কোনোদিন শুকিয়ে যাবে না, আশি বছরেও তাজা থাকবে।'

'অ্যাঁ! বলিস কী রে!' কান্তি তামাশা করে। 'কেবল রূপ নয়, যৌবন! তাও পাঁচ-দশ বছর নয়, আশি বছর! ষোড়শী কোনো দিন জরতী হবে না! এই মাটির শরীরে এও তুই আশা করিস।'

'তন্ময় কিনা তন্ময়।' টিপ্পনী কাটে অনুত্তম।

সুজন অন্যমনস্কভাবে বলে, 'না, না। চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে চিরন্তনী, তার পরে নারী। আগে অন্তর, তার পরে বাহির। আগে আত্মা, তার পরে দেহ। আমি যার ধ্যান করি সে যদি আমার সঙ্গিনী না-হয় তা হলেই বা কী আসে যায়! সে যেখানেই থাকুক, যত দূরেই থাকুক, তার কিরণ এসে আমার গায়ে পড়ছে। পড়তে থাকবে। তাকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হতুম। কিন্তু তা কি সম্ভব! আর কাউকে বিয়ে করে তার ধ্যান করাও সম্ভব নয়। কাজেই আর কাউকে বিয়ে করাও অসম্ভব।'

কান্তি আবার রঙ্গ করতে যায়, কিন্তু অনুত্তম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় সুজন জোর দিতে চায় চিরসৌন্দর্যের উপরে, শাশ্বত সুষমার উপরে, যা মূর্ত হয়েছে নারীতে, নারীর নারীত্বে। আর তন্ময় জোর দিতে চায় নারীত্বের উপরে, নারীর রূপযৌবনের উপরে, যা পার্থিব হয়েও চিরন্তন। আমি বলি, চিরন্তনী নারী হচ্ছে সেই নারী যে প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্ত সাধারণ অথচ সংকট মুহূর্তে একান্ত অসাধারণ। যার ঘোমটা খসে যায়, মুখ দেখতে পাওয়া যায় ঝড়ের রাতে বিজলির ঝিলিকের মতো। সে আর কতটুকু সময়ের জন্যে! সেইটুকু সময় যদি দীর্ঘতর সময়ে পরিণত করার মন্ত্র জানা থাকত তা হলে ওই মন্ত্র পড়ে আমি তাকে বিয়ে করতুম। তা কি আমি জানি যে বিয়ের স্বপ্ন দেখব।'

'বিয়ে! বিয়ে!' কান্তি এবার বিরক্তির স্বরে বলে, 'ছেলেভোলানো ছড়া থেকে বুড়োভোলানো কবিতা পর্যন্ত সব জায়গায় দেখি বিয়ে! আচ্ছা বিয়ে পাগলা দেশ যাহোক। আমি কিন্তু বিয়ের মহিমা বুঝিনে। বিয়ে আমি করব না। আশি বছরের আয়েষাকেও না, আশমানের শুকতারাকেও না, অচপল চপলাকেও না। কোনো মেয়েকেই না। আমার চিরন্তনী নারী এক আধারে নেই, সকলের মধ্যে আছে। তিলোত্তমা নয়, তিলে তিলে ছড়ানো।'

তারপর নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে। 'একজনকে বিয়ে করলে আর পনেরো হাজার ন-শো নিরানব্বই জনের উপর অবিচার করা হয়। আমি তো দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ নই যে ষোলো হাজার জনের উপর সুবিচার করব। আমি বৃন্দাবনের কানু, সুবিচারের ভয়ে সবাইকে ছেড়ে যাই, এমনকী রাধাকেও।'

তন্ময় ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ হয়েছে। এসব কথা তার সংস্কারে বাধে। প্রাণে বাজে। সে কানে আঙুল দিয়ে বলে, 'আমার জীবনের সূত্র একমেবাদ্বিতীয়ম।'

সুজন ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্ম সমাজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছে, খেলাধুলা করেছে। ওদের উৎসবে যোগ দিয়েছে, উপাসনায় চোখ বুজেছে। সেও আঘাত পেয়ে বলে, 'আমি নিরাকারবাদী।'

অনুত্তম গান্ধীশিষ্য। পিউরিটান। সেও মর্মাহত হয়। বলে, 'কান্তি, তুই নাচতে যাচ্ছিস, এই যথেষ্ট স্বৈরাচার। আর বেশি দূর যাসনে। গেলে পতন অবধারিত।'

'তোরা বড়ো বেশি সিরিয়াস। লীলা কাকে বলে জানিস নে। ভয়ের দিকটাই দেখিস। কিন্তু যারা নাচতে জানে তারা সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়। আমি সহজিয়া।' এই বলে কান্তি যবনিকা টেনে দেয়।

জীবনমোহন তখনও ছিলেন পুরীতে। তাদের চার বন্ধুর বিতর্ক তাঁর কানে পৌঁছোল। তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, 'নুনের পুতুল যখন সমুদ্র অন্বেষণে যায় তখন কী হয়? কী বলেছেন রামকৃষ্ণদেব? তোমরাও যাচ্ছ সাগরের মতো আকাশের মতো চিরন্তনের সন্ধানে। যদি কোনোদিন তাকে দেখতে পাও যা দেখবে তা তোমাদের কল্পনার অতীত। ধ্যানের অতীত। তাকে নিজের প্রতিমার ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়ো না। চাইলে দেখবে সে রূপমতী বা কলাবতী নয়, পদ্মাবতী বা কান্তিমতী নয়। সে কে বলব? সে তন্ময়িনী বা সুজনিকা, কান্তিরুচি বা অনুত্তমা।'

তারপর হাসি ছেড়ে বললেন, 'তাকে পাওয়া না পাওয়ার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আকাশকে কেউ কোনোদিন ধরতে পেরেছে? ঘরে ভরতে পেরেছে? অথচ ঘর জুড়ে রয়েছে আকাশ নয় তো আর কে? পাব, একথা জোর করে বলতে নেই। পাব না, একথাও মনে করতে নেই।'

ওরা তাঁকে ঘিরে বসে শুনতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'অনুত্তম, কান্তি, তন্ময়, সুজন। এ অন্বেষণ সুখের অন্বেষণ নয়। একে যেন সুখের অন্বেষণ করে না তোল। সুখ যে কোনোদিন আসবে না তা নয়। আপনা হতে আসবে, আপনা হতে যাবে। তার আসা-যাওয়ার দ্বার খোলা রেখো। অনুত্তম, তোমাকে এসব না বললেও চলত। বরং এর বিপরীতটাই বলা উচিত তোমাকে। না, এটা দুঃখের অন্বেষণও নয়। আর সুজন, তোমাকেও বলার দরকার ছিল না। তুমিও তো সুখের চেয়ে দুঃখের প্রতি প্রবণ। আর কান্তি, তোমাকে যা বলেছি তাই যথেষ্ট। শুধু তন্ময়, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। মনে রেখো, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্যে।'

ওরা চার জনে নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল। তিনি বললেন, 'থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে। আমি এর পক্ষপাতী নই।' তারপর ওদের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

যাত্রা? যাত্রার জন্যে ওরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু ওদের ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে কেউ কারও সহযাত্রী হবে না। সেইজন্যে যাত্রার দিন বিনা বাক্যে পেছিয়ে দিচ্ছিল। ওদিকে ওদের পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছিল। কাজেই কালহরণের তেমন কোনো অজুহাত ছিল না। সুজন ও তন্ময় পাস করেছে, অনুত্তম ও কান্তি করেনি। এইরকমই হবে ওরা জানত। কান্তি তো ইচ্ছা করেই শূন্য খাতা দাখিল করেছিল কয়েকটা পেপারে। পাস করলে পাছে তার গুরুজন তাকে যেতে না দেন গন্ধর্ব-বিদ্যা শিখতে গন্ধর্ব হতে। আর অনুত্তম সময় পেল কখন যে পরীক্ষার পড়া করবে!

যাত্রার প্রসঙ্গে পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠল আবার। কান্তি বলল, 'আমাদের পরিকল্পনায় সেই যে ফাঁক ছিল সেটা কি তেমনি আছে না ভরেছে? কীসের যেন অভাববোধ করছিল কেউ কেউ? এখনও কি করে?'

অনুত্তম তাকাল তন্ময়ের দিকে, তন্ময় সুজনের দিকে। সুজন বললে, 'না, আমার তো আর অভাববোধ নেই। পেলেই যে অন্তর ভরে তা নয়। না পেলেও ভরে যদি জ্ঞাননেত্র খুলে যায়। জীবনমোহন আমাদের নেত্র উন্মীলন করেছেন। তিনি আমাদের গুরু।'

'আমারও অভাববোধ নেই,' স্বীকার করল তন্ময়। 'পেতে চাই। পাইনি। তবু আমার অন্তর পূর্ণ। যার অন্বেষণে যাচ্ছি সেই জুড়ে আছে অন্তর। জুড়ে থাকবেও।'

'আমি যে কাকে চাই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হয়তো এ জীবনে কোনোদিন তার দেখা পাব না, তবু আমার অভাববোধ থাকবে না।' বলল অনুত্তম।

কান্তি বলল, 'অভাবের কথা আর যেই তুলুক আমি তুলিনি। অভাববোধ করা আমার স্বভাব নয়। কেমন করে যে আমার সব অভাব মিটে যায় আমিই কি তা বুঝি! জীবন দেবতা সদয়।'

তারপর তাদের কথাবার্তা আর একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে উঠল। তন্ময় বলল, 'আমার পরিকল্পনা মোটের উপর তেমনি আছে। বিলেত যাব, বিলেত থেকে ফিরে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব। বিয়ে করব, ঘর সংসার পাতব। তবে কাকে বিয়ে করব এখন তা ঠিক হয়ে গেছে। রূপমতীকে।'

'এটা জীবনমোহনের ঘটকালিতে।' এই বলে কান্তি হেসে আকুল হল।

'এখন কেবল একটা নিমন্ত্রণপত্র বাকি।' টিপ্পনী কাটল অনুত্তম।

'তোদের কেবল হাসি, কেবল ঠাট্টা!' তন্ময় কপট রোষ প্রকট করল।

'তারপর, সুজন, তুই চুপ করে রইলি যে! বোধ হয় ভাবছিস কাকে বিয়ে করা উচিত তা তো ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাপের মত নেই আর সে নিজে পর্দার আড়ালে।' কান্তি পরিহাস করল।

'না, পর্দার আড়ালে সে নয়। ছাতার আড়ালে সুজন।' রহস্য করল অনুত্তম।

'তা হলে,' তন্ময় ফুর্তি করে বলল, 'আমাকেও হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে। এই নীল চশমাটি কীসের জন্যে? বেড়াল চোখ বুজে দুধ খায় আর ভাবে কেউ টের পাচ্ছে না।'

সুজন শেষে মুখ ফুটে বলল, 'না, আমার পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান সংরক্ষিত নেই। বিয়ে যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাবে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। আমিও আশ্চর্য হব। তোরাও হবি। আকস্মিকের জন্যে তখন জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।'

কান্তি রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'তার মানে ন্যাড়া, খাবি? না হাত ধোব কোথায়?'

অনুত্তম গম্ভীরভাবে বলল, 'ছদনাতলায়।'

হেসে উঠল চার জনেই। সুজন স্বয়ং।

এরপরে এল অনুত্তমের পালা। তন্ময় বলল, 'অনুত্তম যাই বলুক না কেন আমি বিশ্বাস করব না যে ও চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকবে।'

'কে বলল চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকব?' অনুত্তম প্রতিবাদের সুরে বলল, 'দেশ যতদিন পরাধীন ততদিন দেশের কাজ আমার পরিকল্পনায় প্রধান অংশ নেবে। তার পরে যেমন সর্বত্র হয়ে থাকে তেমনি এখানেও হবে। সৈনিক ফিরে যাবে নিজের কাজে। আমি কেন ধরে নেব যে দেশ চিরদিন পরাধীন থাকবে? স্বাধীন ভারত আমাদেরই হাত দিয়ে হবে।'

'তার পরে তুই কী করবি? ঘরসংসার? বিয়ে?' প্রশ্ন করল তন্ময়।

'করতেও পারি', উত্তর দেয় অনুত্তম। 'করতে আমার অনিচ্ছা নেই যদি ঝড়ের রাতের চলবিদ্যুৎকে বাতিদানের স্থিরবিদ্যুতে পরিণত করার কৌশল জানি। কিন্তু বিদ্যুৎ যদি তার বিদ্যুৎপনা হারায় তা হলে তাকে নিয়ে আমি কী করব। বিয়ে যারা করে তারা বিদ্যুৎকে করে না, খদ্যোতকে করে। বিদ্যুৎ আপনি খদ্যোত হয়ে যায়। সেইজন্যে আমি ওকথা ভাবতে চাইনে, তন্ময়।'

এর পরে কান্তি। 'কান্তি তো বিয়ে করবে না বলে ঘোষণা করেছে। ওকে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত নয়।' তন্ময় বলল বিজ্ঞ সমাজপতির মতো।

'বটে!' কান্তি খোশমেজাজে বলল, 'মেয়েরা তা হলে মিশবে কার সঙ্গে? বিয়ে তো মাত্র একজনের সঙ্গে হয়। সেই একজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশতে পারবে না?'

তন্ময় সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। সুজনের দিকে তাকাল। সুজন বলল, 'কান্তির পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান নেই; আকস্মিকের জন্যেও সে জায়গা রাখেনি। কিন্তু নারীর জন্যে আসন আছে। তন্ময়ের এটা ভালো লাগছে না। অনুত্তম তো একে স্বৈরাচার বলেছে। আমি নীতিনিপুণ নই, তবু আমারও কী জানি কেন কোথায় যেন বাধছে। কান্তি, আমি তোকে বিচার করতে চাইনে। কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখিস।'

কান্তি ভাবুকের মতো মুখ করে বলল, 'তোদের তিন জনেরই মনের কথা এই যে নারী তোদের জন্যে নীড় বাঁধে। যে পাখি আকাশের সে হয় নীড়ের। উড়ে যার সুখ, সে উড়তে ভুলে যায়। নারীর নিজের মনের কথা কিন্তু তা নয়।'

অনুত্তম মশকরা করে বলল, 'শোনো, শোনো।'

তন্ময় বলল, 'আচ্ছা, শুনি।'

কান্তি বলল, 'আমাদের চার জনের পরিকল্পনায় সংগতি থাকলে খুশি হতুম আমিই সব চেয়ে বেশি! কিন্তু তা হবার নয়। তবে আমাদের চার জনেরই জীবনের মূলসূত্র এক। কী বলিস, সুজন?'

সুজন কান্তিকে দুঃখ দিতে চাইল না। বলতে পারত, স্বৈরাচার তো মূলসূত্রবিরোধী। বলল, 'মোটামুটি এক।'

'তবে আর কী!' কান্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বিদায়ের দিন এই কথাটাই মনে থাকবে আমাদের যে আমরা সব রকমে স্বাধীন, তবু একসূত্রে গাঁথা। সেই অদৃশ্য সূত্রই আবার আমাদের টেনে নিয়ে আসবে যেমন করে টেনে আনে আকাশ থেকে ঘুড়িকে।'

‘হ্যাঁ, আবার আমরা মিলব।’ বলল অনুত্তম।

‘মিলব একদিন-না-একদিন। হয়তো দশ বছর পরে।’ বলল সুজন।

‘হয়তো কেন?’ তন্ময় বলল তার স্বভাবসিদ্ধ ঐকান্তিকতার সঙ্গে। এখন থেকে একটা দিন ফেলা যাক। এটা ১৯২৪ সাল। ঠিক এক দশক পরে ১৯৩৪ সালে আমরা যে যেখানে থাকি এইখানে এসে মিলিত হব। এই সাগরতীরে। এই আষাঢ় পূর্ণিমায়।

‘সে কি সম্ভব?’ অনুত্তম আপত্তি জানাল। ‘যদি জেলে থাকি সে সময়?’

‘তার আগেই’ সুজন বলল প্রত্যয়ভরে, ‘দেশ স্বাধীন হয়ে থাকবে।’

‘বলা যায় না। যে শক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ তার হাতে কেবল অস্ত্রবল আছে তা নয়, তার পাতে বিস্তর রুটির টুকরো, মাছের কাঁটা। গোটাকয়েক ছুড়ে ছড়িয়ে দিলে আমাদেরই মধ্যে কামড়াকামড়ি বেধে যাবে। অনায়াসে আরও দশ-বিশ বছর।’

‘বেচারা অনুত্তম!’ কান্তি দরদের সঙ্গে বলল, ‘তোর জন্যে সত্যি খুব দুঃখ হয়। কেন যে তুই নামতে গেলি পলিটিকসে।’

‘তা হলে এখন থেকে দিনক্ষণ স্থির করে ফল নেই,’ তন্ময় বলল নিরাশার সুরে। ‘তবে চেষ্টা করতে হবে দশ বছর পরে মিলতে। কেমন, রাজি?’

‘আচ্ছা।’ বলল অনুত্তম, সুজন, কান্তি।

‘তবে’, কান্তি এটুকু জুড়ে দিল, ‘তন্ময়ের তন্ময়িনী আর সুজনের সুজনিকা এঁদের ‘আচ্ছা’র উপর নির্ভর করছে আমাদের ‘আচ্ছা’। কী বলিস, অনুত্তম?’

‘তুইও যেমন। ভেবেছিস এ জন্মে ওদের বউ জুটবে?’ অনুত্তম বলল সংশয়ের সুরে। ‘জীবনমোহন যা খেপিয়ে দিয়েছেন তার জের চলবে জীবনভোর। আমার আশঙ্কা হয় এ অন্বেষণ ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে আরও কঠিন, আরও সময়সাপেক্ষ।’

বেচারা তন্ময়! সে কী যেন বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। গলায় পাথর চাপা।

তখন সুজন বলল,

‘মরব না কেউ তন্ময়িনী সুজনিকার শোকে।
রূপমতী কলাবতী আছেন মর্ত্যলোকে।’

তা শুনে সকলে হেসে উঠল। এবার তন্ময় তার বাকশক্তি ফিরে পেল। বলল, ‘এখন থেকে যে যার নিজের ইষ্টদেবীর ধ্যান করবে। কার কপালে কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। পুরুষস্য ভাগ্যম। কে জানে হয়তো আমার রূপমতী পৃথিবীর ওপিঠে আছে। ওপিঠে গেলেই দেখতে পাব।’

‘ওপারেতে সব সুখ!’ অনুত্তম ব্যঙ্গ করল।

‘থাক, থাক। ও প্রসঙ্গ আর নয়।’ কান্তি ওদের থামিয়ে দিল। ‘এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র। সত্যি কেউ কি জোর করে বলতে পারে কার বরাতে কী জুটবে—পূর্ণতা কী শূন্যতা কী মামুলি এক উকিল-দুহিতা, সঙ্গে বারো হাজার টাকা পণযৌতুক!’

আর এক দফা হাসির ঢেউ উঠল। ‘তোর ভ্যালুয়েশন বড়ো কম হয়েছে। তন্ময় কখনো ব্যারিস্টারের নীচে নামবে না, যদি নামে তবে বত্রিশের কমে নয়। মানে বত্রিশ হাজারের।’ বলল অনুত্তম।

‘অনুত্তম’, তন্ময় হাসতে হাসতে বলে, ‘তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। ওই চরকার দৌলতে যদি স্বরাজ হয় তা হলে স্বরাজের দৌলতে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বিনা পণে বিয়ে করবি সে আমি লিখে দিতে পারি। কিন্তু শ্বশুর নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিবি। কোনো এক সর্বত্যাগী দলপতি যাঁর দুয়ারে বাঁধা হাতি।’

‘এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র।’ কান্তির এই উক্তির পুনরুক্তি করল সুজন। ‘কাজেই ও প্রসঙ্গ থাক। তা ছাড়া জীবনমোহনের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তার সঙ্গে ও প্রসঙ্গ মানায় না। লক্ষ্য আমাদের উচ্চ।

আমাদের উঠতে হবে সেই উচ্চতায়। আমি তো দেখছি আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে দুঃখ আছে। এসব হালকা কথার দ্বারা কি দুঃখকে উড়িয়ে দেওয়া যায়! তার চেয়ে বল, আমরা দুঃখের জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা রাজপুত্র। রাজকন্যা ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করব না, করতে পারিনে। তার অন্বেষণেই আমাদের যাত্রা। আর কারও অন্বেষণে নয়।'

তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কোনোমতে বলল, 'সুজন, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোকে আমি মিস করব।'

'হে সুজন, শ্রীকান্তির লহ নমস্কার। আমাদের বাণীমূর্তি তুমি।' কান্তি তাকে হাত তুলে নমস্কার করল।

আর অনুত্তম? সে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'জীতা রহো।'

অবশেষে সেই রাতটি এল যার পরের দিন তাদের যাত্রা। চার কুমার চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাবে না। পিছনে পড়ে থাকবে এই বৃক্ষ—এই পুরীর সিন্ধুতীর।

বার বার চোখে জল এসে পড়ে, গলা ভারী হয়ে যায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ওঠে। একজন আরেক জনের হাত চেপে ধরে, ছেড়ে দেয় না। উদাস কণ্ঠে বলে, 'আবার কবে আমাদের দেখা হবে? কবে? কোন অবস্থায়?'

'মনে রাখিস। ভুলে যাসনে।' তন্ময় বলল কান্তিকে। 'তোর যা ভোলা মন।'

'চিঠি লিখিস, যেখানেই থাকিস।' অনুত্তম বলল তন্ময়কে। 'তোর যা কুঁড়ে হাত।'

'লেখাটেখা কাগজে ছাপা হলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিস।' কান্তি বলল সুজনকে। 'তোর যা লাজুক স্বভাব।'

'এবার তো গান্ধী ফিরেছেন। গ্রামে গিয়ে কাজ করতে বলবেন। কলকাতায় এলে খবর দিস।' সুজন বলল অনুত্তমকে। 'তোর যা অফুরান ব্যস্ততা।'

চার জনে চার জনকে কথা দিল, 'নিশ্চয়। নিশ্চয়। সে আর বলতে!'

কিন্তু কথা দিলে কী হবে! প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝল যে, কথা দেওয়া সহজ, কথা রাখা কঠিন। তারা যে ঘাটের নৌকা। ঘাট ছেড়ে ভাসতে শুরু করলে কে যে কোথায় ভেসে যাবে নিজেই জানে না। যোগাযোগ রাখবে কী! তবু বলতে হয়, 'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

পরিকল্পনাও কি ঠিক থাকবে? মূলসূত্র। তার কি কোনো এদিক-ওদিক হবে না? হরি! হরি! মানুষ করবে জীবনের উপর খোদকারি! তবু ওরা পরস্পরকে আশ্বাস দিল যে ওদের এত কালের জল্পনাকল্পনা আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হবে না। এত পরিশ্রম করে যে ভিত গড়া হয়েছে তার গাঁথুনি পাকা।

'কে কী পাবে না পাবে, করবে না করবে, হবে না হবে, কেউ জোর করে বলতে পারে না। কিন্তু আমরা বোধ হয় গর্ব করে বলতে পারি যে আমাদের জীবনের বনেদ কাঁচা নয়। কী বলিস রে, সুজন?'

'যা বলেছিস, অনুত্তম।'

'কান্তির কী মনে হয়?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তন্ময়?'

'আমিও সেই কথা বলি।'

চার জনে চার জনের হাতে রাখি বাঁধে। যদিও রাখিপূর্ণিমার দেরি আছে।

তার পরে উঠল যে-কথা তাদের সকলের মন জুড়ে রয়েছে, অথচ একান্ত নিভৃতে। রাজকন্যার কথা।

'অতীত ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ ব্যর্থ হবে,' বলল সুজন, 'যদি রাজকন্যার অন্বেষণ ছেড়ে অন্যের অন্বেষণ ধরি।'

'যেমন অন্নের অন্বেষণ।' কান্তি ইঙ্গিত করল।

'কিংবা ক্ষমতার।' তন্ময় মন্তব্য করল।

'কিংবা সুখের।' অনুত্তম সতর্ক করে দিল।

কথা যখন নিভে আসছে কথার সলতে উসকে দেয় দু-জন। 'যাকে আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সে হয়তো হাতের কাছে। হয়তো পৃথিবীর ওপিঠে। আমি তাকে হাতের কাছেই খুঁজব। তন্ময় খুঁজবে দেশ-দেশান্তরে।'

'আর আমি খুঁজব', কান্তি বলে, 'রামধনুর রঙে। সব ক-টা রং এক ঠাঁই থাকে না। সব ঠাঁই মিলে এক ঠাঁই।'

'আর আমি খুঁজব সংকটের সংঘাতের মধ্যে। দৈনন্দিনের মধ্যে নয়।' অনুত্তম বিপ্লবের আভাস দেয়।

আবার সুজন অগ্রণী হয়। 'লক্ষ্যের' 'পর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। যেমন ছিল অর্জুনের দৃষ্টি। দ্রোণ যখন পরীক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির বললেন, পাখি দেখছি। অর্জুন বললেন, পাখির চোখ দেখছি। পাখি দেখতে পাচ্ছিনে। তেমনি আমরাও অনেক কিছু দেখতে পাব না। অনেক কিছু দেখলে আসল লক্ষ্যটাই ধোঁয়া হয়ে যাবে।'

'সেইটেই হল ভয়ের কথা।' তন্ময় বলে কান্তির দিকে ফিরে।

'সত্যি তাই।' কান্তি কবুল করে।

'আমার সে ভয় নেই। কেননা আমি যে পরিস্থিতিতে তাকে দেখতে পাব সে পরিস্থিতির জন্যে দেশকে তৈরি করছি।' ইতি অনুত্তম।

রাত অনেক হয়েছিল। সমস্ত রাত জাগলেও কথা কি ফুরোবার! তন্ময় থাকে হোটেলে। তাকে গা তুলতে হল। অগত্যা আর তিন জনকেও। এই তাদের শেষ রাত্রি, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। বিজয়ার দিন যেমন করে তেমনি কোলাকুলি করে তারা বিদায় নিল ও দিল।

'আবার দেখা হবে।' সকলের মুখে এক কথা। 'যেন সঙ্গে দেখি রূপমতী কলাবতী পদ্মাবতী কান্তিমতীকে।'

চার জনে চারখানা রুমাল ভাসিয়ে দিল সমুদ্রের জলে। 'এই রইল নিশান।' তারপরে চার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বন্ধুরা চলে গেল যে যার রাজকন্যার অন্বেষণে। কেউ দক্ষিণ ভারত, কেউ সবরমতী, কেউ বিলেত। সুজন ফিরে গেল কলকাতা। তার রাজকন্যার অন্বেষণে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হতে হবে না। ট্যামার লেনের মাইল খানেক উত্তরে তার রাজকন্যার মায়াপুরী। মানে ছোটো একখানা চাঁপা রঙের বাড়ি।

চাঁপা রঙের বাড়িতে থাকে বকুল নামে মেয়ে। বেথুন কলেজে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ব্রহ্মসংগীত গায়। সুজনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আলাপ। সুজনকে ডাকে সুজনদা। সুজিদা। সুজি। ময়দা। ছোটোবোনের মতো।

বকুল কিন্তু জানে না যে সুজন তাকে পূজা করে। বকুল জানে না, তন্ময় জানে না, অনুত্তম কান্তি এরাও জানে না। জানে কেবল পূজারি নিজে। জানলে কী হবে, তার নিজের মন নিজের কাছেও স্বচ্ছ নয়। কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয় বকুলের সঙ্গ, বকুলের কথা, বকুলের গান। সে কি কাছে না দূরে? যোজন যোজন দূরে। মাটিতে না আকাশে? সাঁঝের আকাশে। সে কি মানুষ না তারা? সন্ধ্যাতারা।

সুজন তার মনের কথা মনে চেপে রাখে। মুখফুটে জানায় না। কিন্তু চোখেরও তো ভাষা আছে। পড়তে জানলে চাউনি থেকেও বোঝা যায়। বকুল কি বোঝে না? কী জানি! হয়তো বোঝে, কিন্তু ভাবে না, ভাবতে চায় না। সে তার নিজের জগতে বাস করে। তার নিজের ভাবলোকে। সেখানে আছে গান আর গুঞ্জরণ আর স্বরসাধনা। আছে বই পড়া আর পরীক্ষা পাস করা। আছে সামাজিকতা আর পারিবারিক কর্তব্য।

আর পূজা কি তাকে ওই একজন করে!

সুজন জানে ওর আশা নেই। সেইজন্যে আরও জোরে রাশ টানে। চিত্তবৃত্তিকে অসম্ভবের অভিমুখে ছুটতে দেয় না। সে পূজা করেই ক্ষান্ত। প্রেম তার কাছে নিষিদ্ধ রাজ্য। ভালোবাসতে তার সাহস হয় না। দেবীকে ভালোবাসার স্পর্ধা কোন পূজারির আছে! সুজন একটু দূরে দূরেই থাকে। রবিবারে রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে যায়। কোনো বার বকুলের নজরে পড়ে, কোনোবার পড়ে না। কিন্তু মাঘোৎসবে মিলেমিশে মন্দির সাজায়। সেই ছেলেবেলার মতো। তখন তো সুজনও গান করত।

পুরীতে চার বন্ধুর মিলিত হবার আগে এই ছিল সুজনের অন্তরের অবস্থা।

তারপর বন্ধুদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ফলে স্থির হয়ে গেল জীবনভোর সে একজনের অন্বেষণ করবে। তার নাম কলাবতী। জীবনে আর কারও অন্বেষণ নয়। কলাবতী কে? বকুল। বকুলের মধ্যেই কলাবতী আছে। খুঁজতে হবে সেই কলাবতীকে। সুজনের অন্বেষণ দেশ থেকে দেশান্তরে নয়। প্রতিমা থেকে প্রতিমার অভ্যন্তরে। পূজারি হবে ধ্যানী। হবে সাধক। দেবী হবে শাশ্বতী নারী। চিরসৌন্দর্যের প্রতীক।

পুরী থেকে যে ফিরে এল সে আরেক সুজন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না তফাত। বড়ো জোর এইটুকু বোঝা যায় যে তার ছাতাখানা হারিয়ে গেছে। এখন তাকে ছাতা মাথায় পথ চলতে দেখা যায় না। আগে তো ছাতা মাথায় ছবিও তোলাতো। সারা কলেজে সে ছিল একচ্ছত্র। সেসব দিন গেছে। তন্ময়ও নেই, কান্তিও নেই, অনুত্তমও নেই। সুজন এখন একা। নতুন কোনো বন্ধুও জুটছে না তার। অবশ্য আলাপীর লেখাজোখা নেই।

মাঝে মাঝে জীবনমোহনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মুখফুটে বলতে পারে না কী ভাবছে, কী অনুভব করছে। বলতে হয় না। তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পান। উৎসাহ দেন।

‘তুমি যাকে খুঁজছ’, জীবনমোহন বলেন, ‘সে তোমার হাতের কাছে। কেন তুমি তীর্থ করতে যাবে, কেন যাবে হিমালয়ে! তোমার বন্ধুরা গেছে, যাক। তাদের জন্যে ভেবো না। তাদের তুলনায় নিজেকে ভাগ্যহীন মনে কোরো না। কার্তিক তো ব্রহ্মান্ড ঘুরে এল। এসে দেখল গণেশ তার আগে পৌঁছে গেছে। অথচ গণেশকে কোথাও যেতে হয়নি। কেবল মা-র চার দিকে একবার পাক দিয়ে আসতে হয়েছে।’

সুজন বল পায়। মনে মনে জপ করে, এই মানুষেই আছে সেই মানুষ। এই নারীতেই আছে সেই নারী। তার সন্ধান জানতে হবে।

সন্ধানের জন্যে সে রাজ্যের বই পড়ল। দেশি-বিদেশি কোনো সাহিত্য বাদ গেল না। শুধু সাহিত্য নয়, দর্শন। শুধু দর্শন নয়, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সেকালের ও একালের ভ্রমণবৃত্তান্ত। তারপর রাজ্যের ছবি দেখল। মূর্তি দেখল। স্টুডিয়োতে স্টুডিয়োতে ঘুরল। অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়ের ওখানে হানা দিল। তারপর গান বাজনার আসরে ও জলসায়, ইউরোপীয় সংগীতের রিসাইটাল-এ হাজির হল। রাজ্যের গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে শেষ কপর্দকটি খরচ করল।

আর বকুল? বকুল জানত না যে সুজন তার জন্যে দুশ্চর তপস্যা করছে। সে তপস্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসে নয়, চোখ-কান-প্রাণ খোলা রেখে যোগাযোগ স্থাপন করে। বকুলের সঙ্গে দেখাশোনা সাত দিন অন্তর হত, যেমন হচ্ছিল। কিন্তু উপাসনার পর আলাপ বড়ো একটা হত না। দু-জনেই অন্যমনস্ক।

দু-জনেই? হ্যাঁ। ওদিকে বকুলেরও অন্য ভাবনা ছিল। বি এ পাস করার পর তার আর পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল না। সে চায় সংগীত নিয়ে থাকতে। কিন্তু তার গুরুজনের সায় নেই। তাকে হয় মাস্টারি করতে হবে, নয় বিয়ে করতে হবে। দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে সময় লাগে। সে সময় নিচ্ছিল। তার হাতে সময় ছিল। তার সময়ের সুযোগ নিচ্ছিল সুজনের সমবয়সি উদ্যোগী যুবকরা। কেউ সন্ধ্যা বেলা গিয়ে গান শুনতে বসত। কেউ দুপুর বেলা গিয়ে স্বরলিপি লিখে দিত। সুজন এদের এড়িয়ে একা বকুলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কি দেখা পেত? দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছে, এদের দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। বাক্যবাণেও। নির্দোষ পরিহাসকেও সে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে সংকুচিত হত।

সুজন একদিন শুনতে চেয়েছিল অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা।' বকুল মুখ খোলবার আগেই একজন শুরু করে দিল, 'মোদের খোরাক মোদের পুঁজি আ মরি ময়দা সুজি!' বেচারা সুজন তা শুনে অপমানে রাঙা হয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

সুজন যদি একটু কম লাজুক হত, যদি একখানা চিঠি লিখে একটুখানি আভাস দিত তা হলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু বকুলের জীবনের সন্ধিক্ষণে সুজনের এই আত্মগোপন দু-জনের একজনের পক্ষেও কল্যাণকর হল না। বকুল শেষপর্যন্ত বিয়ের দিকেই ঝুঁকল। তবে এখন নয়, এখন বাগদান। ছেলেটি বিলেত যাচ্ছিল, বকুলের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। একদিন সুজনের চোখে পড়ল সে আংটি। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুজন সেখান থেকে সরে গেল।

কিন্তু তার তপস্যায় ছেদ পড়ল না। বিয়ে? বিয়ে এমনকী বাধা যে তার দরুন অন্বেষণ ব্যর্থ হবে? বিয়ের পরেও বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। বিয়ে না করলেও যা বিয়ে করলেও তাই। সুজন গভীর আঘাত পেল, কিন্তু আঘাতকে উপেক্ষা করল। মনে মনে জপ করল, 'আরও আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারও।'

বাগদানের পর বকুল চলে গেল শান্তিনিকেতন। সেখানে সংগীতচর্চা করতে। এটা তার ভাবী পরিণেতার ইচ্ছায়। সুজনের সঙ্গে দেখা হল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। তবু সুজনের তপস্যায় ছেদ পড়ল না। অদর্শন? অদর্শন এমন কী বাধা যে তার জন্যে অন্বেষণ বন্ধ হবে? দৃষ্টির অন্তরালেই বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। সুজন কি দিনের বেলা সন্ধ্যাতারা দেখতে পায়? তা বলে কি সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাতারা নয়? সুজন গভীর আঘাত পেল, কিন্তু কাতর হল না। মনে মনে জপ করল, 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো।'

পূজার বন্ধে বকুল বাড়ি এল। ব্রাহ্মসমাজেও তাকে আবার দেখা গেল। সুজন তাকে দেখে স্বর্গ হাতে পেল। চোখের দেখাও যে মস্ত বড়ো পাওয়া। এ কি উড়িয়ে দেওয়া যায়! কলাবতী কি কেবল ধ্যানগোচর? চক্ষুগোচর নয়? দেবতা কি কেবল নিরাকার? সাকার নন? আত্মপরীক্ষা করে সুজন হৃদয়ংগম করল যে নিরাকার উপাসনার মতো সাকার উপাসনাও চাই। নইলে এত লোক দর্শন করতে যেত না।

বকুল আবার অদর্শন হল। এমনি চলতে থাকল কয়েক বছর। এম এ পাস করে সুজন হল একখানা বিখ্যাত মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক। তার তপস্যা তাতে আরও জোর পেল। এত দিন যাকে পড়তে পড়তে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খুঁজছিল এখন থেকে তাঁকে খুঁজতে লাগল লিখতে লিখতে। ঠিক যে এখন থেকে তা নয়। আগেও তো সে লিখত। তবু এখন থেকেই। কেননা এই পরিমাণ দায়িত্ব নিয়ে লেখেনি এর আগে।

বকুল কেমন করে টের পেল তার জন্যে একজন সাধনা করছে। বোধহয় দেবতারা যেমন করে টের পান যে মর্ত্যে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের একমনে ডাকছে। একদিন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বকুলের দিদি পারুল ডেকে পাঠালেন সুজনকে। পারুলদির ওখানে সে বকুলকে দেখবে আশা করেনি। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। পারুলদি কখন এক সময় উঠে গেলেন তাদের দু-জনকে একা রেখে। বেশ কিছুক্ষণ একা ছিল তারা।

এই সুযোগই তো এক দিন অভীষ্ট ছিল সুজনের। অবশেষে জুটল। কিন্তু জুটল যদি, মুখ ফুটল না। বোবার মতো, বোকার মতো বসে রইল সুজন। একটি বার বলতে পারল না, 'ভালোবাসি।' শুধোতে পারল না, 'তুমি আমার হবে?' বকুল যেন নিঃশ্বাস রোধ করে মিনিট গুনছিল, সেকেণ্ড গুনছিল। আজ তার জীবনের একটা দিন। বাগদান ভঙ্গ করা অন্যায়। কিন্তু বকুলকে যারা চেনে যারা জানে তারা তাকে ক্ষমা না করে পারত না। এমনকী স্বয়ং মোহিত ক্ষমা করত তাকে। বকুল এমন মেয়ে যে তার উপর রাগ করে থাকা যায় না।

সুন্দরী? হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু রূপ তার দেহের নয় ততটা, অন্তরের যতটা। মুখে চোখে আলো ঝলমল করছে। সে আলো কোন অদৃশ্য উৎস থেকে আসছে কত লক্ষ-কোটি যোজন দূর থেকে। মাঝে মাঝে তার উপর ছায়া পড়ছে। সামাজিকতার ছায়া। তখন মনে হচ্ছে এই বকুল কি সেই বকুল! ছায়া সরে যাচ্ছে। গান আসছে তার কণ্ঠে। তখন মনে হচ্ছে, এই তো আমাদের চিরদিনের বকুল। এই অচেনাকে চেনার শিকলে কে বাঁধবে! বকুল, তুমি স্বর্গের ছাতি! তুমি দিব্য।

সুজন তাকে বিনা বাক্যে বন্দনা করল। কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারল না যে সে যেন সুজনের হয়। অন্যের বাগদত্তা না হলে কথা ছিল। কিন্তু আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে কি বর পরিবর্তন করতে রাজি হবে! তা ছাড়া আছেই বা কী সুজনের! অবস্থা ভালো নয়। হবেও না কোনোদিন। সে সাহিত্য সৃষ্টি করেই জীবন কাটিয়ে দেবে শত অভাবের মধ্যে। বিয়ে তার জন্যে নয়। তাকে বিয়ে করা মানে দারিদ্র্যকে বিয়ে করা। বকুলের কেন তাতে রুচি হবে! বকুল, তোমাকে যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এর বেশি আশা করিনে। করতে নেই।

ওরা দু-জনে এত কাছাকাছি বসেছিল যে একজনের নিঃশ্বাস পড়লে আরেকজন শুনতে পায়। নিঃশ্বাস পড়ছিল অনেকক্ষণ বিরতির পর। সে বিরতি উৎকণ্ঠায় ভরা। আগে কথা বলার পালা সুজনের, কিন্তু সুজন যখন কিছুতেই মুখ খুলবে না তখন বকুলকেই অগ্রণী হতে হবে।

'তারপর, সুজিদা,' বকুল বলল সকৌতুকে, 'তুমি নাকি কার জন্যে তপস্যা করছ।'

'কে, আমি?' সুজন বলল চমকে উঠি। 'তপস্যা করছি! কই, না!'

'হ্যাঁ, সেইরকমই তো মালুম হচ্ছে।' হেসে বলল বকুল, 'কিন্তু কোন দেবতার জন্যে? কোথায় তিনি থাকেন? স্বর্গে না মর্ত্যে? মর্ত্যেই যদি থাকেন তবে তো একখানা চিঠিপত্তর দিতে পারতে। বিল্বপত্তর, তুলসীপত্তর দিয়ে কী হবে?'

সুজন এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। বকুলের সঙ্গে তার যা সুবাদ তাতে একখানা কেন দশখানা চিঠি দেওয়া চলে। কিন্তু কী লিখবে চিঠিতে? লিখতে হাত কাঁপে। অথচ এই সুজনেরই লেখায় মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ।

'দিয়ো। বুঝলে?' বকুল একটু পরে বলল।

এই ঘটনার কয়েক মাস বাদে আর একটা ঘটনা ঘটে। তবে সেটা খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বকুলের বিয়ে। মোহিত বিলেত থেকে ফিরে কলম্বোতে চাকরি পেয়ে কলকাতা এসে বকুলকে বিয়ে করে। কন্যাযাত্রীদের দলে সুজনকে দেখা যায়। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল ঠিকই। যদিও মুখ দেখে বোঝবার জো ছিল না।

এমন একজনও বন্ধু ছিল না যে তার মনের ভিতরটা দেখতে পায় বা যাকে সে তার মনের মণিকোঠার দ্বার খুলে দেখাতে পারে। কান্না ঠেলে উঠছে বুক থেকে চোখে, তবু তার চোখের কোণে জল নেই। আর পাঁচ জনের মতো সেও সুখী যে বকুলের বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। বকুল সুখী হবেই। না হয়ে পারে না। সুজনের সঙ্গে বিয়ে হলে কি পাঁচজনে সুখী হত? বরং এই ভেবেই অসুখী হত যে মেয়েটা কী ভুলই না করেছে।

বকুলের মা বাবা ভাই বোন সকলেই সুখী। কেবল পারুলদির ব্যবহার একটু কেমনতরো। শান্তশিষ্ট সরল মানুষটি কেমন যেন থ' হয়ে গেছেন। বোধহয় ভাবছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে বকুলের? সে কি সত্যি পারবে সারাজীবন মোহিতের ঘর করতে? মোহিতের ছেলে-মেয়ের মা হতে? পারবে না কেন? তবে খুশি না দায়ে পড়ে? পারুলদি বার বার সুজনের দিকে তাকান আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আর বকুল? সে চিরদিন যেমন আজও তেমনি সপ্রতিভ। এটা যে একটা বিশেষ দিন, যাকে বলে জীবনে একটা দিন, এর জন্যে সে বিশেষ সুখী বা বিশেষ অসুখী বলে মনে হয় না। তার ভাবখানা যেন—বিয়ে হচ্ছে নাকি? আচ্ছা, হোক।

সে যেন সাক্ষী। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী।

বকুলরা কলম্বো চলে যাবার পর সুজনের জীবনযাত্রায় তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। কলাবতীর অন্বেষণ সমানে চলল। কলাবিদ্যায় বিদ্বান হয়ে উঠল সুজন। তার রচনায় মাধুর্য এল, এল প্রসাদগুণ, এল ফোটা ফুলের সুষমা। আর অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ। পালিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অ-ধরাছোঁয়া সুগন্ধ। যারা পড়ে তারা হাতড়ে বেড়ায়, হাতে পায় না। বার বার পড়ে। মুগ্ধ হয়। চিঠি লিখে সুজনকে জানায় ধন্যতা।

চিঠি লেখে মেয়েরাও। সমবয়সি, অসমবয়সি, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, দূরস্থিতা, অদূরস্থিতা। কেউ কেউ দেখা করতে চায়। দেখা করেও। অটোগ্রাফের ছলে। তর্ক-বিতর্কের ছলে। সুজন উত্তর দেয় বই কী। উত্তর দেয় দু-চার কথায়। কিন্তু হৃদয় ভেঙে দেখায় না। দেখাতে পারেও না।

বকুলকে, কলাবতীকে কেউ আচ্ছন্ন করবে না। সন্ধ্যাতারা ঢাকা পড়বে না কোনো নীলনয়নার কালো কেশপাশে। শাশ্বত সৌন্দর্য হতে ভ্রষ্ট হবে না ভ্রমর। বিয়ে করবে না সুজন। আজীবন? হ্যাঁ, যত দূর দৃষ্টি যায়, আজীবন।

জীবন এমন কিছু দীর্ঘ নয়। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও হয়তো তেমনি বছর পঁয়ত্রিশ বাঁচবে। তার বাবা জীবিত। মেদিনীপুরে কাজ করেন। সামনেই তাঁর অবসরগ্রহণ। কলকাতার বাসায় সুজন থাকে ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে। তারা পড়াশোনা করে। অভাবের সংসার। বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে না কেউ।

কলম্বোতে বকুল কেমন আছে কে জানে! খবর নেয়নি সুজন। চিঠি লিখতে পারত, কিন্তু কী লিখবে? বকুলও চিঠি লেখে না। কেনই বা লিখবে? ইচ্ছা করে পারুলদিকে জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গেলে তো। পূর্বের মতো ধর্মভাব নেই, কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

জীবনমোহনের কাছে যায়। তিনিই তার ধর্মযাজক। রবিবারেই সুবিধা। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি থাকেন। সুজনকে সঙ্গ দেন। ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অবশ্য লৌকিক অর্থে। কিন্তু যা নিয়ে আলোচনা করেন তা ধর্ম নয় তো কী!

'সুজন, তোমার কবিতায় রং লেগেছে।' বলেন জীবনমোহন। 'লিখে যাও, দোস্ত। তুমি হবে বাংলার হাফিজ।'

সুজন তা শুনে সংকোচ বোধ করে। কতটুকু তার অনুভূতির ঐশ্বর্য। সামান্য পুঁজি নিয়ে কারবারে নামা। তাও যদি ভাষায় ব্যক্ত করতে জানত। পনেরো আনাই অব্যক্ত থেকে যায়। নিজের অক্ষমতায় সে নিজেই লজ্জিত। সমালোচকরা বেশি কী লজ্জা দেবে। কিন্তু কেউ সুখ্যাতি করলে সে সংকোচে মাটিতে মিশে যায়। বিশেষত জীবনমোহনের মতো জীবনরসিক।

'এ তোমার বুকের রক্ত। পাকা রং।' বলেন জীবনমোহন।

পারিবারিক পেষণে বাধ্য হয়ে সুজনকে মাসিকপত্রের কাজ ছেড়ে কলেজের চাকরি নিতে হল। এ-রকম তো কথা ছিল না। এটা তার পরিকল্পনার বাইরে। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। যা ভয় করেছিল তাই। পড়া আর পড়ানো, খাতা দেখা আর প্রিন্সিপ্যালের ফাইফরমাশ খাটা, এই করে দিন কেটে যায়। রাতও। সৃষ্টি করবে কখন? ছুটির সময়ও ছুটি মেলে না। এগজামিন বা অন্য কিছু। সুজনের লেখা কমে এল, কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হতে বসল। হাতও খারাপ হয়ে গেল পাঠ্যপুস্তক লিখে।

বিপদ কখনো একা আসে না। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। চাকরি হতে-না-হতেই আসতে লাগল বিয়ের সম্বন্ধ। একটার পর একটা সম্বন্ধ উলটিয়ে দেবার ফলে বাপের সঙ্গে বাধল খিটিমিটি। তিনি পেনশন নিয়ে বেকার বসে আছেন। হাতে কাজ নেই। নিষ্কর্মা হলে যা হয়। প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চাই। 'কেন তুমি বিয়ে করবে না? লেখাপড়ায় ভালো, গৃহকর্মে নিপুণ, সুশ্রী, সচ্চরিত্র, ভদ্রলোকের মেয়ে। তার উপর কিছু পণযৌতুকও আছে। কেন তা হলে তোমার অমত? তোমরা ক-ভাই যদি বিয়ে না কর, যদি পারিবারিক তহবিলে কিছু আমদানি না হয় তা হলে ছোটো বোনগুলির বিয়ে দেবে কী করে? ইতিমধ্যে যে রপ্তানিটা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হবে কী উপায়ে?'

এ যুক্তি খন্ডন করা শক্ত। সুজন পারতপক্ষে বাপের ছায়া মাড়ায় না। বাবা আসছেন শুনলে চোঁচা দৌড় দেয়। যঃ পলায়তি স জীবতি।

শেষকালে তিনি তাকে ফাঁপরে ফেললেন। কোথায় একটি মেয়ে দেখতে গিয়ে কথা দিয়ে এলেন। সুজনকে জানতেও দিলেন না যে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। ছাপাখানায় গিয়ে শুনতে পেল তার বিয়ের চিঠি ছাপা হচ্ছে। দেখে তার চক্ষুস্থির। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবে তেমন বীরপুরুষ নয় সে। বাপের সামনে মুখ তুলে কথা কইতে জানে না। তা হলে কি বিয়েই করতে হবে তাকে? কলাবতীকে ভুলতে হবে?

কদাচ নয়। সেই দিনই সুজন তার প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করে পাঠ্যপুস্তকগুলোর কপিরাইট বেচে দিল। তারপর রাতারাতি পাসপোর্ট জোগাড় করে চাঁদপালঘাটে জাহাজ ধরল লণ্ডনের। জাহাজ যাবে কলম্বো হয়ে। চিঠি লিখল বকুলকে।

কলম্বোর জাহাজঘাটে অপেক্ষা করছিল বকুল ও তার স্বামী। সুজনকে বলল, 'চলো আমাদের সঙ্গে। জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে।'

আবার যখন জাহাজে উঠল ততক্ষণে মোহিতের সঙ্গে সুজনের খুব জমে গেছে। বিলেতে কোথায় উঠবে, কী খাবে, এইরকম এক-শো রকমের টুকিটাকি নিয়ে আলাপ। বকুল আশা করেছিল সুজন তার দিকে একটু মনোযোগ দেবে। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে? সুজন অমনোযোগের ভান করল। কিন্তু লক্ষ করল যে বকুলকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

এ সৌন্দর্য সাজপোশাকের নয়, প্রসাধনের নয়, দেহচর্যার তো নয়ই, রূপচর্যার নয়। এ কি তবে গন্ধর্ববিদ্যা অনুশীলনের ফল? কোনখানে এর উৎপত্তি? সংগীতলোকে? যে সংগীত আকাশে আকাশে, গ্রহতারায়, আলোকে আগুনে, বিশ্বসৃষ্টিতে? প্রাচীনরা যাকে বলতেন দ্যুলোকের সংগীত?

অথবা এর মূল বিশুদ্ধ নির্মল মানবাত্মার? যার আভা সব আবরণ ভেদ করে ফুটে বেরোয়? অক্ষয় অব্যয় অব্রণ। এ কি তবে অনির্বচনীয় আত্মিক সৌন্দর্য।

সুজন ভাবে, শেলি যাকে বলেছেন ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি সে কি এই নয়?

জাহাজ যখন ছাড়ি ছাড়ি করছে, জাহাজ থেকে দর্শকদের নামবার সময় হয়েছে, তখন বকুল বলল, ‘সুজিদা, মনে রেখো।’ ইংরেজি করে বলল, ‘ফরগেট মি নট।’

কী যে ব্যাকুল বোধ করল সুজন! মনে হল আর দেখা হবে না হয়তো। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জাহাজ থেকে, জাহাজঘাটের দিকে। ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে গেল সব। ফুটে উঠল শুধু একখানি মুখ। সাঁঝের তারার মতো।

এই সেই কলাবতী, যার ধ্যান করে এসেছে সুজন। চিরন্তনী নারী। এর সৌন্দর্য যে উৎস থেকে আসছে তার নাম চিরন্তন নারীত্ব। পৃথিবীতে যখন একটিও নারী ছিল না, যখন পৃথিবীই ছিল না, তখনও তা ছিল। বিশ্ব যখন থাকবে না তখনও তা থাকবে।

সুজনের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছোল। সেখানে সে একটা কাজ জুটিয়ে নিল। স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস নামক প্রতিষ্ঠানে। সঙ্গে সঙ্গে পি এইচ ডি-র জন্যে থিসিস লিখতে উদ্যোগী হল। দেশে ফিরতে তাড়া ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না। ফিরে এলে আবার তো সেই বিয়ের জন্যে ঝোলাঝুলি শুরু হবে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া।

সেই সুদূর প্রবাসের শূন্য মন্দিরে মনে পড়ে একখানি মুখ। চিরন্তনী নারী। শাশ্বত সৌন্দর্য। অমনি আর সকল মুখ মায়া হয়ে যায়। ইংরেজ মেয়ের মুখ, ফরাসি মেয়ের মুখ, প্রবাসিনী বাঙালি মেয়ের মুখ, কাশ্মীরি মেয়ের মুখ ছায়া হয়ে যায়, মায়া হয়ে যায়। সুজন মেশে তাদের সঙ্গে, মিশবে না এমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নেই তার। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আড়াল হতে দেয় না তার সন্ধ্যাতারাকে, তার বকুলকে। সে যে কলাবতীর অন্বেষণে বেরিয়েছে। আর কারও সন্ধানে নয়।

সুজন যখন ইংল্যাণ্ডে যায় তার আগে তন্ময় সেখান থেকে চলে এসেছে। দুই বন্ধুর দেখা হল না। শুনতে পেল তন্ময় নাকি বিয়ে করেছে। কিন্তু কাকে, কবে, কোথায়, কী বৃত্তান্ত কেউ সঠিক বলতে পারে না। তন্ময়ের ঠিকানায় চিঠি লিখবে ভাবল। কিন্তু আর দশটা ভাবনার তলায় সে ভাবনা চাপা পড়ে থাকল।

বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে জীবনমোহনকে প্রণাম করে তন্ময় যাত্রা করল পশ্চিমমুখে। কানে বাজতে থাকল তাঁর শেষ উক্তি, ‘উত্তমা নায়িকার সাক্ষাৎ লাভ করো। জীবনে যা কিছু শেখবার যোগ্য সে-ই তোমাকে শেখাবে। অন্য গুরুর আবশ্যক হবে না।’

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে দেখল অক্সফোর্ডে তার জন্যে আসন রাখা হয়েছে। সুবিখ্যাত ক্রাইস্টচার্চ কলেজ। সেখানকার সে আবাসিক ছাত্র। খেলোয়াড় সর্বত্র পূজ্যতে। দেখতে দেখতে তার এনগেজমেন্ট ডায়েরি ভরে গেল আমন্ত্রণে আহ্বানে। টেনিস খুলে দিল বনেদি সমাজের দ্বার। যে দ্বার বিদ্বানের কাছেও বন্ধ থাকে।

যার দরুন তার এত খাতির সেই খেলার উপর জোর দিতে গিয়ে অন্য কিছু হয় না। হয় না উত্তমা নায়িকার অন্বেষণ। অনায়াসে যাদের সঙ্গে ভাব হয় তাদের সঙ্গ তাকে ক্ষণকালের জন্যে আবিষ্ট করে। তারপরে রেখে যায় তীব্রতর তৃষা। কোথায় তার রূপমতী, কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে ছাড়া আর কোনো নারী নেই ভুবনে।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। কেম্ব্রিজকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে নাম কিনল যারা তন্ময় তাদের একজন। পক্ষপাতীদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে গেল তার। র‍্যাকেটখানা বগলে চেপে স্কার্ফ গলায় ঘুরিয়ে বেঁধে ক্রিম রঙের ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স পরা ছ-ফুট লম্বা দোহারা গড়নের নওজোয়ান বিশ্রাম করতে চলল প্যারিসে।

বিশ্রামের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা বটে প্যারিস। সেখানেও খেলার জন্যে আহ্বান, আহারের জন্যে আমন্ত্রণ। খেলোয়াড়দের না চেনে কে। ছোটো ছেলেরা পর্যন্ত তাদের ছবি কেটে রাখে। যেই রাস্তায় বেরোয় অমনি কেউ-না-কেউ দু-তিন বার তাকায়, একটুখানি কাশে, তারপর কাছে এসে মাফ চায় ও বলে, আপনি কি সেই বিখ্যাত—?

মিথ্যে বলতে পারে না। স্বীকার করে। তখন কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় খেলোয়াড়রা এসে হাতে হাত মেলায় আর বলে যুদ্ধং দেহি। হাতে ব্যথা শুনেও কি কেউ ছাড়ে! এনগেজমেন্ট ডায়েরি আবার ভরে যায়। এবার শুধু টেনিস কোর্ট ও ক্লাব নয়। কাফে রেস্তরাঁ ক্যাবারে নাচঘর। ব্যথা ধরে যায় কোমরে ও পায়ে।

বনেদি ঘরের না-হোক, ঘরের না-হোক, কত স্তরের কতরকম রঙ্গিণীর সঙ্গে পরিচয় হল তার! রূপের ঝলক, লাবণ্যের ঝিলিক, লাস্যের ঝলসানি লাগল তার নয়নে, তার অঙ্গে, তার মানসে, তার স্বপ্নে। কিন্তু কই, রূপমতী কোথায়! কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে সূর্যের মতো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এইসব শিশিরবিন্দুতে, ঝিকিমিকি করছে এইসব মণিকণিকায়! এরা নয়, এরা কেউ নয়।

বিশ্রামের হাত থেকে বিশ্রাম নেবার জন্যে তাকে দৌড় দিতে হল দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরায়। নিসের কাছে ছোট্ট একটি না-শহর না-গ্রাম। সেখানকার সমুদ্রের গাঢ় নীল তার চোখে নীলাঞ্জন মাখিয়ে দিল। আর সে কী হাওয়া! একেবারে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। ঘুমপাড়ানি গেয়ে শোনায় পাইন বন, জলপাই বন। শুয়ে শুয়েই কেটে যায় দিন। একটু কষ্ট করে খেতে বসতে হয়। এই যা কষ্ট।

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও তন্ময় ফিরে যাবার নাম করে না ইংল্যাণ্ডে। অকারণে শুয়ে শুয়ে কাটায় রিভিয়েরায়। একজন ডাক্তারও পাওয়া যায় যে তাকে শুয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়। যাতে তার ব্যথা সারে। মন বলে, সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মনের অতল থেকে ধ্বনি আসে, স্থির হয়ে থাকো। ঘুমন্ত পুরীর রাজপুত্রের মতো নিষ্কম্প, অতন্দ্র।

ঘুম পায়, তবু ঘুমোতে পারে না। শুয়ে থাকে, তবু ঘুমোয় না। এইভাবে কত কাল কাটে। পাঁজির হিসাবে যা আড়াই মাস ঘুমন্ত পুরীর হিসাবে তা আড়াই বছর। জেগে থেকে তন্ময় যার ধ্যান করে সে কোন দেশের

রাজকন্যা কে জানে! কোন যুগের তাও কি বলবার জো আছে! যুগনির্ণয়ের একটা সহজ উপায় বেশভূষা অঙ্গসজ্জা। কিন্তু তন্ময় যার ধ্যানে বিভোর সে দিগবসনা।

বড়োদিন এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এল একঝাঁক টুরিস্ট।

কেউ-বা তাদের ফরাসি, কেউ ইংরেজ, কেউ আমেরিকান, জার্মান, ওলন্দাজ। একদল ভারতীয় উঠল তন্ময়ের হোটেলে। দল ঠিক নয়, পরিবার। পাগড়ি বা দাড়ি দেখে মালুম হয় শিখ। বাপ আর ছেলে, মা আর দুই মেয়ে। এ ছাড়া একজন সেক্রেটারি ভদ্রলোক। ইনি বোধ হয় শিখ নন, তবে পাঞ্জাবি। যে টেবিলে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছিল সেটি তন্ময়ের টেবিল থেকে বেশ কিছু দূরে। নানা ছলে সে তাঁদের লুকিয়ে দেখছিল। তাঁদের দৃষ্টি কিন্তু তার উপর পড়ছিল না। পড়লে কি সে খুশি হত? না, সে লুকিয়ে থাকতেই চায়। এই প্রথম সে তার চেহারার জন্যে লজ্জিত হল। এঁদের না দেখে কে তার দিকে তাকাবে!

সমুদ্রের ধারে যেখানে সাধারণত সে শুয়ে থাকত সেখানে যেতেও তার অরুচি। সেটা সকলের নজরে পড়ে। তা বলে তো ওঘরে বন্ধ থাকা যায় না। তন্ময় তা হলে কী করবে? পালাবে? না, পালাতেও পা ওঠে না। ভাবল ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আপনাকে গোপন করবে। কিন্তু সাদা মানুষের ভিড়ে কালো মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে না। ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল তন্ময়। কিন্তু তার চেয়েও অস্বস্তি বোধ করছিল তার টেবিলের জনা কয়েক ভারতফেরতা শ্বেতাঙ্গ। তারাই তলে তলে ষড়যন্ত্র করে তাকে চালান করে দিল ভারতীয়দের টেবিলে। হোটেলের ম্যানেজার স্বয়ং তাকে অনুরোধ জানালেন তার স্বদেশীয়দের সঙ্গ দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত করতে।

শিখ ভদ্রলোক তাকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করলেন ও পরিবার পরিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমাদের মহারাজ ফরাসি সভ্যতার পরম ভক্ত। ফরাসিতে কথা বলেন, ফরাসিতে উত্তর শুনতে ভালোবাসেন। আমরা যাঁরা তাঁর আমির-ওমরাহ আমরাও ফরাসি কেতায় দুরস্ত। বছরে দু-বছরে একবার করে এদেশে আসি এদের চালচলনের সঙ্গে তাল মেলাতে। আমার বড়ো মেয়ে 'রাজ' এই দেশেই মানুষ হয়েছে। ছোট মেয়ে 'সুরজ' এখন থেকে এদেশে পড়বে। বড়ো মেয়ে আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে। কিন্তু একমাত্র পুত্র মাহীন্দরকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সে চায় অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে যেতে। কিন্তু মহারাজের অভিপ্রায় তা নয়।'

ভদ্রলোক চাপাগলায় বললেন, 'ইংরেজ আমাদের পায়ের তলায় রেখেছে, সে-কথা কি আমরা এক দিনের জন্যেও ভুলতে পেরেছি। শিক্ষার জন্যে আর যেখানেই যাই, ইংল্যাণ্ডে নয়। ফরাসিতে কথা বলে মহারাজ ইংরেজকে অপ্রতিভ করতে ভালোবাসেন। ওরা তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলাতে পারেনি। আমরা অবশ্য ইংরেজিও জানি ও বলি। সেটা তাঁর পছন্দ নয়।'

তন্ময় শোনবার ভান করছিল। কিন্তু শুনছিল না। তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল তার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি। পার্শ্ববর্তিনী বলেছি, বলা উচিত দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী। কেননা বাম পাশে বসেছিলেন সরদার রানি। উঁহু। বলা উচিত সে বসেছিল সরদার রানির ডান পাশে। আর তার ডান পাশে 'রাজ'।

কী চোখে যে দেখল তাকে তন্ময় তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মনের ভিতর থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল, যাকে এতদিন খুঁজছিলে রাজপুত্র, এই সেই রাজকন্যা রূপমতী। সে ধ্বনি এতই স্পষ্ট যে হঠাৎ মনে হয় কাছে কোথাও সোনার শুক আছে, তারই কণ্ঠস্বর।

এই আমার রূপমতী। এই আমার অদৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হল তন্ময়ের। আনন্দ করবে কী। বিষাদে ভরে গেল অন্তর। মনে পড়ল জীবনমোহনের আর একটি উক্তি, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্যে। সুখ যে কোনোদিন আসবে না তা নয়। আপনি আসবে, আপনি যাবে, তার আসা-যাওয়ার দ্বার খোলা রেখো।

এই আমার অদৃষ্ট। অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থ হয়ে গেল তন্ময়। একে পাব কি না জানিনে, পেলে ক-দিন ধরে রাখতে পারব, যদি আপনা থেকে ধরা না দেয়। অথচ এরই অনুসরণ করতে হবে চিরদিন

ছায়ার মতো। এখন থেকে অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণের অন্য কোনো অর্থ নেই।

'রাজ' ফরাসি ভাষায় কী বলল তন্ময় বুঝতে পারল না। তখন ইংরেজিতে বলল, 'শুনতে পাই বাঙালিরা নাকি ভারতবর্ষের ফরাসি। সত্যি?'

'সেটা আপনাদের সৌভাগ্য।' তন্ময় বলল কৃতার্থ হয়ে। 'তবে পাঞ্জাবিদের কাছে কেউ লাগে না। তারা ভারতের খড়্গবাহু।'

সরদার সাহেব তা শুনে হো-হো করে হাসলেন। 'তা হলে ভারত পরাধীন কেন?'

সরদার রানি মন্তব্য করলেন, 'বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগাযোগ ছিল না বলে।'

'তা হলে', সরদার বললেন, 'আজ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা হোক।' এই বলে বাংলার 'স্বাস্থ্য' পান করলেন।

এর উত্তরে পাঞ্জাবের 'স্বাস্থ্য' পান করতে হল তন্ময়কে।

এমনি করে তাদের চেনাশোনা হল। তন্ময়ের আর তার রূপমতীর। কথাবার্তার স্রোত কতরকম খাত ধরে বইল। কখনো টেনিস, কখনো ঘোড়দৌড়, কখনো ভাগ্যপরীক্ষা ও জুয়োখেলা যার জন্যে রিভিয়েরা বিখ্যাত। কখনো শিকার, কখনো মাছ ধরা, কখনো বাচ খেলা যার জন্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিখ্যাত। কখনো দোকানবাজার, কখনো পোশাক পরিচ্ছদ, কখনো আমোদপ্রমোদ যার জন্যে প্যারিস বিখ্যাত।

বিকেলে ওরা একসঙ্গে বেড়াতে গেল। দু-জনে মিলে নয়, সবাই মিলে। তন্ময় বেশিরভাগ সময় মাহীন্দরের কাছাকাছি। রাজকে আর একটু ভালো করে দেখবার জন্যে দূরত্ব দরকার। যতই দেখছিল ততই বুঝতে পারছিল এ সৌন্দর্য হীরা-জহরতের নয়, নয় নীল বসনের, নয় আঁকা ভুরুর, নয় রাঙানো গালের। মিলো দ্বীপের এ ভিনাস মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃতির কৃতি। কোনোখানে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ নেই, অনাবশ্যক রেখা নেই, অনুপাতের ভুল নেই, সুষমতার খুঁত নেই। দীঘল গড়ন। দুধবরন। মিশকালো চুল বাবরির মতো ছাঁটা। কাঁটা বা ক্লিপ বা ফিতে লাগে না। মিশকালো চোখ ঘন পদ্মে ঢাকা। তাকায় যখন আসমানে তারা ফোটে। আর চলে যখন মাটিতে ঝরনা বয়ে যায়।

রূপসি? হাঁ, অনুপম রূপসি। লাবণ্যবতী? হ্যাঁ, অমিত লাবণ্যবতী। এই আমার রূপমতী। আমার উত্তমা নায়িকা। আমার অদৃষ্ট। এরই অনুসরণ করতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও বটে। যদি বিয়ে হয়। হবে কি? কে জানে! তন্ময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সবচেয়ে ভাবনার কথা রূপমতীর যদি আর কারও সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। যদি না হয় বাজ বাহাদুরের সঙ্গে। অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট দেখতে পায় তন্ময়, তার কোলে তার রূপমতী আর তার ঘোড়ার পিঠে সে বাজ বাহাদুর। ঘোড়া ছুটছে বিজলির মতো, বজ্রের মতো গর্জে উঠছে সরদার সাহেবের বন্দুক। পিছনে ধাওয়া করছে শিখ ঘোড়সওয়ার দল।

বর্ষশেষের রাত্রে ফ্যান্সি ড্রেস বল হল হোটেলের বলরুমে। তন্ময় সেজেছিল বাজ বাহাদুর। কেউ জানত না কেন। আর রাজ সেজেছিল রাজপুতানি। সেটা তন্ময়ের ইঙ্গিতে। গ্র্যাণ্ড মোগল সেজে সরদার সাহেবের মেজাজ খুশ ছিল। আর সরদার রানির হাসি ধরছিল না মমতাজ মহল সেজে। সে রাত্রের উৎসবে কে যে কার সঙ্গে নাচবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না, বাছবিচার ছিল না। তন্ময় আর্জি পেশ করল, রাজ মঞ্জুর করল। বাপ-মা কিছু মনে করলেন না। নাচে তন্ময়ের কিছু স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। রাজ পছন্দ করল তাকেই বার বার। রাত বারোটা বাজল, নতুন বছর এল, উল্লাসমুখরিত কক্ষে কেউ লক্ষ করল না এদের দু-জনের ঘোড়া ছুটেছে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে, কোন দুর্গম দুর্গে, কোন নিভৃত কুঞ্জে। তন্ময় কানে কানে বলল, 'এই গল্পের শেষে কী? বিচ্ছেদ না মিলন?' রাজ কানে কানে বলল, 'যেটা তোমার খুশি।' তন্ময়ের বুক দুলে উঠল। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে বলতে পারল, 'জগতের সবচেয়ে সুখী পুরুষ আমি। কিন্তু বলেই তার মনে হল, 'তাই কি? এত রূপ নিয়ে কেউ কখনো সুখী হতে পারে?'

সরদার সাহেবরা এর পরে জেনেভায় চললেন। তন্ময় ফিরে গেল অক্সফোর্ডে। কিন্তু সেখানে তার একটুও মন লাগল না। খেলতে গিয়ে বার বার হারে, পড়তে গিয়ে আনমনা থাকে। কেউ ডাকলে যায় না, গেলে চুপ করে থাকে। ওদিকে চিঠি লেখালেখি শুরু হয়েছিল। ওরা জেনেভা থেকে প্যারিস হয়ে দেশে ফিরছে শুনে তন্ময় বুঝতে পারল এই তার শেষ সুযোগ। এখন যদি বিয়ের প্রস্তাব করে তা হলে হয়তো একটুখানি আশার আমেজ আছে। দেশের মাটিতে যেটা দিবাস্বপ্ন প্যারিসের আবহাওয়াতে সেটা সত্য হয়ে যেতেও পারে।

সুরজকে প্যারিসে রেখে মাহীন্দরকে জেনেভায় দিয়ে রাজকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন তাদের মা-বাবা। তন্ময় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করল। তাঁরা বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ। তুমি আমাদের ছেলে। তাই ছেলের মতো আবদার করছ। কিন্তু, বাবা, এমন আবদার করতে নেই। তোমার জানা উচিত যে আমাদের সমাজে এটা অচল। আর আমরা তো সত্যি ফরাসি নই, আমরা শিখ। তোমাকে আমরা কলকাতায় খুব ভালো ঘরে বিয়ে দেব। সেও খুব সুন্দরী হবে।'

'আমি যদি আপনাদের ছেলে হয়ে থাকি,' তন্ময় বলল বুদ্ধি খাটিয়ে 'তা হলে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনাদের রাজ্যে। সেখানে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দেবেন। আপনাদের কাছাকাছি থাকব।'

'সে কী!' সরদার সাহেব অবাক হলেন, 'তুমি অক্সফোর্ডের পড়া শেষ না করেই সংসারে ঢুকবে! কোনো বাপ কোনো ছেলেকে এমন পাগলামি করতে দেয়!'

সরদার রানি বললেন, 'তোমার বাবা আমাদের ক্ষমা করবেন না, বাচ্চা।'

তন্ময় কিন্তু সত্যি সত্যিই তল্পি তল্পা গুটিয়ে তাঁদের সঙ্গে জাহাজে উঠে বসল। তার মন বলছিল এই তার শেষ সুযোগ, সুযোগভ্রষ্ট হয়ে অক্সফোর্ডে সময়পাত করা মূর্খতা। একটা পন্ডিতমূর্খ হয়ে সে করবে কী! সবাই যা করে তাই? চাকরি, বিয়ে, বংশবৃদ্ধি? সেটা তো রূপমতীর অন্বেষণ নয়, সেটা রৌপ্যবতীর অন্বেষণ।

রাজ সুখী হয়েছিল তন্ময়ের নিষ্ঠায়। কিন্তু তার মা-বাবার মুখ অন্ধকার। এ আপদ কবে বিদায় হবে কে জানে! এ যদি মেয়ের মন পায় তা হলে সে কি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি হবে? তন্ময় কল্পনা করেনি তাঁদের আরেক মূর্তি দেখবে। কথা বলবেন কী, লক্ষ্যই করেন না তাকে। আমলেই আনেন না তাঁর অস্তিত্ব। সে যদি গায়ে পড়ে ভদ্রতা করতে যায় এমন সুরে ধন্যবাদ জানান যে মুর্দাবাদ বললে ওর চেয়ে মিষ্টি শোনায়। বেচারা তন্ময়!

আত্মসম্মান যার আছে সে করাচীতেই সরে পড়ত, কিংবা বড়োজোর লাহোর পর্যন্ত গিয়ে কেটে পড়ত। কিন্তু তন্ময়ের গায়ের চামড়া মোটা। সে মান-অপমান গায়ে মাখল না। সরদার সাহেব তাকে নিয়ে করেন কী! অক্সফোর্ডক ফেরতা ভদ্রলোকের ছেলেকে তো সকলের সামনে ধমকাতে পারেন না। শুধু তাই নয়, সে নামকরা খেলোয়াড়। খেলোয়াড়কে তিনি সমীহ করেন। ছেলেটি তো দেখতে-শুনতে খারাপ নয়, গুণীও বটে। জাতে বাধে, নইলে মন্দ মানাত না মেয়ের সঙ্গে। গৃহিণীও সেই কথা বলেন।

চলল তন্ময় শিখ রাজ্যে। অতিথি হয়ে। তারপর মহারাজার খেলোয়াড় দলে টেনিসের 'কোচ' নিযুক্ত হয়ে সে হোটেলে জাঁকিয়ে বসল। তার খরচের হাত দরাজ। যা পায় ফুঁকে দেয় আদর আপ্যায়নে। খোশ গল্পে তার জুড়ি নেই। স্বয়ং মহারাজ তাকে ডেকে পাঠান তার 'কিসসা' শুনতে। বাঙালিকে সেখানে বোমারু বলেই জানে পাঁচজনে। খাতিরটা ওর দৌলতেও জুটল। তবে পুলিশের খাতায় নাম উঠল।

ওদিকে যে জন্যে তার এতদূর আসা সে জন্যেও তার চেষ্টার অবধি ছিল না। রাজ আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে তাকে বাক্য দিল। কিন্তু মা বাপের অমতে তাকেও বিয়ে করবে না বলে মাফ চাইল। তন্ময় দেখল এটা মন্দের ভালো। মেয়ে চিরকুমারী থাকে কোন বাপ মা-র প্রাণে সয়! এঁরাও মত না দিয়ে পারবেন না।

হলও তাই। মহারাজার নির্বন্ধে বিয়ের অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু ভারতে নয়। আবার যেতে হল ফ্রান্সে। সেখানে বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম না করে। হানিমুনের জন্যে আবার গেল নিসের কাছে সেই না-শহর না-গ্রামে। আবার সেই হোটেল, সেই সমুদ্রতীর, সেই পাইন বন, জলপাই বন।

তন্ময়ের মতো সুখী কে? জগতের সুখীতম পুরুষ তার প্রিয়ার দিকে তাকায় আর মনে মনে জপ করে, এ কি থাকবে? এ কি যাবে? এ সুখ কি দু-দিনের? এ কি সব দিনের? আসা-যাওয়ার দ্বার খুলে রাখতে বলেছেন জীবনমোহন। খোলা রাখলে কি সুখ থাকে? আর রূপ? সেও কি শাশ্বত?

রাজ যদি এত সুন্দর না হত তা হলে হয়তো তন্ময় চিরদিন সুখী হবার ভরসা রাখত। কিন্তু সে যে বড়ো বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের ডানা আছে, সেইজন্যে সেকালের লোক সুন্দরী আঁকতে চাইলে পরি আঁকত। পরির অঙ্গে ডানা জুড়ে বোঝাতে চাইত, এ থাকবে না। উড়ে যাবে। একে ধরে রাখতে গেলে যাও বা থাকত তাও থাকবে না।

রাজের অঙ্গে ডানা নেই, কিন্তু ডানার বদলে আছে মানা। তার গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না। স্পষ্ট কোনো নিষেধ আছে তা নয়। মুখফুটে কোনোদিন সে 'না' বলেনি। তবু তন্ময় জানে যে-খেলার যা নিয়ম। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, দেখতে মানা নেই, ছুঁতে মানা। মিলো দ্বীপের ভিনাসের গায়ে কেউ হাত দিক দেখি? হইহই করে তেড়ে আসবে গোটা লুভর মিউজিয়াম। অথচ দেখতে পার যতক্ষণ ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা। সুন্দরী নারীর স্বামীও একজন দর্শকমাত্র।

মধুমাসের পরে ওরা ইংল্যাণ্ডে গেল। সেখানে তন্ময়ের জনকয়েক লাট-বেলাট মুরুব্বি ছিলেন। তাঁর খেলার সমঝদার। তাঁদের সুপারিশে তাঁর একটা চাকরি জুটে গেল ইন্ডিয়ান আর্মির পুনা দপ্তরে। পুনায় ঘর বাঁধল তারা দু-টিতে মিলে। অত বড়ো সৌভাগ্য দু-জনের একজনও প্রত্যাশা করেনি। রাজ খুশি হয়েছে দেখে তন্ময়ের খুশি দ্বিগুণ হল। অফিসের মালিক আর ঘরের মালিক, দুই মালিকের মন জোগাতে গিয়ে মেহনতও হল দ্বিগুণ।

বছর দুই তাদের শিস দিতে দিতে ছুটে চলল বম্বে মেলের মতো। তারপরে আর মেল ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পুনায় তন্ময়ের কাজ, কিন্তু রাজ থাকে বেশিরভাগ সময় মুম্বাইতে। সেখানে তাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর উইলিংডন ক্লাবে। তার বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে শখের নাটক করলে তাকে ধরে নিয়ে যায় অভিনয় করতে। অভিনয়ে তার সহজাত প্রতিভা ছিল। হিন্দি ফিল্ম স্টুডিয়ো থেকে তার আহ্বান এল। সে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।' তন্ময় বলল, 'আমি যদি বারণ না করি?' রাজ চোখ নামিয়ে বলল, 'থাক।'

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল তার উত্তমা নায়িকা স্বাধীনা নায়িকা। ভালোবাসা না বাসা তার মর্জি। বিবাহ করেছে বলে কর্তব্যবোধ জন্মেছে, কর্তব্যের দাবি মানতে সে রাজি। কিন্তু তাতে তার মর্জির এদিক-ওদিক হয়নি। সে-দিক থেকে সে অবিবাহিতা, অবন্ধনা। কর্তব্য যদি মর্জিকে গ্রাস করতে যায় বিবাহের বেড়া ভাঙতে কতক্ষণ! তন্ময় শিউরে উঠল।

সবরমতী গিয়ে অনুত্তম দেখল আশ্রম তো নয় শিবির। সন্ন্যাসী তো নন সেনানায়ক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মতো ছুটে আসছে ছোটো বড়ো সৈনিক। একই জ্বালা তাদের সকলের অন্তরে। পরাধীনতার জ্বালা, পরাজয়ের জ্বালা।

আবার কবে লড়াই শুরু হবে? কে জানে!

কত কাল আমরা অপেক্ষা করব? কে জানে!

তত দিন আমরা কী করব? গঠনের কাজ।

গঠনের কাজ কেন করব? না করলে পরের বারে সংঘর্ষে হার হবে।

পার্লামেন্টারি কাজ কেন নয়? তাতে জনগণের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে।

অনুত্তমের মনে সন্দেহ ছিল না যে গান্ধীজির নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু তার সহকর্মীদের অনেকে পরিবর্তনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। গঠনকর্মে তাদের মন নেই। তারা চায় পার্লামেন্টারি কর্মক্রম। নয়তো চিরাচরিত অস্ত্র। বন্দুক তলোয়ার বোমা রিভলবার। হিংসা।

জাতির জীবনে জোয়ার আছে, ভাটা আছে। জোয়ার আজ নেই বটে, কিন্তু কাল আবার আসবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে গোড়ায় গলদ। সে গলদ সারবে না নির্দেশ পরিবর্তনে। সারবে, যদি বিশ্বাস ফিরে আসে। তখন জোয়ারের জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে পালন করতে হবে সেনানায়কের নির্দেশ। অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। না করলে পরের বারও পরাজয়।

তিন দিন অনুত্তম গান্ধীজির সঙ্গে ছিল। লক্ষ করল তিনি যেমন জ্বলছেন আর কেউ তেমন নয়। আর সকলের জ্বালা বাইরে বিকীর্ণ হয়ে জুড়িয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জ্বালা বাইরে আসতে পায় না, জ্বলতে জ্বলতে বাইরেটাকে খাক করে দেয়। বাইরের রূপ ভস্ম হয়ে গেছে, তাই তাঁকে সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। আসলে তিনি সন্ন্যাসী নন, বীর। সীতা উদ্ধার করবেন বলে কৃতসংকল্প। তাই রামের মতো বল্কল পরিহিত কৌপীনবন্ত ফলাহারী জিতেন্দ্রিয়।

সবরমতী থেকে অনুত্তম নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে ফিরল না, কিন্তু তার অন্তর্জ্বালা আরও তীব্র হল। গান্ধীজি যেন তাকে আরও উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দিলেন। অথচ জ্বলে ওঠা আগুন যাতে জুড়িয়ে না যায়, ফুরিয়ে না যায়, ধোঁয়ায় ঢেকে না যায়, সে সংকেত শেখাবেন। তাঁর পরামর্শে অনুত্তম পূর্ববঙ্গে শিবির স্থাপন করল।

ওদিকে জীবনমোহনের কাছে সে যা শিখেছিল তাও ভুলে গেল না। ধ্যান করতে লাগল সেই বিদ্যুৎপ্রভার যাকে দেখতে পাওয়া যায় শুধু দুর্যোগের রাত্রে। অন্য সময় তার অন্বেষণ করে কী হবে! পদ্মাবতীর অন্বেষণ দিনের পর দিন নয়। তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয় ঝড়-বাদলের। যে পটভূমিকায় বিদ্যুৎবিকাশ হয়।

এই যে শিবির স্থাপন, এই যে গঠনের কাজ, এও তো সেই বিদ্যুৎপ্রভার জন্যে, তার স্ফূরণের উপযোগী পটভূমিকার জন্যে। এমনি করেই তো সে জনগণকে জাগাচ্ছে, আইন অমান্যের জন্যে তৈরি করছে, শাসকদের রাগাচ্ছে, ঝড়-বাদলকে ডেকে আনছে। ঝড় যদি আসে বিজলি কি আসবে না?

অনুত্তম বিশ্বাস করে যে তার সাধন ব্যর্থ হবে না। ঝড়ও ডাকবে, বিজলিও চমকাবে। সে প্রাণভরে দেখবে সেই দৃশ্য। তার দেখেই আনন্দ। আর কোনো আনন্দে কাজ নেই। বিদ্যুতের সঙ্গে ঘর করা কি সত্যি সত্যি সে চায় নাকি! বিদ্যুতের বিদ্যুৎপনা যদি মিলিয়ে যায় তা হলে তার সঙ্গে বাস করায় কী সুখ? আর যদি নিত্যকার হয় তা হলেও সুখ বলতে যা বোঝায় তা কি সম্ভবপর? সুখের স্বপ্ন অনুত্তমের জন্য নয়। দাম্পত্য সুখের স্বপ্ন। তা বলে আনন্দ থাকবে না কেন জীবনে? থাকবে সাক্ষাতে পরিচয়ে সহযোগিতায়। থাকবে অশরীরী প্রেমে।

ত্যাগী কর্মী বলে অনুত্তমের যশ ছড়িয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী বলে শ্রদ্ধা করল কত শত লোক। কিন্তু অন্তর্যামী জানলেন যে সে সাধু নয়, বীর। ত্যাগী নয়, প্রেমিক। কর্মী নয়, সৈনিক। তার জীবনদর্শনে নারীর স্থান আছে। সে নারী সামান্য মানবী নয়, চিরন্তনী নারী, সে কোথায় আছে কে জানে! কিন্তু আছে কোথাও! না থাকলে সব মিথ্যা। এই কর্মপ্রয়াস, এই বিষয়বিরাগ, এই পল্লি অঞ্চলে স্বেচ্ছানির্বাসন।

অনুত্তম সারা দিন খাটে আর সব আশ্রমিকের মতো। সন্ধ্যার পর যখন ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, কেরোসিনের দাম জোটে না, তখন একে একে সকলের সুনিদ্রা হয়। তার হয় অনিদ্রা। রাত কেটে যায় আকাশের দিকে চেয়ে। প্রসন্ন আকাশ। শান্ত আকাশ। তারায় তারায় ধবল। এই একদিন কাজল হবে মেঘে মেঘে। মেঘের কালো কষ্টিপাথরে সোনার আঁচড় লাগবে। বিজলির সোনার। তখন চোখ ঝলসে যাবে, চাইতে পারবে না। তবু প্রাণ ভরে উঠবে অব্যক্ত আবেগে। বন্দে প্রিয়াং।

হায়! ১৯২৫ সালের আকাশে মেঘ কোথায়! কিংবা ১৯২৬ সালের আকাশে! অনুত্তমের মনে হল ১৯২৭ সালের আকাশে মেঘ করে আসছে, কিন্তু সে কেবল বাক্যের ঘনঘটা। তার চরম দেখা গেল ১৯২৮-এর আকাশে। কলকাতা কংগ্রেসে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে এক বছরের চরমপত্র দেওয়া হল। এই এক বছর অনুত্তম অনুক্ষণ আকাশের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে কাটাল, হ্যাঁ, মেঘ দেখা যাচ্ছে বটে। এবার হয়তো বিদ্যুৎ দেখা দেবে।

বছর যেন আর ফুরোয় না। চলল অনেক দিন ধরে শাসকদের মুখ চাওয়া, কী তাঁরা দেন না দেন। ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টির জয় হল। আশাবাদীরা আশা করলেন এইবার ভারতের কপালে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু যা হবার নয় তা হল না। অনুত্তম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তো বিনা দ্বন্দ্বে স্বাধীনতা চায় না। চায় দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। শুনতে চায় বজ্রের গর্জন, দেখতে চায় বিদ্যুতের ফণা। ইংল্যাণ্ড যদি দয়া করে কিছু দেয় তা হলে তো সব মাটি। এত দিনের প্রতীক্ষা নিষ্ফল।

সেইজন্যে ৩১ ডিসেম্বর রাত যখন পোহাল অনুত্তমের মুখ ভরে গেল হাসিতে। বিদায় ১৯২৯ সাল। বিদায় শান্তি স্বস্তি আরাম। স্বাগত ১৯৩০। স্বাগত দ্বন্দ্ব দুঃখ পদ্মিনীর দর্শন। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। বজ্রের আর কত দেরি? বিদ্যুতের?

মার্চ মাসে গান্ধীজি ডাণ্ডি যাত্রা করলেন। লবণ সত্যাগ্রহ মানসে। অনুত্তম চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। আশ্রমিকদের তাড়া দিয়ে বলল, এত দিন আমরা জনগণের নুন খেয়েছি, নিমকের ঋণ শোধ করি চলো।

চলল তারা সদলবলে লবণ সত্যাগ্রহ করতে। কাছে কোথাও সমুদ্র ছিল না। যেতে হল চট্টগ্রাম। অনেক দূরের পথ। পায়ে হেঁটে যেতে মাসখানেক লাগে। পথের শেষে পৌঁছোবার আগে খবর এল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ হয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারের সংগ্রাম চলছে। রোমাঞ্চকর বিবরণ। কেউ বলে, চট্টগ্রামের ইংরেজরা জাহাজে করে পালিয়ে গেছে। কেউ বলে, পালাবার পথ বন্ধ। বিদ্রোহীরা রেল স্টিমার টেলিগ্রাফ দখল করে ফেলেছে। ইংরেজরা এখন জেলে। কেউ বলে, একে একে কুমিল্লা নোয়াখালি সব বিদ্রোহিদের হাতে চলে যাবে। দ্বিতীয় সিপাহিবিদ্রোহ!

অনুত্তম বিস্ময়ে হতবাক হল। দ্বিতীয় সিপাহিবিদ্রোহ? সিপাহিরা যোগ দেবে তা হলে? কই, এমন তো কথা ছিল না? গণ সত্যাগ্রহ কি তা হলে সিপাহিবিদ্রোহের অর্গল খুলে দিতে! কেন তবে অহিংসার উপর এত জোর দেওয়া? অনুত্তম ঘন ঘন রোমাঞ্চবোধ করল। কী হবে লবণ আইন ভঙ্গ করে! সিপাহিদের বলো বিদ্রোহী হতে। ভারতময় যদি সিপাহিবিদ্রোহ ঘটে, এক প্রান্তের ঢেউ চার প্রান্তে পৌঁছোয় তা হলে তো দেশ স্বাধীন।

কিন্তু আশ্রমিকদের মধ্যে ভয় ঢুকল। চট্টগ্রামের দিকে কেউ এগোতে চায় না। গ্রামের লোক ভয়ে আশ্রয় দেয় না। ভিক্ষা দেয় না। পুলিশ আসছে শুনে তারা তটস্থ। অনুত্তম আশ্চর্য হল তাদের মনোভাব দেখে। কেউ তারা বিশ্বাস করবে না যে বিদ্রোহীরা জিতবে, সরকার হারবে। ইংরেজ রাজত্ব কোনোদিন অস্ত যাবে এ তারা

ভাবতেই পারে না। দাদাবাবুরা যাই বলুন মহারানির নাতি কখনো গদি ছাড়বে না, কারও সাধ্য নেই যে তাকে গদি থেকে হটায়।

আশ্রমিকরা একে একে আশ্রমে ফিরে গেল। সেখান থেকে আর কিছু করে জেলে যাবে। জেলে যাওয়াটাই যেন লক্ষ্য। কিন্তু অনুত্তমের মনে কাঁটা ফুটল। না, তা তো লক্ষ্য নয়। দেশ জয় করাটাই লক্ষ্য। আমাদের দেশ আমরা জিনে নেব। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে তা সম্ভব।

ভিতরে ভিতরে সে অধীর হয়ে উঠেছিল তার পদ্মাবতীর জন্যে। গণ সত্যাগ্রহ চলছে চলুক। সঙ্গে সঙ্গে চলুক সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমনি করে গগন সঘন হবে। হাওয়া উঠবে। তুফান আসবে। বাজ পড়বে। বিজলি ঝলকাবে। ভয় কীসের! এই তো সুযোগ। শুভদৃষ্টি এমনি করেই ঘটবে। ঘটনা! ঘটনা! ঘটনার পর ঘটনা! ঘটনাই তার কাম্য।

অনুত্তম একা চট্টগ্রামের দিকে পা বাড়াল। কী ঘটছে সে নিজের চোখে দেখবে। সম্ভব হলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু তাকে বেশি দূর যেতে হল না। খবর এল বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। রেল স্টিমার টেলিগ্রাফ সরকারের হাতে ফিরে গেছে। ইংরেজরা এখন বেড়াজাল দিয়ে বন্দি করছে যাকে পাচ্ছে তাকে। গ্রামকে গ্রাম তাঁবু দিয়ে ছাওয়া। সেখানে ইংরেজ সৈন্য, ইংরেজের পুলিশ। হা ভগবান! তারা আমাদেরই দেশের লোক।

অনুত্তম শুনল ইংরেজ দারুণ অত্যাচার করছে। করবেই তো। এবার তার হাতে চাবুক। তার দয়াধর্মের কাছে মায়াকান্না কেঁদে কী হবে! যারা দেশ জয় করে নেবার স্পর্ধা রাখে তারা অত সহজে কাকুতিমিনতি করে কেন? যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা কি সব জেনেশুনে নামেনি? তা হলে কি বলতে হবে ওই কয়টি মাথাপাগলা যুবক ভুল করছে?

চট্টগ্রামে পৌঁছে অনুত্তম দেখল সকলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে তারা এর মধ্যে নেই, তারা জানতই না যে এ-রকম কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে, তারাও বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। ইংরেজ সে-কথা শুনবে কেন? তার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার। হিন্দুকে সে আর বিশ্বাস করে না। মুসলমানই তার একমাত্র আশা ভরসা। ওই বিদ্রোহের নিট ফল হল হিন্দু-মুসলমানে মন কষাকষি। কারণ এক জনের যাতে শাস্তি আরেকজনের তাতে পুরস্কার।

কী যে করবে অনুত্তম কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যথায় তার বুক টনটন করছে, রক্ত ঝরছে কলিজা থেকে। ইচ্ছা করলেই কারাগারে গিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা হবে বিপদ থেকে পলায়ন। না, সে পালাবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে। চট্টগ্রামেই সে তার দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। সন্ত্রস্তদের বলল, ভয় কী? আমি আছি।

রইল তার গণসত্যাগ্রহ, রইল তার পদ্মাবতীর অন্বেষণ। একেবারে ভুলে গেল যে পদ্মাবতী বলে কেউ আছে ও তার দেখা পাওয়া যায় এমনি দুর্যোগে। তার বেলা দুর্যোগই সুযোগ।

সন্ধ্যার পরে বাইরে যাওয়া বারণ। 'কারফিউ' চলছে। অনুত্তম পারমিট চাইতে পারত, কিন্তু তাতে অপমানের মাত্রা বাড়ত। চুপচাপ বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগে না, মনে হয় কী যেন একটা কর্তব্য ছিল বাইরে। অভ্যাসমতো তকলি নিয়ে বসে, সুতো কাটে। কিন্তু তাতেও আগের মতো আস্থা নেই। হায়! সে যদি গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরতে পারত।

এই যখন তার মনের অবস্থা তখন তাকে ডাক দিল তার বন্ধু সরিৎ। সেও চট্টগ্রামে এসেছে আর একটা দল থেকে। সে পুলিশের মার্কামারা লোক, কাজেই গা-ঢাকা দিয়েছে। কে জানে কী তার কাজ। অনুত্তম তার সঙ্গে দেখা করতেই সে বলল, 'তোর সাহায্য না পেলে চলছে না। খুশি মনে রাজি না হলে কিন্তু চাইনে। ভয়ানক ঝুঁকি। পদে পদে বিপদ।'

অনুত্তম তো মরতে পারলে বাঁচে। মরার চেয়ে কী এমন ঝুঁকি থাকতে পারে।

'হ্যাঁ, তার চেয়েও ভয়ানক ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে ওরা এমন যাতনা দেবে যে পেটের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তা হলে ধরা পড়বে আর সকলে। ধরা পড়লে তুই সায়ানাইড খেতে রাজি আছিস?'

অনুত্তম ক্ষণকাল অবাক হয়ে ভাবল। বলল, 'রাজি।'

'কী জানি, বাবা! তোরা অহিংসাবাদী। শেষকালে বলে বসবি তোর বিবেকে বাধছে।'

অনুত্তম তাকে আশ্বাস দিল। ধরা পড়লে বেঁচে থাকতে তার রুচি ছিল না।

'তা হলে আজকেই তুই তৈরি হয়ে নে। কারফিউ অমান্য করেই তোকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে সংকেতস্থানে। আমি তোর সঙ্গে একজনকে দেব। তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তোর ছুটি। কী করে পৌঁছে দিবি সেটা তোর মাথাব্যথা। আমার নয়। মনে রাখিস, ধরা পড়ার ঝুঁকি প্রতি পদে। গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে এ জেলা। আমি হলে মৌলবি সাহেব সাজতুম।'

অনুত্তম তার গুরুদায়িত্বের জন্যে অবিলম্বে প্রস্তুত হল। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিল না। নিল পটাসিয়াম সায়ানাইড। কয়েক বছর হল সে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তাকে দেখাত মৌলবির মতো। মুসলমানি পোশাক জোগাড় করে সে পুরোদস্তুর মৌলবি বনে গেল। চট্টগ্রামে প্রচলিত কেচ্ছা পুঁথি এককালে তার পড়া ছিল। এক বস্তানি পুঁথি, একটা বদনা, একটা ব্যাগ ও তার সেই বিখ্যাত নীল চশমা তার সম্বল হল। এই নিয়ে সে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

এতিমখানার কাছে একটি গাছের আড়ালে সরিৎ লুকিয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল আরও একজন। অনুত্তম অন্ধকারেও নীল চশমা পরেছিল, তবু তার ঠাহর করতে এক লহমাও লাগল না যে ওই আর একজনটি মেয়ে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মেয়ে! সন্ন্যাসী না হলেও তার সন্ন্যাসীসুলভ সংস্কার ছিল। তার সেই সংস্কার তাকে বলল, দেখছ কী! দৌড় দাও। দৌড়োতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরো, সেও ভালো। কিন্তু এ যে মেয়ে!

সরিৎ তার হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটির নাম পর্যন্ত বলে গেল না। পরিচয় দেওয়া দূরের কথা। এমন অদ্ভুত অবস্থা কেউ কখনো কল্পনা করেছে? অনুত্তম তো করেনি। তার কাজ তা হলে এই মেয়েটিকে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে কলকাতা নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ওদিকে যে হিন্দুর মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগে মৌলবি সাহেবের কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পড়বে। পা দুটো যে একটু একটু কাঁপছিল না তা নয়। কেন যে মরতে মৌলবি সেজে এল!

অন্ধকারে অমন একটা জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে অনুত্তম বলল, 'আমার নাম শা মুহম্মদ রুকনুদ্দিন হায়দার এছলামাবাদী। আপনার নাম যদি কেউ পুছ করে জওয়াব দেবেন মুসম্মৎ রওশন জাহান। কেমন? বোঝলেন?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ নয়। জি হ্যাঁ।'

'জি হাঁ।'

এক অপরিচিতা নারী, বোরখায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। ভিতর থেকে তার চোখ দু-টি জ্বল-জ্বল করছে আঁধার রাতে জোনাকির মতো। কে জানে তার বয়স কত! পনেরো না পঁচিশ না পঁয়ত্রিশ। তবে কথার সুর থেকে অনুমান হয় একুশ-বাইশ হবে। এতদিন কি কেউ অবিবাহিতা থাকে? হয়তো বিধবা। সধবা যে নয় তাই বা কী করে বোঝা যাবে?

তবু চলতে চলতে অনুত্তম বলল, 'কেউ পুছলে এ ভি বলবেন কি আমি আপনার খসম।'

'জি হাঁ'।

অনেক ঘুরে-ফিরে মিলিটারি পেট্রোল এড়িয়ে ছিপে ছিপে ওরা চলল। চলল শহর ছাড়িয়ে, মাঠের আইল ধরে, গোরুর গাড়ির হালট ধরে, গোপাট ধরে, গ্রামের লোককে না জাগিয়ে, চৌকিদারকে দূরে রেখে। অনুত্তম আগে আগে, রওশন তার পিছন পিছন।

রাত যখন পোহাল তখন ওরা চাটগাঁ ও সীতাকুন্ডুর মাঝামাঝি একটা রেলস্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অনুত্তম অন্যমনস্ক ছিল। রওশন বলল, 'দেখবেন সামনে জল।'

'সামনে জল নয়। ছামনে পানি।'

'জি হাঁ। ছামনে পানি।'

মেয়েদের ওয়েটিং রুমে রওশনকে বসিয়ে অনুত্তম গেল টিকিটের খোঁজে। ট্রেনের তদারকে। কলকাতার টিকিট চাইলে পাছে সন্দেহ করে সেই জন্যে বলল, কুমিল্লার টিকিট। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেদিকে যাবার ট্রেন পাওয়া গেল। তখন মেয়েদের কামরায় বিবিকে উঠিয়ে দিয়ে মৌলবি সাহেব উঠলেন যেখানে সবচেয়ে বেশি ভিড়। বলাবাহুল্য থার্ড ক্লাসে।

ফেনীতে কিছু হেনস্তা হতে হল বিবিকে দেখতে গিয়ে। একচোট অন্যান্য বিবিদের হাতে, একচোট তাদের খসমদের হাতে, শেষে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। তওবা তওবা করে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হল। লাকসামে যখন গাড়ি দাঁড়াল অনুত্তম দেখল রওশনের কামরা খালি হয়ে যাচ্ছে। তার নিজের কামরাও। তখন সে চট করে বেরিয়ে গিয়ে ফরিদপুরের টিকিট কেটে নিয়ে এল। রওশনকে বলল, 'শোনছেন? এ গাড়ি চাঁদপুর যাবে না। গাড়ি বদল করতে হবে।' আবার তারা দু-জনে দুই কামরায় উঠে বসল।

চাঁদপুরের স্টিমারে কিন্তু মেয়েদের কাঠরায় ঠাঁই হল না। ডেকের এক কোণে মাথা গুঁজতে হল রওশনকে আরও কয়েকজন বিবির সঙ্গে। পর্দা ছিল না। কাছেই ছিল অনুত্তম প্রভৃতি পুরুষ। মাঝখানে কোনো বেড়া ছিল না। শুধু ছিল বোরখা। বোরখাও ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছিল খেতে ও খাওয়াতে। শিশু ছিল সঙ্গে। এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে চার চোখ এক হল। অনুত্তমের। রওশনের।

সে চোখে পাঞ্চালীর তেজ, পাঞ্চালীর রোষ, পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা। অপমানে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। নইলে এমনিতে বেশ ফর্সা। একরাশ কোঁকড়া কালো কেশ অবিন্যস্ত এলায়িত। যেন পাঞ্চালীর মতো প্রতিজ্ঞা করেছে দুঃশাসন বেঁচে থাকতে বেণী বাঁধবে না। ইস্পাতের ফলার মতো ছিপছিপে গড়ন। কাপড়ে আগুন লেগেছে। সে আগুন ধরে গেছে প্রতি অঙ্গে, ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গচালনায়, সাপ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গভঙ্গিতে। অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে তার সর্বশরীর। জ্বলছে আর তাপ বিকিরণ করছে। তপ্ত হয়ে উঠছে আবহাওয়া।

এ কোন নতুন স্নেহলতা! কেন এমন করে আত্মহত্যা করছে। অনুত্তম ভুলে গেল যে সে নিজেও জ্বলছে, তার মতো জ্বলছে কত সোনার চাঁদ ছেলে, জ্বলবে না কেন সোনার প্রতিমা মেয়েরাও? বাংলার এই কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চালীরাও থাকবে পান্ডবদের জ্বালা জোগাতে, ভারতের এই নব রাজপুতানার পদ্মিনীরাও থাকবে বীরদের প্রেরণা দিতে। মনে পড়ল অনুত্তমের।

মনে পড়ল আর মনে হল এই সেই পদ্মাবতী যার ধ্যান করে এসেছে সে এতদিন। এই সেই বিপ্লবী নায়িকা, সেই চিরন্তনী নারী। কে জানে কী এর নাম, কিন্তু রওশন নামটাও সার্থক। রওশন রোশনি রোশনাই। তুমি যে আছ, তোমাকে যে দেখেছি, এই আমার অনেক। তোমার কাজে লাগতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্য। আমি ধন্য যে আমি তোমার দু-দিনের দু-রাত্রির সহযাত্রী। এখন বিপদ কাটেনি, ধরা পড়বার সম্ভাবনা ফি পদে। তবু ধন্য, তবু আমি ধন্য।

গোয়ালন্দে নেমে অনুত্তমরা ফরিদপুরের দিকে গেল না, কাটল নাটোরের টিকিট। আবার আলাদা আলাদা কামরায় ওঠা। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। তারপর পোড়াদায় নেমে কলকাতার টিকিট কেটে গাড়ি বদল করল। এবার আলাদা আলাদা কামরায় নয়, একত্র। সময় ছিল না অত খুঁজতে। ভয় নেই বলে মুখ খুলে রাখল রওশন। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে। বোরখা পরে কি মানুষ বাঁচে। অনুত্তমকে বলল, 'হুজুরের আপত্তি নেই তো?'

অনুত্তম কী যেন ভাবছিল। অন্য মনে বলল, 'না, আপত্তি কীসের?'

কলকাতায় নেমে ঘোড়ার গাড়ি করে ওরা শ্যামবাজার যায়। সেখানে ওদের ছাড়াছাড়ি। গাড়িতে রওশন বলেছিল সে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে আসেনি, এসেছে পার্টির কাজে।

কান্তিমতীর অন্বেষণ

কান্তির যাত্রা দক্ষিণ মুখে। হাওড়া স্টেশনে মাদ্রাজ মেল দাঁড়িয়েছিল, তুলে দিতে এসেছিল অনুত্তম, সুজন, তন্ময়। বাড়ির লোক কেউ আসেনি। তাদের অমত। তাই বাড়ি থেকেও কিছু আনা হয়নি। বন্ধুরা জোগাড় করে যা দিয়েছিল তাই তার সম্বল।

'এই ভালো।' কান্তি বলল ব্যথা চেপে, 'বোঝা আমার হালকা। যেমন ভ্রমণে তেমনি জীবনে। হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত নয়। হবেও না।'

ট্রেন চলে গেল তাকে বহন করে দক্ষিণ ভারতে। সেখানে তার বছর আড়াই কেমন করে যে কেটে গেল তার হিসাব রাখে না সে নিজে। দক্ষিণী নৃত্যকলা মন্দিরকেন্দ্রিক। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নাচ দেখে গুরুস্থানীয়দের কাছে ভরতনাট্যম শিখে নৃত্য সম্বন্ধে তার ধারণার আমূল পরিবর্তন হল। সে ভেবেছিল ওটা সামাজিক জীবনের অঙ্গ। তা নয়। ওটা দেবতার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষা। একপ্রকার দেবভাষা বলতে পার। তেমনি ব্যাকরণশুদ্ধ, সূত্রবদ্ধ। দেবতা স্বয়ং নর্তক। নটরাজ। রঙ্গনাথ। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে, গ্রহনক্ষত্রের নাটমন্দিরে তিনিও নৃত্যপর। সৃষ্টিকর। প্রলয়ংকর।

ভরতনাট্যম কোনোরকমে আয়ত্ত করে কথাকলি শিখতে কোচিনে গেল কান্তি। কথাকলি মন্দিরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামকেন্দ্রিক। তার জন্যে দল চাই, পৌরাণিক কাহিনি জানা চাই, পালার বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের ভাষাও বিভিন্ন। সে ভাষা মুদ্রাময়। কিন্তু কিছু দিন দেখে ছেড়ে দিল। কারণ নর্তক তৈরি করা যেমন কঠিন তার চেয়েও কঠিন দর্শক তৈরি করা। দর্শক যদি মুদ্রার অর্থ না বোঝে তা হলে নর্তকের মনের কথাই বুঝল না।

কথাকলিতে ভঙ্গ দিয়ে কান্তি চলল উত্তর মুখে। গুজরাতের গরবা তার কাছে বেশ সহজ লাগল। তার প্রকৃতির সঙ্গে মিল ছিল বলে সহজ। মিল ছিল রাজস্থানের লোক নৃত্যেরও। সেও যেন ব্রজের গোপযোগীদের একজন। সেও যেন আদিম ভিল উপজাতির মতো বন্য। মাস কয়েক কাটিয়ে দিল কাঠিয়াবাড়ে, রাজপুতানায়। মথুরায়, বৃন্দাবনে। তারপরে উত্তর ভারতের নাগরিক বিলাসনৃত্যে গা ঢেলে দিল। বাইনাচ, কথকনাচ। হাস্য-লাস্য বিলোপ কটাক্ষ। শৌখিন, সম্ভ্রান্ত, ক্ষীয়মাণ, ক্ষয়িষ্ণু। অমন করে আপনাকে দুর্বল করা ক-দিন চলতে পারে? বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে কান্তি কলকাতা ফিরে গেল। সেখান থেকে গেল মণিপুর।

মণিপুরে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। হ্যাঁ, এরই নাম কেলি, এরই নাম লীলা। দক্ষিণের মতো ক্লাসিকাল নয়, উত্তরের মতো নাগরিক নয়, পশ্চিমের মতো লোক নয়, পূর্ব প্রান্তের এই নৃত্যপদ্ধতি রসেভরা নৈসর্গিক। এর ছন্দ ধরতে কান্তির মতো অভিজ্ঞের তিন-চার মাস লাগার কথা, কিন্তু এর লালিত্য তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল, ধরা দিল না বারো-চোদ্দো মাসের আগে। রাসলীলার রাত্রে কৃষ্ণনৃত্য করে তার অঙ্গ শীতল হল। মধুর, মধুর, অতি মধুর। কলামাত্রেরই সার কথা মাধুর্য। কান্তির মনে হল সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মধুরেণ সমাপয়েৎ। মণিপুর থেকে সে কলকাতা ফিরে এল। কিন্তু স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা তার ধাতে নেই। একটা বিদেশি নটসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতব্যাপী সফরে বেরিয়ে সে তাদের পরিচালন কৌশল শিখে নিল। তাদের নৃত্যপ্রকরণের সঙ্গেও পরিচিত হল। তাদের সঙ্গে ইউরোপে যাবার সুযোগ জুটেছিল, কিন্তু তার পক্ষপাতীরা তাকে যেতে দিল না। তাকে নিয়ে তারা একটা সম্প্রদায় গড়ল বিদেশি ছাঁচে। দেশ ক্রমশ নৃত্যসচেতন হচ্ছিল। ভদ্রঘরের মহিলারাও যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু নৃত্যকে তাঁদের সারাজীবনের সাধনা করতে তখনও প্রস্তুত হননি। সারাজীবনের জন্যে ঘরগৃহস্থালি। দু-দিনের জন্যে নৃত্য।

মুম্বই-এর ভাটিয়া পারসি গোয়ানিজ তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সেই যে সম্প্রদায় গঠিত হল তার মূলধন ছিল উৎসাহ। তাই নিয়ে তারা শুরু করে দিল কথাকলি মণিপুরি ও ভরতনাট্যমের সমাহার। নিন্দুকরা বলাবলি করল এটা পাশ্চাত্য ব্যালের অনুকরণ। তা শুনে নাচিয়েরা বলল, চলো আমরা বিশ্বভ্রমণে যাই, পাশ্চাত্যের

লোক দেখে বলুক এটা তাদের অনুকরণ কি না। এ পোড়া দেশে গুণের আদর নেই। এরা আমাদের চিনবে না।

কিন্তু জহুরি যারা তারা চিনল ঠিকই। দেখতে দেখতে একটির পর একটি কন্যারত্নের বিবাহ হয়ে গেল। তাদের যারা নৃত্যসহচর তারা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নেচে সুখ কী যদি একা নাচতে হয়। দক্ষিণ ভারতের যিনি নটরাজ তাঁর সঙ্গেও একটি পার্বতী দেওয়া হয়েছিল। উত্তর-দক্ষিণ সমন্বয়। তিনি তো মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেলেন। আর নাচবেন না বললেন। ভাঙা দল নিয়ে কান্তি কী করে সাগর পাড়ি দেয়? মণিপুরি কৃষ্ণের সঙ্গে গুজরাতি রাধা সাজবে কে? সুমতি এখন বউ হয়ে চলে গেছে সুরতে। সেখানকার এক তুলোর ব্যাপারীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূরূপে।

সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল এ ধরনের দল টিকতে পারে না। ভদ্রঘরের তরুণীরা বিয়ে একদিন করবেই। গুরুজনের ইচ্ছা, নিজেদেরও অনিচ্ছা নেই। তখন তাদের নৃত্যসহচরদের নাচের তাল কেটে যাবে। নতুন সহচরীর অভাব হবে না, কিন্তু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে সময়ের অভাব হবে। ততদিন তাদের সঙ্গে 'চলি চলি পা পা' করতে করতে নিজেরাই পা ভুলে যাবে। তার তো ততদিন ধৈর্যই থাকবে না। তার বন্ধু শাপুরজি কিন্তু অবুঝ। বলে, 'বাঙালিরা একটুতেই হাল ছেড়ে দেয়। সমস্যা তো আছেই, তার মীমাংসাও আছে নিশ্চয়। ধীরে সুস্থে করো। প্রথম ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ছ কেন?'

কান্তি ভাবতে আরম্ভ করেছিল এসব নৃত্য দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীরা, উত্তর ভারতে বাইজিরাই রক্ষা করে এসেছে প্রধানত। গড়তে হলে তাদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়তে হবে। তারা বিয়ে করবে না, বিয়ে করবামাত্র নাচ ছেড়ে দেবে না। সারাজীবনের, সাধনাকে তারা ঘরগৃহস্থালির চেয়ে ভালোবাসে। শাপুরজি একথা শুনে লাল। 'তোমরা হিন্দুরা চিরকাল এই করে এসেছ, এই করতে থাক চিরকাল। আমরা এর মধ্যে নেই। গোপনে যাই করি না কেন, প্রকাশ্যে একপাল বারবনিতা নিয়ে ঘুরতে পারব না। বিশ্বভ্রমণ দূরের কথা, ভারত ভ্রমণেরও দুঃসাহস নেই। পারসি থিয়েটার আজকাল চলে না কেন? লোকে ওসব পছন্দ করে না।'

তারপর ভট্টজি বললেন, 'আমরা সেকেলে মানুষ, আমরাও এটা কল্পনা করতে পারিনে। আমরা বাইজিদেরও নাচতে দেখিনি ভদ্র পুরুষদের সঙ্গে। তুমি যদি ভদ্রাদের বাদ দিতে চাও ভদ্রদেরও বাদ দাও। নইলে ভদ্রদের মান ইজ্জত যাবে। ভারতীয় নৃত্যেরও পুনরুদয় হবে না।'

একেলে মানুষ মগনভাই বলল, 'কান্তি, তুমি নৃত্য নৃত্য করে বাউরা হলে। তাই আর একটা দিক তোমার নজরে পড়ছে না। ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে নাচলে আমরাও নিরাপদ থাকি। নইলে আমাদেরও একটির পর একটির পতন হত। তোমারও।'

কান্তি বাধা দিয়ে বলল, 'না, আমার না।'

কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না তার কথা। যেখানে মুনিদেরও মতিভ্রম সেখানে কান্তির মতি স্থির থাকবে! শোনো, শোনো।

দল ভেঙে গেল। কারণ কান্তিই ছিল তার প্রাণ। সে একদিন নিরুদ্দেশ হল সঙ্গে কিছু না নিয়ে। বোঝা হালকা হলেই সে বাঁচে।

অন্য কারণে তার মন ভারী ছিল। সে-কথা কাউকে বলতে পারে না। বলত মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্রদের। কিন্তু কোথায় তারা কে জানে! কে কার খোঁজ রাখে!

তার কান্তিমতীর অন্বেষণ ক্ষান্ত ছিল না। যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, নৃত্যের সুযোগ হয়েছে তাদের সকলেই তো কান্তিমতী। কেই বা নয়! কারো কেশ ভালো লেগেছে, কারও বেশ ভালো লেগেছে, কারও চাউনি, কারও চলন। কারো হাসি ভালো লেগেছে, কারও কান্না ভালো লেগেছে, কারও কোপনতা, কারও শরম। কারও মুদ্রা ভালো লেগেছে, কারও ভঙ্গি ভালো লেগেছে, কারও পদপাত, কারো পরশ।

না, সে বলতে পারল না যে এরা কেউ কান্তিমতী নয়, কান্তিমতী হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয়। তার বহুচারী মন কোনোখানে স্থিতি পেল না। যদিও ঠাঁই পেল সবখানে। প্রীতিও পেল কোনো কোনোখানে। এই তো সেদিন সুমতির কাছে। সুমতির বিয়ের খবর সে-ই জানত সকলের আগে। খবর দিয়েছিল সুমতি স্বয়ং। বলেছিল, 'এ বিয়ে আমি করতে চাইনে যদি আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়।'

'আর একজনটি কে?' প্রশ্ন করেছিল কান্তি।

'তুমি কি জান না যে আমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে জানাতে হবে? বাধাও তো নেই।'

'বাধা আছে। যে পাখি আকাশের তাকে আমি নীড়ে ভরতে গেলে আকাশ তো যাবেই, নীড়ও যাবে। আর আমাকেই বা সে নীড়ে ধরে রাখতে পারবে কেন? সুমতি, তুমি বিয়ে করতে চাও করো, কিন্তু বিয়ে না করলেই আমি সুখী হতুম।'

'বিয়ে না করেই সারাজীবন কাটবে, এ কি কখনো সম্ভব! জান তো, রূপযৌবন দু-দিনে ঝরে যায়। তারপরে নাচবে কে? নাচ দেখবে কে? বাকি জীবন কী নিয়ে কাটবে? কাকে নিয়ে? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, কান্তি। আজ না হয়, বিশ বছর বাদে। ততদিন আমি কি তোমার সঙ্গে নাচতে পারব? রূপযৌবন থাকলে তো?'

সব সত্যি। তবু কান্তি বলেছিল, 'এখন তুমি বিয়ে না করলেই সুখী হতুম, সুমতি। হয়তো ততদিন অপেক্ষা করতে পারতে না, কিন্তু কিছুদিন অন্তত পারতে। তবে অপেক্ষা করে ফল হত না, ঠিক। বিয়ে আমি করতে চাইতুম না কখনো। করব না কোনো দিন। করব না কাউকেই।'

সুমতি বিশ্বাস করল না। মুচকি হেসে চলে গেল। বলল, 'আমি তো বাঙালিই নই।'

মধ্যভারতের এক মহারাজা তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৃত্যবিদ আনিয়ে তাদের সহযোগিতায় তাঁর নিজের খেয়ালখুশি মতো পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। বাইজি শ্রেণি থেকেই তাঁকে নর্তকী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এঁরা যেমন-তেমন বাইজি নন, শিক্ষায় সহবতে সাধনায় ও পরিশ্রমে এক-একটি নক্ষত্র। দরবার থেকে এঁদের বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং ইতরবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। তবে লোকে বলে রাজকীয় অতিথিদের সঙ্গে রানি না থাকলে এঁরাই রানির মর্যাদা পেতেন।

কান্তির নাম ইতিমধ্যেই মহারাজের দরবারে পৌঁছেছিল। মানুষটিকে দেখে মহারাজ তৎক্ষণাৎ নিয়োগপত্র দিলেন। বললেন, 'তোমাকেই আমি খুঁজছিলুম। তুমি এলে, এখন অঙ্গহানি দূর হল। মন দিয়ে লেগে যাও। কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।'

নৃত্যের স্টুডিয়ো ছিল কান্তির স্বপ্ন। সুসজ্জিত স্টুডিয়োর অভাব সে পদে পদে বোধ করছিল। মহারাজের স্টুডিয়ো নেই, যা আছে তাকে স্টেজ বলা যায়। কান্তি বলল, 'ইয়োর রয়্যাল হাইনেস, ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি।'

'বলো, বলো, কী বলতে চাও বলেই ফেলো।'

'জাঁহাপনা, এ যে স্টুডিয়ো নয়। এ যে স্টেজ।'

'হাঁ, হাঁ, ইস্টেজ, ইস্টেজ। ইস্টুডিয়ো ক্যা চিজ?'

'আমার কাছে ফোটো আছে। দেখাব। রাশিয়ান ব্যালের জন্যে ডিয়াগিলেফ যা ব্যবহার করতেন। নিজিনস্কি যেখানে অনুশীলন করতেন।'

'ডিয়াগিলেফ কৌন আদমি? নিজিনস্কি কৌন আওরত?' মহারাজ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে তাকান আর দাড়ি চোমরান।

কেউ বলতে পারে না। কান্তিই বলে, 'নিজিনস্কি আওরত নন, পুরুষ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নর্তক। বোধ হয় পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিলেন। ইদানীং পাগলা গারদে। আর ডিয়াগিলেফ সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান ব্যালে'র পরিচালক।'

সাঙ্গোপাঙ্গরা ধরা পড়ে অপ্রতিভ হলেন। মহারাজ ফোটো দেখে তাজ্জব বনলেন। তারপর স্টুডিয়ো নির্মাণের ফরমান বার হল। কান্তি যেমনটি চায়। তিন মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরি। চার মাসের মধ্যে কাঠের মেঝে। ছ-মাসের মধ্যে সাজসরঞ্জাম। তার পরে শুরু হল কান্তির পরিচালনায় নতুন ধরনের তালিম। সে কেবল শেখায় না, দেখায়। লালিত্যে ও মাধুর্যে সে-রাজ্যে তার সমকক্ষ ছিল না। আগন্তুকদের মধ্যেও না।

তার নৃত্যসহচরী হল লায়লা জান। রাজনর্তকী মেহের জান যার মা। লায়লার সঙ্গে কোনো ভদ্র যুবক আর কখনো নাচেনি, লায়লা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, ধন্য হয়ে গেল। ধন্য হয়ে তার শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাই এনে দিল নৃত্যবেদিতে। তার নটীর পূজার অর্ঘ্য। আর কান্তি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করল সত্যিকারের একজন শিল্পীর সাহচর্য পেয়ে। যাকে পাখিপড়া করে শেখাতে হয় না, যার ভুল দেখে বিরক্ত হতে হয় না, যে কাঠের পুতুল নয় যে, তার দিয়ে বেঁধে নাচাতে হবে। লায়লার তুলনায় সুমতি যেন মানুষের তুলনায় পুত্তলিকা।

একজন ভাগ্যবান, আর একজন ধন্য। নাচ যা জমল তা দেখে তৃপ্তি। লায়লার প্রখর বুদ্ধি। এক পদ্ধতির সঙ্গে অপর পদ্ধতির সংমিশ্রণে নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর নিতে সে কান্তির চেয়েও সুদক্ষ। বরং কান্তিকেই চাইতে হয় তার পরামর্শ, তার সমালোচনা। শ্রদ্ধায় কান্তির মাথা নুয়ে আসে। ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র নৃত্যের সমন্বয় একটু এখান থেকে, একটু ওখান থেকে নিয়ে জুড়ে জুড়ে হবে না। হবে একটি বিশেষ ঐতিহ্যকে ঘিরে, একটি বিশেষ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে, তার চারদিকে আর সমস্তকে বিনুনির মতো বুনে।

কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা, লায়লার নৃত্যে এমন একটা দরদ ছিল যা হাজার তালিম সত্ত্বেও সুমতির নৃত্যে আসত না। হাজার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কান্তির নৃত্যে আসবে না। এটা সাধনলব্ধ নয়। কান্তি একদিন লায়লাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লায়লি, এ তুমি কোথায় পেলে?'

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। ধীরে ধীরে সজল হল তার সুরমা-আঁকা আঁখি-পল্লব। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'জীবনের কাছে।'

'তোমার জীবন কি—' কান্তি বলতে বলতে থেমে গেল।

'কান্তি', সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, 'তুমিই একমাত্র পুরুষ যে আমাকে ঘৃণা করেনি, হীন জ্ঞান করেনি, মৌখিক ভদ্রতা জানায়নি, ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য মনে করেনি। তোমার কাছে আমার গোপন করবার কী আছে?'

কান্তির চোখে জল এলো। মুখে কথা জোগাল না। কান সজাগ হল।

'বড়ো দুঃখের জীবন আমাদের। মহারাজার কখন কে অতিথি আসবেন, তার জন্যে আমরা বাঁধা। নিমক খাই, হারামি করতে পারি কি?'

কান্তি যে জানত না তা নয়। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল এটা একটা প্রথা। সইতে সইতে সব প্রথার মতো এটাও গা-সওয়া হয়ে যায়। নইলে নৃত্যকলা রক্ষা পাবে কী করে? রক্ষিতারাই রক্ষা করে এসেছে। আবার রক্ষিতাদের রক্ষক হয়েছে রাজ্যের রাজা, মন্দিরের ব্রাহ্মণ। পাপ? এর মধ্যে পাপ যদি থাকে তবে পাপের শোধন হয়ে যায় নটরাজের উপাসনায়, কলাদেবীর আরাধনায়।

কিন্তু লায়লা যা বলল, যেমন করে বলল, তাতে কান্তির বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণার মর্মে আঘাত লাগল। হু-হু করে উঠল তার হৃদয়। চোখের জলে মুখ ভেসে গেল। নারীর অপমানের উপর যার প্রতিষ্ঠা সে কীসের শিল্প, সে কীসের সাধনা। লায়লা কি নারী নয়? তার কি অপমানবোধ নেই? কান্তিমতী রাজকন্যা কি আর সব নারীতে আছে, লায়লাতে নেই?

আছে। আছে। এও সেই কান্তিমতী। কখনো রাধানৃত্যে, কখনো পার্বতীনৃত্যে, কখনো অপ্সরানৃত্যে সে তার চিরন্তন সৌন্দর্য উন্মোচন করে দেখিয়েছে। তখন মনে হয়েছে সে শাশ্বতী নারী। যে নারীর প্রতিরূপ ভারতের চেতনায় রাধা, গৌরী, উর্বশী। ইরানের চেতনায় লায়লা। গ্রিসের চেতনায় হেলেন। জুডিয়ার চেতনায় মেরি। ইটালির চেতনায় ম্যাডোনা।

কান্তি বলল, 'তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, লায়লি?'

‘কিছুই না। সব আমার নসিব।’ সে দার্শনিকের মতো শান্ত।

কিন্তু কান্তির জীবনের তাল কেটে গেল। তার নৃত্যেরও। একদিন সে কাউকে কিছু না বলে কারও কাছে বিদায় না নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। না, ভারতের নৃত্যকলার পুনরুদয় ওভাবে হবে না। সমাধানের জন্যে অন্য উপায় দেখতে হবে। অতীতে যা কার্যকরী হয়েছে বর্তমানেই তার কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, ভবিষ্যতে কি তা বৃদ্ধি পাবে? না। নারীকে পতিতা করে তার পতনের উপর যা দাঁড়িয়েছে তা মন্দিরই হোক আর প্রাসাদই হোক তা পতনোন্মুখ। কান্তি তার সঙ্গে আপন ভাগ্য যোগ করে পতিত হবে না। ভারতের নারী যদি নর্তকী হয়ে গ্লানি বোধ করে তবে নারীকে সে ডাকবে না সারাজীবনের জন্যে নৃত্যসাধনা করতে।

অশান্ত হৃদয় নিয়ে সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াল, ভুলে গেল যে সে শিল্পী। ক্রমে বুঝতে পারল আদর্শ অবস্থার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না। সুমতিদের নিয়ে, লায়লাদের নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। পরে যারা আসবে তাদের জন্যে বসে থাকলে কাজ হবে না। আসবে তারা একদিন, আসবেই। যেমন এসেছে ইউরোপে আমেরিকায় তেমনি আসবে ভারতে। আধুনিক নারী। যে পতিতা নয়, যে শিল্পের খাতিরে অবিবাহিতা কিংবা বিবাহ করলেও শিল্পচর্চায় নিবেদিতা।

আবার সম্প্রদায় গঠন। এবার কলকাতায়। যা সে আশা করেনি তাই ঘটল। দলে যোগ দিল একটি দু-টি করে বেশ কয়েকটি বিবাহিতা মেয়ে, তাদের স্বামীরাও। এরা অবশ্য কিছুতেই লায়লার মতো মেয়েদের আসতে দেবে না। তা ছাড়া আর কোনো খেদ রইল না কান্তির মনে। কী করে লায়লাকে উদ্ধার করবে এ চিন্তা তাকে অনবরত পীড়া দিচ্ছিল।

এবার দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। তার নৃত্যসহচরী হল মীনাক্ষী। তাতে শ্যামলের আপত্তি। শ্যামল ওর স্বামী। বেচারার নাচতে শখ। কিন্তু নাচে নিজের খেয়ালে। আড়াই বছরের শিশু ভোলানাথের মতো। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে এই তার নাচের যোগ্যতা। কান্তি তার নাচের দাবি নাকচ করায় সে দারুণ দুঃখ পেল। কিন্তু তার বিয়ের দাবি নাকচ করা অত সহজ নয়। সে হল স্বামী। স্বামী যদি অনুমতি না দেয় তা হলে স্ত্রী কেমন করে অপরের সঙ্গে নাচবে?

কান্তি তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, ‘শ্যামল, তোমার মনে যে শঙ্কা জাগছে সেটা অমূলক। আমার নৃত্যসহচরী কোনোদিন নর্মসহচরী হবে না। কোনখানে লাইন টানতে হয় সে আমি জানি। যদি না জানতুম তা হলে এতদিন সব প্রলোভন তুচ্ছ করলুম কোন মন্ত্রবলে?’

শ্যামল অভিভূত হয়ে বলল, ‘কান্তিদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ওই যে তোমার পণ—বিয়ে করবে না, ওর তাৎপর্য কী?’

এরূপ প্রশ্ন এই প্রথম। অবাক হল কান্তি। তখন শ্যামল বলে চলল, ‘ওর তাৎপর্য কি এই নয় যে তোমার জন্যে আমি বিয়ে করব, আর তুমি আমার বিয়ের সুযোগ নেবে?’

সর্বনাশ! মানুষের মনে কত ময়লা যে আছে! কান্তি কী উত্তর দেবে ভাবছে, শ্যামল আবার বলল, ‘তুমিও বিয়ে করে ফেলো, কান্তিদা। নইলে দল রাখতে পারবে না। তারপর তোমার যদি পছন্দ হয় তুমি মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচবে, আর আমি নাচব বউদির সঙ্গে। কেমন? অন্যায় বলেছি? এটা কি অন্যান্য স্বামীদেরও মনের কথা নয়?’

হা ভগবান! কান্তি একবার আকাশের দিকে তাকাল। একবার শ্যামলের দিকে। তারপর বলল, ‘শ্যামল, আমাকে বিশ্বাস করো। আমি যখন যার সঙ্গে নাচি তখন তার সঙ্গে আমার নিষ্কাম সম্পর্ক। সৌন্দর্য ভিন্ন আর কিছু আমি দেখিনে। ফুল দেখে আমি আনন্দ পাই, ছিঁড়তে যাইনে। এর মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি নেই, চাতুরী নেই, শ্যামল। ভুল বুঝো না আমাকে।’

শ্যামল নিরস্ত হল। কিন্তু কয়েক মাস পরে কান্তির নিজেরই টনক নড়ল। মীনাক্ষী তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যার অর্থ, যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর। বম্বে। অনুত্তম গেছে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সন্দেশ নিয়ে সরদার বল্লভভাই সকাশে। সুভাষের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বনিবনা হচ্ছে না, মিটমাটের চেষ্টায় চরকির মতো বনবন করছে অনুত্তম। চরকা গেছে চুলোয়। ওই যে খদ্দরের ঝোলাটা ওর জায়গা নিয়েছে চামড়ার ব্রিফকেস। তাতে আছে রাজনৈতিক কাগজপত্র। একান্ত গোপনীয়। নীল চশমাটা তেমনি আছে। তবে তার ফ্রেমটা সোনা হয়ে গেছে। যে পরশপাথরের ছোঁয়া লেগেছে চশমার ফ্রেমে তারই ছোঁয়া লেগেছে সারা অঙ্গে। কটিবস্ত্র হয়েছে কোঁচানো ধুতি, তুলে না ধরলে ধুলোয় লুটোত। খালি পা ঢাকা পড়েছে সাদা লপেটায়, মাটির সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন। খাটো কুর্তি এখন পুরো পাঞ্জাবি, তার উপর হাতকাটা জহরকোট।

চেহারাটা কিন্তু খারাপের দিকে। রোদের তাতে পুড়ে বৃষ্টির জলে ভিজে ঝড়ের ঝাপটা সয়ে উইয়ের কামড় খেয়ে শুকনো ডালের যে দশা হয় অনুত্তমেরও তাই। ভাঙাচোরা কাঠখোট্টা হাড় বার-করা চুল-পাতলা। সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহবশত বাংলার সরকার তাকে প্রথমে কয়েদ করে, তারপরে অন্তরিন করে। পাঁচ-ছ বছর কেটে যায় বকসায়, দেউলিতে, অজ পাড়াগাঁয়। পরে হাসপাতালে। অথচ সন্ত্রাসবাদী সে কোনো কালেই ছিল না। শুধু রওশনের জন্যে এ দুর্ভোগ। যাক, তার ফলে সুভাষের সুনজরে পড়েছে। 'আমি অনুত্তম, সুভাষদার কাছ থেকে আসছি,' যেখানে যায় সেখানে এই তার পরিচয়পত্র। ছাড়পত্রও বটে, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের পুলিশ একথা শুনলে 'নমস্তে' বলে হটে যায়। কেবল বাংলাদেশের ওরা আঠার মতো লেগে থাকে। সেই জন্যই তো হাইকম্যাণ্ডের উপর তার অভিমান।

অনুত্তম মেরিন ড্রাইভ থেকে চৌপাটি হয়ে মালাবার পাহাড়ে যাচ্ছিল, একজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করতে। উলটো দিক থেকে আসছিল আর একখানা মোটর। মুখোমুখি হতেই ও মোটরটা গেল থেমে। ড্রাইভারের সিট ছেড়ে বেরিয়ে এল এক মিলিটারি সাহেব। হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুত্তমের ড্রাইভারকে ইশারা করল গাড়ি থামাতে। অনুত্তম তো রেগে বেগনি। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে এই অনাচার। মন্ত্রীরা তা হলে করছে কী! দেখে নেব মুনশিকে। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে রাগতভাবে বলল, 'আমি অনুত্তম, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আসছি।'

'আর আমি তন্ময়, পুনা থেকে আসছি।' বলে হো-হো করে হেসে উঠল সাহেব।

ঝাঁকানি ও কোলাকুলির পর দুই বন্ধুর খেয়াল হল যে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় ট্রাফিক বন্ধ হতে বসেছে। তখন তন্ময় টেনে নিয়ে গেল অনুত্তমকে নিজের মোটরে, অপরটাকে বলল ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণ করতে। ব্যালার্ড পিয়ার।

'খবর পেয়েছিস কি না জানিনে, সুজন আসছে কলম্বো থেকে যে জাহাজে সেই জাহাজেই কান্তি রওনা হচ্ছে ইউরোপ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। ভাবছিলুম তিন জনের দেখা হবে, চার জনের হবে না। অনু ভাই যদি থাকত। ভাবতে-না-ভাবতে তোর সঙ্গে মুখোমুখি। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জীবনটাই অদ্ভুত! আমি আজকাল অদৃষ্টবাদী হয়েছি। আর তুই?'

'আমি? আমার কথা থাক। হ্যাঁ রে, তুই নাকি বিয়ে করেছিস? পেয়েছিস তা হলে তাকে? তোর রূপমতীকে?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তন্ময় বলল, 'বিয়ে করেছি। এক বার নয়, দু-বার। পেয়েছি, পেয়ে হারিয়েছি। হেরে গেছি। দেখে বুঝতে পারছিস নে, আমি পরাজিত?'

অনুত্তম লক্ষ করল তন্ময়ের মাথার চুল কাঁচা-পাকা। ষণ্ডা ষণ্ডা বলীবর্দের মতো আকার, কিন্তু অসহায়ের মতো মুখভাব। দু-চোখে কতকালের জমাট কান্না। তার হাসি যেন কান্নার রূপান্তর। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে। তবু সে বেঁচে আছে, আবার বিয়ে করেছে, চাকরিতে ভালোই করেছে বলে মনে হয়। ছেলে-মেয়ে?

‘ছেলে-মেয়ে দুটি। কিন্তু রূপমতীর নয়। সে আমার সন্তানের মা হল না। আমি তার শুভকামনা করি। শুভকামনা করি আর একজনেরও। আমার কপালে যে সুখ সইল না তার কপালে যেন সয়। কিন্তু সইবে কী! আমার সমবেদনা তার প্রতি।’

অনুত্তম হাঁ করে শুনছিল। স্টিয়ারিং হুইলে ছিল তন্ময়ের হাত, নইলে তাকে ধাক্কা মেরে বলত, ‘এসব কী, তনু ভাই। এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! হ্যাঁ রে, তুই কি পাগল হলি!’

তন্ময় ভারী গলায় বলে চলল, ‘কোনটা ভালো? পেয়ে হারানো? না আদৌ না পাওয়া? এক এক সময়ে মনে হয় আমি ভাগ্যবান যে আমি তাকে চোখে দেখেছি, বুকে ধরেছি, ঘরে ভরেছি, কোলে রেখেছি। এক এক সময় মনে হয় আমি পরম হতভাগ্য। আমি অসীম কৃপার পাত্র। আমার বউ চলে গেছে আমাকে ফেলে অন্যের অন্তঃপুরে।’

অনুত্তম আর সহ্য করতে পারছিল না। ঝুনো নারকেলের মতো মানুষটা কাঁদো-কাঁদো সুরে বলছিল, ‘ওঃ! ওঃ! ওঃ!’

তন্ময় ক্ষণকাল উদাস থেকে তারপর কখন একসময় আবার বলতে লাগল, ‘ইচ্ছা ছিল ওকে অনুসরণ করব। অনুসরণই তো অন্বেষণ। কে জানে হয়তো ওর মন ফিরবে। তখন ঘরের বউ ঘরে ফিরবে। কিন্তু ডিভোর্সের যুক্তিসংগত কারণ নেই দেখে ওর উকিল ওকে কুপরামর্শ দেয়। আর্জিতে লেখায় আমি নাকি সহবাসে অসমর্থ। তামাশা মন্দ নয়, প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হল প্রতিবাদীর উপরে। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি গরহাজির থাকলুম। একতরফা ডিক্রি পেয়ে সে মামলায় জিতল।’

অনুত্তম ততক্ষণে রাগে গরগর করছে। বলল, ‘তুই ভুল দেখেছিস। ও রূপমতী নয়। রূপমতী হলে এমন কাজ করত না।’

তন্ময় হেসে বলল, ‘ওইখানে তোর সঙ্গে আমার মতভেদ। পদ্মাবতীর পরিচয়—করা না করায়। রূপমতীর পরিচয়—হওয়া না হওয়ায়। ও যে রূপমতী হয়েছে এটা জাগ্রত সত্য। কাজটা যদিও নিন্দনীয়। চরিত্রের ত্রুটি তো রূপের অপূর্ণতা নয়। তা সত্ত্বেও আমি ওকে ফিরে পেতে রাজি ছিলুম। ইচ্ছা ছিল না আর একটা বিয়ে করতে। কিন্তু যেখানে যাই সেখানে আমাকে দেখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমি যেন একটা সং। টেনিসের ছোকরাগুলো পর্যন্ত ফিসফিস করে বলে, এ সাহেব মর্দানা নয়!’

‘ওদের দোষ কী! আমি তোর বন্ধু না হলে ও ছাড়া আর কী বলতুম!’

‘ক্লাব ছেড়ে দিলুম। মেসে যাইনে। কিন্তু টেনিস? টেনিস যে আমার প্রাণ। তা বলে রোজ রোজ ওকথা বরদাস্ত হয় কখনো? স্থির করলুম বিয়েই করব আরেকবার। বিধাতা বিমুখ না হলে প্রমাণও করব যে আমি অশক্ত নই। তারপর জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ এল। রূপবতী নয়, সাধ্বী সতী।’

অনুত্তম খুশি হয়ে বলল, ‘সেই ভালো। সেই ভালো। কিন্তু এখন থাক। পরে শুনব সব বৃত্তান্ত। ওই তো ব্যালার্ড পিয়ার দেখা যাচ্ছে। সুজনের সঙ্গে কান্তির সাক্ষাৎ হবে। আঃ! কী আনন্দ! কত কাল পরে, বল দেখি। চো-দ্দো ব-ছ-র। রামের বনবাস। ওঃ!’

ব্যালার্ড পিয়ারে জাহাজ ভিড়তে যাচ্ছে এমন সময় এরা পৌঁছোয়। সুজনের মতো কে যেন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। হাত নাড়ল এরা। হাত নাড়ল সেও। তারপর জাহাজ যতই কাছে অসতে লাগল ততই পরিষ্কার মালুম হতে থাকল সে সুজনই বটে। মাথায় চকচকে টাক। ভুঁড়িটি তুলোভরা তাকিয়ার মতো। কেবল মুখখানা তেমনি স্বপ্নবিভোর, তেমনি কোমল মধুর।

জাহাজ ভিড়তেই এরা দু-বন্ধু সোজা উঠে গেল গ্যাংওয়ে বেয়ে। জড়িয়ে ধরল ওকে।

‘তন্ময় ভাই! অনুত্তম ভাই!’

‘সুজন ভাই! সুজন ভাই!’

‘তোরা কে কেমন আছিস, ভাই?’

‘তুই কেমন আছিস, ভাই?’

'হবে, হবে সব কথা। কিন্তু কান্তি ভাই কোথায়? তার খবর?'

'কান্তি এইখানেই আছে। এই জাহাজেই রওনা হচ্ছে কন্টিনেন্টে।'

'চমৎকার! তা হলে চল নামা যাক।'

ভারতের মাটিতে পা ঠেকানোর জন্যে সুজন অধীর হয়ে উঠেছিল। আর সকলের কাছে মাটি, তার কাছে মৃন্ময়ী মা। গুন গুন করে গান ধরল, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' এবং সত্যি সত্যি মাটিতে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে এক বার হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। তার চোখে জল এসে গেল।

'তেমনি সেন্টিমেন্টাল আছিস, দেখছি।' তন্ময় বলল স্নেহভরে।

'দেশের জন্যে দরদ কত!' অনুত্তম বলল খোঁচা দিয়ে। 'দমননীতির যুগটা বিদেশে গা-ঢাকা দিয়ে কাটালি। তারপর সিংহলে গেলি কোন দুঃখে!'

'কেন? তোর কি মনে নেই যে আমি একজনের অন্বেষণের ভার নিয়েছিলুম?'

'ওঃ! কলাবতীর অন্বেষণে লঙ্কায়! রাক্ষসের দেশে! হ্যাঁ, রূপকথায় সেইরকমই লেখে বটে। রাক্ষস-রাক্ষসীদের মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছিস, না প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিস, তাই বল।'

'আরে না, সেসব কিছুই নয়। বকুল আছে ওখানে, ওর সঙ্গে আট ন-বছর দেখা হয়নি। কবে আবার হবে এই ভেবে কলম্বো দিয়ে ফিরি। কথা ছিল সোজা মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা যাব, কিন্তু যা দেখলুম তারপরে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই প্রবল হল। চলে এলুম মুম্বাই। জলপথই ভালো লাগে আমার।'

তন্ময় কৌতূহলী হয়েছিল। অনুত্তমও গম্ভীরভাবে কৌতূহল গোপন করছিল।

'বল, বল, কী দেখলি কী শুনলি।'

সুজন তার হাতে হাত রেখে কানে কানে বলল, 'তোর রূপমতীকে দেখলুম।'

তন্ময়ের মুখ সাদা হয়ে গেল। সে বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে অনুত্তম বলল, 'কান্তির জন্যে কি ব্যালার্ড পিয়ারেই অপেক্ষা করা যাবে?'

তন্ময় বলল, 'না, চল আমার ক্লাবে তোদের নিয়ে যাই। কান্তিকে টেলিফোন করলে সেও ওইখানে জুটবে। সুজন, তুই আমার সঙ্গে পুনা যাবি, দু-চার দিন থাকবি। আর অনুত্তম, তোর অবশ্য জরুরি কাজ আছে। তোকে পুনায় টানব না। কিন্তু ক্লাবে টানব।'

'ক্লাব!' অনুত্তম বলল রঙ্গ করে, 'ক্লাবে যাচ্ছি জানলে একটা বোমা কি রিভলবার জোগাড় করতুম। ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল ন্যাকড়া সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তেমনি ক্লাব।'

তন্ময়ের ক্লাবের নাম ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া। সেখানে তার দারুণ খাতির। তার মাথায় কিন্তু তখনও ঘুরছিল সুজন কী দেখেছে কী শুনেছে। কথায় কথায় আবার ওই প্রসঙ্গ উঠল।

'আমি কি জানতুম যে ওই তোর রূপমতী? চোখ ঝলসানো রূপ দেখে ভাবছি কে এই অপ্সরা। শুনলুম রামায়ণের ফিলম হচ্ছে। তার শুটিং-এর জন্যে মুম্বই থেকে এঁরা এসেছেন। বকুলের স্বামী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা। সুযোগসুবিধার জন্যে তাঁর সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকার। তাঁর বাড়ি কলকাতায় শুনে রূপমতী আফশোস করলেন। তাঁরও তো স্বামীর বাড়ি কলকাতায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। স্বামীর নাম তন্ময়।'

সুজন আরও বলল, 'তোর ঠিকানা দিলেন তিনিই।'

অনুত্তম বলল, 'আর ও প্রসঙ্গ কেন? তন্ময় এখন অন্যের স্বামী, তিনিও এখন অন্যের স্ত্রী। পরপুরুষ আর পরস্ত্রীর আলোচনা কি নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয়?'

কথাটা অনুত্তম সুজনকে কটাক্ষ করে বলেনি। কিন্তু সুজন ওটা গায়ে পেতে নিল। বলল, 'নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় কি না নীতিনিপুণরাই বুঝবেন। আমার তো মনে হয় সত্যের দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। নইলে আমার নিজের কাহিনি অকথিত থেকে যায়।'

'ওঃ তাই নাকি?' চমকে উঠল অনুত্তম। 'তোর নিজের কাহিনি—'

‘ওই নীল চশমাটা হল নীতির চশমা। ওর ভিতর দিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকালে ভালো-মন্দ এই দুটো জিনিসই চোখে পড়ে। যা ভালো-মন্দের অতীত তার জন্যে চাই মুক্ত দৃষ্টি। সেটা নীতিনিপুণদের নীল চশমার সাধ্য নয়।’

অনুত্তম আহত হয়ে বলল, ‘তোর নিজের কাহিনি যদি অবাঞ্ছনীয় হয়ে থাকে তা হলেও আমি শুনব, ভাই সুজন। তা বলে আমাকে তুই দুঃখ দিস নে। এমনিতেই আমি দুঃখী।’

পুরাতন বন্ধুদের পুনর্মিলনে নিছক আনন্দ নেই, বেদনাও আছে। বেদনাটা এইজন্যে যে তাদের একজনের মত বা মতবাদ আরেকজনের থেকে এত বেশি ভিন্ন যে যতক্ষণ নীরব থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি, অন্যথা অশান্তি। কবিগুরু, গ্যয়টে পুরাতন বন্ধু বা প্রেমিকদের পুনদর্শন পছন্দ করতেন না। সুজনের ওকথা মনে পড়ে গেল।

তিন বন্ধুরই বাক্যালাপ আপনি বন্ধ হয়ে এসেছে, সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন করবার নেই, এমন সময় হইহই করে ঘরে ঢুকল কান্তি। উল্লাসে আহ্লাদে প্রাণের উচ্ছলতায় অকৃপণ। এই একটা ‘শো’ দিচ্ছে তো এই একবার মহড়া দিচ্ছে। এই একজনের বাড়ি খেতে যাচ্ছে তো এই একজনের বাড়ি শুতে যাচ্ছে। এখানে ওর মাসিমা, ওখানে ওর পিসিমা, বাঙালি গুজরাতি সিন্ধি। রকমারি ভাষা শিখেছে কান্তি, কখনো উর্দু আওড়াচ্ছে, কখনো তামিল, কখনো ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ। পারসি ও ভাটিয়া বন্ধুরা চাঁদা করে পাথেয় দিচ্ছে, তাই নিয়ে প্যারিস যাচ্ছে সদলবলে।

‘তোরা তিন জনে প্যাঁচার মতো বসে আছিস কেন রে? ওঠ। ফোটো তোলাতে হবে। নাজুকে বলে এসেছি তৈরি থাকতে। চল’। এই বলে কান্তি অনুত্তমের টুপিতে টান দিল, সুজনের টাকে চিমটি কাটল, তন্ময়ের পিঠে থাপ্পড় মারল।

ঘরের জমাট আবহাওয়া তরল হল তার তারুণ্যের কিরণ লেগে। বয়সের চিহ্ন নেই তার শরীরে। তবে গভীরতার আভাস পাওয়া যায়।

‘সুজনকে তো দেখছি। সুজনিকা কোথায়? বড়ো আশা করেছিলুম রে। নিরাশ হলুম। আর তন্ময়, তোর সঙ্গে এক বার দেখা হয়েছিল পুনায়, তোর তন্ময়িনীর সঙ্গেও। মনের মতো বউ পেয়েছিস, আর ভাবনা কীসের! অতীতের জন্যে হা-হুতাশ করে জীবন অপচয় করিসনে। এই অনুত্তম, তোর দেশের কাজ কি কোনোদিন ফুরোবে না? ঘরসংসার করবিনে? বলিস তো একটি পাত্রী দেখি তোর জন্যে। একটি অনুত্তমা।’

‘তোর নিজের কথা বল, আমার কথা পরে হবে।’ অনুত্তম তার কাছে সরে এল।

‘আমার কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু আমার সময় সংক্ষিপ্ত। জাহাজ ধরতে হবে। তা তুইও চল না আমার সঙ্গে এক জাহাজে? তোরাই তো গভর্নমেন্ট। পাসপোর্ট পেতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না। প্যাসেজ আমি দেব।’

অনুত্তম মুচকি হাসল। কান্তি কী করে জানবে কার চিঠি রয়েছে তার ব্রিফকেসে। মহামান্য আগা খাঁর। দরকার হলে সে প্যারিসে উড়ে যেতে পারে তাঁর চিঠির জবাব দিয়ে আসতে।

‘কান্তি, তোর বোধ হয় মনে পড়ছে না যে পুরীতে আমরা স্থির করেছিলুম আবার যখন চার জনে মিলিত হব তখন যে-যার অন্বেষণের কাহিনি শোনাব। আমার কাহিনি তো সকলে তোরা জানিস, সময় থাকলে সমস্তটা শোনাতুম। এখন তোদের তিনজনের কাহিনি শোনা যাক। ফোটোর জন্যে আমিই ব্যবস্থা করছি। জাহাজঘাটেই ভালো হবে।’ বলল তন্ময়।

‘সুজন দেশে ফিরেছে, অনুত্তমও আর জেলে যাচ্ছে না, তন্ময় তো তার অন্বেষণ পর্ব শেষ করে দিয়েছে। আমি ইউরোপ থেকে ঘুরে আসি, তার পরে একটা দিন ফেলে আমরা চারজনে একত্র হব কোনো এক জায়গায়। তখন প্রাণখুলে গল্প করার মতো অবসর জুটবে। আজকের এই মিলনটা বিদায়ের ছায়ায় মলিন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে কি জীবনের রাগিণী বিস্তার করা যায়? এ যেন রেডিয়োতে গান গাওয়া। কাহিনি থাক, শুধু বলা যাক, কে কোথায় পৌঁছেছে।’

কান্তির এ প্রস্তাব সমর্থন করল সুজন। ‘কে কোথায় পৌঁছেছে। তন্ময়, তুই শুরু কর।’

তন্ময় বলল, ‘আমি একেবারে পৌঁছে গেছি। বুড়ি ছুঁয়েছি। আমার অন্বেষণের আর কোনো পর্যায় বাকি নেই। রূপমতীকে দেখেছি, চিনেছি, পেয়েছি, হারিয়েছি, হারানো সত্ত্বেও চিরকালের মতো পেয়েছি। মাত্র কয়েকটা বছরে যা অনুভব করেছি সারাজীবনেও তা হয় না। ওই কয়েকটা বছরই আমার সারাজীবন। বাকিটা তার সম্প্রসারণ।’

‘আমি’, অনুত্তম বলল, ‘এখনও পৌঁছোইনি। আমার মনে হচ্ছে সামনে আর একটা সংঘাত আসছে। ইংরেজ তার আগে নড়বে না। তার জন্যে দেশকে তৈরি করা আমার কাজ। দেশ যখন তৈরি হবে তখন সেই ঘনঘটার মধ্যে আবার পদ্মাবতীর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি ঘটবে। তুই ইউরোপ থেকে ফিরে দিন ফেলতে চাস, কান্তি। দিনটা বোধ হয় পাঁচ বছরের আগে নয়। তার আগে আমি কোথাও পৌঁছোব না।’

সুজন বলল, ‘আমার অবস্থা তন্ময় ও অনুত্তম এ দু-জনের মাঝামাঝি। আমার কাহিনি এখনও সমাপ্ত হয়নি, কিন্তু তার সমাপ্তির জন্যে পাঁচ বছর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার জীবনটা যে এত দীর্ঘ হবে তা কি আমি ভেবেছি? ধরে নিয়েছি কাহিনিটা শেষ হবার আগে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। তা যখন হল না তখন কাহিনিটাই সংক্ষেপ করে আনব। আমার কলাবতীকে আমি কোনোদিনই পাব না, এক-শো বছর বাঁচলেও পাব না। এ জন্মে নয়। এ বিশ্বাস দৃঢ় হল এবার কলম্বো গিয়ে।’

বলতে বলতে সুজনের কণ্ঠস্বরে কারুণ্য এল। ‘আমার সাধ্যের সীমা কতদূর তার একটা আভাস পেয়েছি। সাধ্যের অতিরিক্ত করতে গেলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না, শুধু জীবন বৃথা যায়। তার চেয়ে পরাজয় বরণ করা শ্রেয়। আমি পরাজিত, একথা বলতে একদিন আমার আত্মাভিমানে বাধত। এখনও বাধছে। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন আমি অসংকোচে হার মানব।’

‘যেমন আমি মেনেছি হার!’ তন্ময় ক্ষীণ স্বরে বলল।

এবার কান্তির পালা। একটু আগে যে হইচই করছিল, খই ফুটছিল যার মুখে, সে একেবারে চুপ। নিথর নিঃস্পন্দ হয়ে বসেছিল ধ্যানীবুদ্ধের মতো। জাহাজ ধরতে হবে, তার জন্যে তাড়া নেই। বলবে না মনে করেছিল, কিন্তু না বলে উপায় নেই। কী বলবে? কতটুকু বলবে?

‘অনুত্তম, সুজন, তন্ময়’, ধীরে ধীরে বলতে লাগল কান্তি, ‘তোদের অন্বেষণ আর আমার অন্বেষণ একজাতের নয়। আমার কান্তিমতী সবঠাঁই রয়েছে। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে কোথাও যেতে হবে না। তাই পৌঁছোনোর প্রশ্ন ওঠে না। আমি গোড়া থেকেই পৌঁছে রয়েছি।’

‘তা হলে’, কান্তিই আবার বলল, ‘কীসের অন্বেষণে আমি ঘুরছি? কবে সাঙ্গ হবে অন্বেষণ? আমিও নিজেকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পাই, কোথাও বাঁধা থাকব না, কারও সঙ্গে নীড় বাঁধব না, আকাশে আকাশে পাশাপাশি উড়ব। কিন্তু আরেকজন রাজি হলে তো! সে যদি বলে, আকাশে আকাশে পাশাপাশি নয়, বাঁধা নীড়ে পাশাপাশি, তাও এক বসন্তে নয়, প্রতি বসন্তে, সারাজীবনের সব ক-টা ঋতুতে। সে যদি বলে, সংসারী হও, সন্তানের ভার নাও, সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শান্তিতে থাক, তার পরে যদি সুযোগ হয় তবেই সৃষ্টি করবে, নয় তো নয়!’

বন্ধুরা সমব্যথী। কেউ কোনো মন্তব্য করে না। তখন কান্তি শুধু এইটুকু বলে শেষ করে দেয়, ‘আমি অপরাজিত। অপরাজিতই থাকব।’

ঘরের আবহাওয়া আবার জমাট হয়ে আসছে দেখে তন্ময় হেসে বলল, ‘যদি না মেলে অপরাজিতা।’ বলে সুজনের সঙ্গে চোখাচোখি করল। কিন্তু সুজনের চোখে হাসি কোথায়! সে যেন আসন্ন পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় Stoic-এর মতো কঠোর। এ কোন নতুন সুজন!

অনুত্তম উঠে বলল, ‘আমাকে মাফ করিস, ভাই কান্তি। তোকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে চেষ্টা করব। কিন্তু আপাতত বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। রাজনীতি অতি নিষ্ঠুরা স্বামিনী। গিয়ে হয়তো শুনব আমারই দোষে মিটমাটের সুতো ছিঁড়ে গেছে।’

তন্ময় ও রূপমতী

বিয়ের দিনটা নিছক আনন্দের দিন। তন্ময় কিন্তু সে-দিন অবিমিশ্র আনন্দ বোধ করেনি। বাসররাত্রি জেগে কাটিয়েছে অপলক দৃষ্টিতে। তার বধূর দিকে চেয়ে। তার ঘুমন্ত রাজকন্যার দিকে। যে রাজকন্যা তার ঘরে, তার শয্যায়, তার বাহু উপাধানে, তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাস মিশিয়ে প্রথম আত্মসমর্পণের পর পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রষুপ্ত।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। রমণীয় রূপ। বিকশিত যৌবন। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ। তনুসুরভি। এ কি কখনো স্থির থাকতে পারে একরজনীর বাহুবন্ধনে! এ চলবে। এর পিছন পিছন চলতে হবে তন্ময়কেও। অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণে ক্লান্তি এলে ক্ষান্তি দিলে রূপমতী চলে যাবে দৃষ্টির আড়ালে। দাঁড়াবে না, পায়চারি করবে না, ফিরে আসবে না। তা হলে আমার সুখ! —তন্ময় ভাবে।

সুখের জন্যে বিয়ে করতে হলে করতে হয় তাকে যে থাকতে এসেছে। যে স্থির থাকবে। কিন্তু সে তো রূপমতী নয়। তার সঙ্গে ঘর করে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু এর সঙ্গে নিঃশ্বাস নিয়ে স্বর্গ ছুঁয়ে আসা যায়। ধন্য হয়েছি আমি, ধন্য একে পেয়ে। —তন্ময় ভাবে। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে! এখন থেকে মিনিট গুনতে, ঘণ্টা গুনতে, দিন গুনতে হবে। গুনতে হবে সপ্তাহ আর মাস। বছর পুরবে কি না কে বলতে পারে! হ্যাঁ, বছর পুরবে, বছরের পর বছর পুরবে, তন্ময় যদি ক্লান্ত না হয়; ক্ষান্ত না হয়। হ্যাঁ, আয়ুষ্কালও পুরবে তন্ময় যদি জীবনভর অনুসরণ করে, অন্বেষণ করে।

কিন্তু সুখ! সুখ কই তাতে? সেই অন্তহীন অনুকরণে? মন চায় স্থিতি। পরমা নিশ্চিতি। দেহ চায় বিশ্রাম। সবিশ্রাম সম্ভোগ। অনুসরণের জন্যে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত কে? আত্মা? আত্মারও কি শান্তির আকিঞ্চন নেই? সেও কি একদিন বিনতি করবে না, রূপমতী, দৃষ্টির আড়ালে চলে যেয়ো না, দাঁড়াও? রাজা সংবরণের মতো সূর্যকন্যাকে বলবে না, তপতি, আমি যে আর ছুটতে পারছিনে, থামো।

রাজ, প্রিয় রাজ, তুমি যদি দয়া করে ধরা না দাও আমার সাধ্য কী যে আমি তোমায় ধরি! এই যে তুমি ধরা দিয়েছ এ কি আমার সাধনায়! এ তোমার করুণায়। আমার সুখ আমার হাতে নয়। তোমার হাতে। —তন্ময় ভাবে। এক চোখে আনন্দ এক চোখে বিষাদ নিয়ে দু-চোখ ভরে দেখে। আহা, এই রাতটি যদি অশেষ হত, যদি কোনো মায়াবীর মায়াদন্ডের ছোঁওয়া লেগে অ-পোহান হত, যদি হাজার বছর কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ হিসাব না রাখত, তা হলে রূপ আর সুখ একে অপরকে ঘরছাড়া করত না, এক সঙ্গে বাস করত অনন্তকাল। এক বৃন্তে ফুটে থাকত রূপমতী নারী আর সুখীতম পুরুষ। কোনোদিন ঝরে পড়ত না।

রূপমতী নারী। চিরন্তনী নারী। এই নারীতে আছে সেই নারী। এ যদি একটি রাতও থাকে, তার পরে না থাকে, তা হলেও চিরন্তনের চিহ্ন রেখে যাবে তন্ময়ের জীবনে। পরশ-পাথরের পরশ লেগে সোনা হয়ে যাবে তার অঙ্গ। সোনা হয়ে যাবে তার মন। তন্ময়ের এক রাত্রের অভিজ্ঞতা সারাজীবনের রূপান্তর ঘটাবে। পরবর্তী জীবন অন্যরূপ হবে। তাতে সুখ থাকবে না ঠিক, রূপমতী কোলে না থাকলে সুখ কোথায়, নিত্য অনুসরণে সুখ থাকতে পারে না। তবু সে ধন্য, সে সার্থক, সে অসাধারণ ও অসামান্য। তন্ময় তার বিয়ের রাতটিকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে। এক জীবনে এমন রাত্রি দু-বার আসে না। কাল বেঁচে থাকবে কি না তাই-বা কেমন করে জানবে!

বাসরের পরে মধুমাস। মধুমাস যেন ফুরোতে চায় না। দু-জনে দু-জনের মুখে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে কখন একসময়। উঠে দেখে বেলা হয়ে গেছে। মুখোমুখি বসে কফি খায়। তারপর যে-যার সাজপোশাক পরতে যায়। দিনের বেলা তাদের ছাড়াছাড়ির পরে আবার মিলজুল হয়। প্রথম আবিষ্কারের পুলক নিয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

‘তন্ময়। তন্ময়। কোথায় তুমি? এসো আমার কাছে।’

‘রাজ। রাজ। এই যে তুমি। কত কাল পরে তোমায় দেখছি।’

‘কেন? কত কাল কেন? এখনও তো একঘণ্টা হয়নি।’

‘তোমার ঘড়িতে এক ঘণ্টা। আমার ঘড়িতে এক হাজার ঘণ্টা।’

‘ও ডারলিং!’

‘ও ডিয়ার!’

মধুমাসটা ফ্রান্সে কাটিয়ে ওরা ইংল্যাণ্ড যায়। চাকরির চেষ্টায় একটু বেশি ছাড়াছাড়ি হয়, একটু কম মিলজুল। তাতে রাতগুলি আরও মধুর হয়। ঘুম পথ ছেড়ে দেয় চুম-কে। কাজ জুটল। ফিরল ওরা স্বদেশে। ঘর বাঁধল পুনায়। সংসার শুরু হল। মধু, মধু, সব মধু। ধোপার খাতা, গয়লার হিসাব, দরজির মাপ, তাসখেলার দেনা—মধু, মধু, সব মধু।

প্রথম বছরটা ওরা এমনি করে কাটিয়ে দেয় নিজেদের নিয়ে। মাটিতে পা পড়ে না। তন্ময় এমনিতেই বেশ সুপুরুষ। রাজের সঙ্গে যখন সে বেরোয় তখন তাকে আরও সুদর্শন দেখায়। টেনিস খেলতে যখন সে নামে তখন ভিড় দাঁড়িয়ে যায় তাকে দেখতে। তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন রাজারাজড়া সাহেবসুবো, হাত বাড়িয়ে দেন তাঁদের মহিলারা। আর রাজ তো সমাজের আলো। পার্টির প্রাণ। সে না থাকলে উৎসবের উৎসাহ নিবে যায়। ক্লাবে, মেসে, লাটভবনে, রেসকোর্সে রাজ একটি অনুপম আকর্ষণ।

তারপরে কবে কেমন করে মনোমালিন্য সঞ্চার হল। পূর্ণিমার আকাশে ছোটো এক টুকরো কালো মেঘ। রূপমতী তার রূপচর্যা নিয়ে থাকে, রূপচর্যার পরের অধ্যায় সামাজিকতা। সংসারের প্রতি নজর নেই। স্বামীর প্রতি নজর থাকলেও সেটা তেমন আন্তরিক নয়। সেটা যেন একটা কর্তব্য করে যাওয়া। তন্ময় বুঝতে পারে পার্থক্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর ভাবে, বিশ্বের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে রাখতে পারব সে ক্ষমতা কি আমার আছে! বল কষাকষি করতে গেলে দেখব আমি অবল।

তন্ময়ের অধিকার একে একে খর্ব হল। যখন-তখন গায়ে হাত দিতে পারবে না। বুকে হাত দেওয়া একেবারে বারণ। দু-জনের দুটো আলাদা বিছানা। এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় যেতে অনুমতি লাগে। রূপমতী সকাল সকাল শুতে যায়, যদি না কোনো নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ থাকে। ঘুমের মাঝখানে তাকে বিরক্ত করা চলবে না। তার নিদ্রা নিয়মিত, তার আহার পরিমিত, তার ব্যায়াম দৈনন্দিন, তার স্নান ও প্রসাধন অন্তহীন। তার গড়ন, তার ডৌল, তার সুমিতি, তার সৌষ্ঠব তার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। তন্ময়ের যেমন চাকরি বজায় রাখা রূপমতীর তেমনি রূপলাবণ্য অটুট রাখা। সতীর সম্বল যেমন সতীত্ব, গায়িকার সম্বল যেমন গীতসিদ্ধি, রূপসির সম্বল তেমনি রূপ। লবণ যেমন লবণত্ব হারালে কোনো কাজে লাগে না, লাবণ্যবতী তেমনি লাবণ্য হারালে কারও কাছে আদর পায় না। সমাজের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও না। তখন তার দর ভূষিমাল হিসেবে। গিন্নিবান্নি বলে। তখন ধারে কাটে না, ভারে কাটে।

তারপর তন্ময় বুঝতে পারল রাজ কোনোদিন মা হবে না। মা হলে তার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। তা হলে সে আর রূপমতী থাকবে না। তন্ময় কি তখন তাকে পুঁছবে! পুরুষের ভালোবাসা রূপটুকুর জন্যে। রূপটুকু গেল তো ভ্রমর উড়ল। কথাটা স্পষ্ট করে খুলে না বললেও রাজ যা বলে তার ও ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। তন্ময় অবশ্য অকালে বাপ হবার জন্যে লালায়িত নয়, কিন্তু কস্মিনকালে হবে না এ তো বড়ো বিষম কথা। অপত্যকামনা কোন পুরুষের নেই! কোন নারীর!

এমনি করে তাদের দু-জনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হল; কিন্তু তন্ময় এ নিয়ে একটি কথাও বলল না। সংসারে নজর নেই তো কী হয়েছে! এতগুলো চাকর রয়েছে কী করতে! তারাই চালিয়ে নেবে। স্বামীর প্রতি নজর আন্তরিক নয় তো কী হয়েছে! স্বামী কি নিজের দেখাশোনা নিজে করতে পারে না! আর সন্তান যদি না হয় তা হলেই-বা কী এমন দুর্ভাগ্য! এই তো অমুক অমুক নিঃসন্তান। রোজ ওদের সঙ্গে দেখা হয়। কই, দেখে তো মনে হয় না খুব অসুখী। সন্তান হলে মশাই অনেক ঝামেলা। বাঁচিয়ে রাখো রে, মানুষ করো রে, সম্পত্তি দিয়ে যাও রে। কোথায় এত তালুক বা মুলুক! রোজগারের টাকা তো মাসকাবারের আগে হাওয়া হয়ে যায়। ও ভালোই হয়েছে। ছেলে হয়নি বা হবে না। তবু যদি হত!

হায় রে সুখের আশা! স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিবার। অল্পে সন্তুষ্ট একটি স্বাভাবিক জীবন। অথচ রূপমতী নারীর চিরনূতন সঙ্গ। চিরন্তনী নারীর রূপময় প্রকাশ। দু-দিক রক্ষা হয় কী করে? তন্ময় চায় সুখ এবং রূপ এক বৃন্তে দুই ফুল। শুধু রূপ নিয়ে সে সুখী হবে না। শুধু সুখ নিয়ে থাকতে চাইলে রূপ চলে যাবে। তার সদা শঙ্কা, গঙ্গা যেমন চলে গেল শান্তনুকে ফেলে রাজ তেমনি চলে যাবে তন্ময়কে ছেড়ে, যদি একটি কথা বলে তন্ময়। গঙ্গা তার সন্তানকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছিল। রাজ তার সন্তানকে গর্ভে আসতে দিল না।

রূপমতীর সৃষ্টি কারও সুখের জন্যে নয়। তন্ময় বলে একজন মানুষকে সুখ বলে একটা পদার্থ দেবার জন্যে সে পৃথিবীতে আসেনি। সে এসেছে অলোকসামান্য রূপ নিয়ে সর্বমানবের সৌন্দর্যতৃষা শীতল করতে। তন্ময়ের প্রতি তার অসীম অনুগ্রহ বলে সে তার ঘরনি হয়েছে। থাকুক যত দিন আছে। —ভাবে আর কাঁদে তন্ময়। কাঁদে। হ্যাঁ, পুরুষের মতো পুরুষ বলে যার প্রসিদ্ধি সেই বিখ্যাত খেলোয়াড় মনের দুঃখে চোখের জল ঝরায়। কেউ দেখতে পায় না। ওদিকে তার মাথার চুলে সাদা নিশান ওড়ে।

জীবনদেবতার কাছে এমন কী বেশি প্রার্থনা করেছে তন্ময়? কেন তা হলে তার কপালে সুখ নেই?—সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, যাদের তিনি সুখ দিয়েছেন তাদের কেউ কি পেয়েছে উত্তমা নায়িকার সঙ্গ? কেউ কি পেয়েছে রূপমতী নারীর স্পর্শ? তারপর সুখ? সুখ কাকে বলে! এই যে ওরা দু-টিতে মিলে একসঙ্গে আছে, দু-জনেই নিঃসন্তান, দু-জনেই সংসারবিরাগী, এও কি সুখ নয়? স্বার্থপরের মতো জনক হতে চাও তুমি, আরেক জন যে বন্ধ্যা হল, তার বেলা? তোমার চিহ্ন থাকবে না, তারও কি থাকবে? আহা, যদি একটি মেয়ে হত! এমনি রূপবতী।

মোট কথা, কেবলমাত্র রূপ নিয়ে তন্ময় তৃপ্ত নয়। সে চায় সুখ। জীবনমোহন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে তা মনে রেখেছে, তবু তার মন মানে না। এটা সে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যায় স্ত্রীর কাছে। রাজ জানে সবই, বোঝে তন্ময় কী পেলে তৃপ্ত হয়। কিন্তু তারও তো স্বধর্ম আছে। সৌন্দর্যের কাছে সুন্দরী নারীর দায়িত্ব কি প্রতিভার কাছে প্রতিভাবানের দায়িত্বের মতো নয়? সেই সর্বগ্রাসী দায়িত্বের খর্পর থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত সুখ উদ্ধার করা যায় সেটুকু কি সে তন্ময়ের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করছে না? সে কি নিজের জন্যে অতিরিক্ত সুখ দাবি করছে? জগতে রূপের চেয়ে চপল আর কী আছে? যা প্রতি মুহূর্তে পালিয়ে যাচ্ছে তাকে প্রতি মুহূর্তে ধরে রাখা কি সবচেয়ে কঠিন নয়? রূপের সাধনায় লেশমাত্র অবহেলা সয় না, পরে হাজার মাথা খুঁড়লেও হারানো রূপ ফিরে আসবে না। রাজ এই নিয়ে বিব্রত ও বিমনা। তন্ময় যেন তাকে ভুল বুঝে দুঃখ না পায়, দুঃখের ভাগী না করে। সন্তান! সন্তান কি সকলের হয়? আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে কি সন্তান নিশ্চিত হত? অতটা নিশ্চিত যদি তো করো আর কাউকে বিয়ে, ছেড়ে দাও আমাকে। —রাজ বলে আভাসে ইঙ্গিতে। টুকরো কথায়।

তবু তো তারা একসঙ্গে ছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল রাজের মন পুনরায় টিকছে না। সুযোগ পেলেই সে মুম্বই বেড়াতে যায়, রাত কাটিয়ে ফেরে বান্ধবীদের বাড়িতে। বলে, 'তোমাকে একা ফেলে যেতে কি আমার মন চায়? কিন্তু আমি জানি তোমার যা কাজ তার থেকে তোমাকে টেনে বার করা যায় না। তা বলে কি আমি একটু তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারব না? এই পচা হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাব?'

তন্ময় একটা বদলির দরখাস্ত করে দিল। তাতে কোনো ফল হল না। তার পরে করল লম্বা ছুটির দরখাস্ত। স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে যাবার জন্যে। লম্বা ছুটি মঞ্জুর হল না। কদাচ এক-আধ দিন খুচরো ছুটি মেলে। তখন মুম্বই যায় দু-জনে। কিংবা তন্ময় থাকে পুনায়, রাজ যায় মুম্বই। গৃহিণী অনুপস্থিত থাকলে গৃহ বলে একটা কিছু থাকে যদিও, তবু তাকে গৃহ বলা চলে না। কারই বা ভালো লাগে তেমন গৃহে একা দিনপাত করতে! দিন যদি-বা কাটে রাত কাটতে চায় না। একা শোওয়ার অভ্যাস তার বহু দিন থেকে। সে-জন্যে নয়। কিন্তু কাছাকাছি আর একজন যে নেই—যে উত্তমা নায়িকা, যার অস্তিত্ব তাকে পরমা তৃপ্তি দেয়, যেমন দেয় তার খোঁপার ফুলের গন্ধ। নেই, নেই, সব শূন্য।

যে থাকবে না তাকে ধরে রাখবে কোন মন্ত্রবলে? বিয়ের মন্ত্রে? বেঁধে রাখবে কোন বন্ধনে? সংসার বন্ধনে? অসহায় তন্ময়! এমন কাউকে জানে না যার কাছে বুদ্ধি ধার করতে পারে। জীবনমোহন যদি থাকতেন। কিন্তু বহু দিন তাঁর কোনো খোঁজখবর নেই। অনুত্তম, সুজন, কান্তি যে-যার নিজের ধান্দা নিয়ে কে কোথায় আছে। কারও সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। একজনের সমস্যা আরেক জনের দুর্বোধ্য। তন্ময়ের সমস্যা তো এই যে সে তার রূপমতীর অনুসরণে মুম্বই যেতে পারছে না। যেতে হলে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। তার পরে সংসার চলবে কী উপায়ে?

মুম্বই-এর বড়োলোকদের তন্ময় বলত বোম্বেটে। বোম্বেটেরা তার বউকে লুট করে নেবে, এ আশঙ্কা তার অবচেতনায় ছিল। লুট অবশ্য গায়ের জোরে নয়। দৌলতের জোরে, দহরম মহরমের জোরে। কোনোদিন কিন্তু কল্পনা করেনি যে রাজ অভিনয় করতে জানে। একটা শখের অভিনয়ে তাকে নামতে দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। শহরময় ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। সে নিজে অতটা প্রত্যাশা করেনি। তার বান্ধবীরাও করেনি। আর একটা শখের অভিনয়ের মহড়া চলেছে এমন সময় এক হিন্দি ফিলম কোম্পানি থেকে প্রস্তাব এল রাজ যদি নায়িকা সাজে তা হলে কোম্পানি তার সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি। হোটেলের সুইট তারাই জোগাবে। বিল তারাই মেটাবে। তাদের মোটর থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন। এ ছাড়া মাসে দু-হাজার টাকা হাতখরচা।

তন্ময়ের অনুমতি না নিয়ে রাজ চুক্তি করতে নারাজ। তন্ময় বলল, ‘তুমি যা ভালো মনে করবে তা করবে। আমি কি কোনোদিন কিছু বলেছি যে আজ বলব?’

‘না, না, তুমি বলবে বই কী। তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।’

‘আমি যদি বারণ না করি?’ তন্ময় বলল চোখে চোখ রেখে।

রাজ চোখ নামিয়ে বলল, ‘থাক।’

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল রাজ ক্রমেই তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। তাকে দাঁড়াতে বললে সে দাঁড়াবে না, থামতে বললে সে থামবে না, ফিরতে বললে সে ফিরবে না। একমাত্র পন্থা তার পিছু পিছু যাওয়া, তাকে সব প্রলোভন থেকে রক্ষা করা, সব সম্মোহন থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু তা হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তারপরে কী করে চালাবে? স্ত্রীর হোটেলের সুইটে স্ত্রীর পোষ্য হয়ে কাটাবে? না স্ত্রীর সুপারিশে কোম্পানির পোষ্য? কিছুদিন পরে যখন চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে তখন কি রাস্তায় দাঁড়াবে?

অনুসরণ করতে হলে যতটা ঝুঁকি নিতে হয় ততটা ঝুঁকি নিতে বিয়ের আগে সে তৈরি ছিল, বিয়ের পরে তৈরি নয় দেখা গেল। এখন সে একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক, দস্তুরমতো পদস্থ সরকারি কর্মচারী। টেনিসের কল্যাণে স্বয়ং লাটসাহেবের প্রিয়পাত্র। মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ে লাটসাহেবের সঙ্গে খেলতে। যখন তিনি পুনায় থাকেন। পুরুষ তার পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর অনুগত হয়ে জীবনপাত করবে? রূপমতী রাজকন্যার এই কি শর্ত? তাঁর কাঁদতে ইচ্ছা করে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেও। দেখতে ইয়া জোয়ান আসলে একটি অসহায় শিশু।

মাথার উপর সাদা নিশান উড়ল। তন্ময় তার স্ত্রীর সম্মানে মস্ত একটা পার্টি দিয়ে নিজের পরাভব উৎসবময় করল। অভিভূত দয়িতাকে বলল, ‘রাজ, রাজার মতো জয়যাত্রায় যাও।’

রাজ বুঝতে পেরেছিল এটা তার বিদায় সংবর্ধনা। তন্ময়ের কষ্ট দেখে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যে শক্তি তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে-শক্তির তুলনায় পিছুটান কিছু নয়! বলল, ‘তোমার অনেক কাজ। নইলে তোমাকে আমি এখানে একা থাকতে দিতুম না, প্রিয়তম। আমার মন পড়ে থাকবে তোমার কাছে। আসব আমি যখনি ছাড়া পাব। লণ্ডন নয়, প্যারিস নয়, যাচ্ছি তো মুম্বই। তিন ঘণ্টার যাত্রা। এটা কি একটা যাওয়া যে তুমি মন খারাপ করবে!’

রাজ সেদিন খোশ মেজাজে ছিল। তন্ময়ের কোলে আপনি এসে ধরা দিল। বলল, ‘এ ধন তো তোমার রইলই। এ কোনোদিন চুরি যাবে না। আমি তোমার হয়ে পাহারা দেব। ভেবো না।’ এই বলে তাকে সে-রাত্রে আশাতীত সুখ দিল।

এটা কি যাওয়া যে এই নিয়ে তন্ময় মন খারাপ করবে? বলতে পারল না বেচারা যে পুনা থেকে মুম্বই হলে মন খারাপ করত না, কিন্তু এ যে ঘরসংসার থেকে রঙ্গমঞ্চে, সমাজ থেকে অসমাজে। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির পরপারে। এ একপ্রকার মৃত্যু। যদিও বলতে নেই।

যাত্রাকালে একান্ত নম্র নত বিনীতভাবে সে তার পত্নীর করচুম্বন করল। বলল, 'পাছে তুমি চলে যাও সেই ভয়ে কোনোদিন তোমাকে কোনো কথা বলিনি। এখন তো তুমি আপনা হতে চললে। এখন আমার অন্তরে শুধু একটি কথা ঘুরে ফিরে আসছে।'

'সে কথাটি কী কথা?'

'সে কথাটি—' বলবে কী বলবে না করে অবশেষে বলেই ফেলল তন্ময়, 'সে-কথাটি এই কথা যে আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। কেন তবে তুমি আমাকে ছেড়ে চললে?' বলতে বলতে তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

'ওঃ ননসেন্স!' রাজ তার কপালে গায়ে চিবুকে ঠোঁটে চুম্বনের পর চুম্বন এঁকে দিল।

'তোমাকেই যদি ছাড়ব তবে কার জন্যে বাপ-মা জাতধর্ম ছেড়ে এলুম? তুমি আমারই। আমি তোমারই। কেউ কোনো অপরাধ করেনি। করছে না। করবে না। স্থির হও।'

হিন্দি ফিলমে নামবার সময় রাজ একটা ছদ্মনাম নিল। বসন্তমঞ্জরী। তার আবির্ভাব চিত্রজগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আনন্দের হিল্লোল তুলল। পুনায় যারা তাকে চিনত তারা এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল তন্ময়কে। নিজের স্ত্রীকে পরের নায়িকারূপে অভিনয় করতে দেখা কি সামান্য সৌভাগ্য! দেখতে গিয়ে তন্ময় ঠিক আর সকলের মতো তন্ময় হতে পারল না। মাঝখানে অন্যমনস্ক হল। নায়ক-নায়িকার প্রণয়দৃশ্য যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তবু একঘর লোক এমনভাবে নিল যেন সব কিছু হতে যাচ্ছে। আর কী বিশ্রী নাগরালি ওই নায়কটার!

তন্ময় আবার ছুটির দরখাস্ত করল। এবার তার ছুটির হুকুম এল। সে প্যারিসে যাবার আয়োজন করে রাজকে জানাল। রাজ বলল, 'এখন কী করে সম্ভব? ওরা আমাকে ছাড়লে তো? আমি যে একটা চুক্তি সই করেছি।'

চুক্তির খেলাপ করলে কিছু টাকা ঘর থেকে বেরিয় যেত। তন্ময় রাজি ছিল ও টাকা দিতে। কিন্তু রাজ বলল, 'প্রশ্নটা টাকার নয়। দেশের লোক চায় আমাকে দেখতে। রূপ যদি ভগবান আমাকে দিয়ে থাকেন তবে আমার দেশবাসী তার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? লোকে যখন তোমার টেনিস খেলা দেখতে চায় তখন তুমি কি পাহাড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে পার?'

বেচারার ছুটি নেওয়া হল না। যথাকালে নতুন ফিলম দেখতে হল। সেই নায়কটাই যেন মৌরসিপাট্টা নিয়েছে। যেখানেই বসন্তমঞ্জরী সেখানেই কিষণচন্দর। তন্ময় শুনতে পেল এটা যে কেবল স্টুডিয়োতে তাই নয়। হোটেলে রেসকোর্সে ক্লাবে। পার্টিতে। ওদের একসঙ্গে দেখতে দেখতে অপরিচিতরা ধরে নিয়েছে যে ওরা কেবল অভিনয় করে না। আর পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবছে তন্ময় কেন এতটা সহ্য করছে!

একদিন তন্ময়ের অনুযোগের উত্তরে রাজ বলল, 'ও আমার প্রোফেশনাল পার্টনার। তোমার যেমন টেনিস পার্টনার মিস উইলসন। এতে দোষের কী আছে? আমাকে তোমার যদি এতই সন্দেহ তুমিও একটি মিসট্রেস নিলে পার। আমি কিছু মনে করব না।'

শক পেয়ে স্তম্ভিত হল তন্ময়। অনেকক্ষণ পরে বাকশক্তি ফিরে পেয়ে বলল, 'যে উত্তমা নায়িকার স্বাদ পেয়েছে সে কি অপরা নায়িকা আস্বাদন করতে পারে!'

সুজনের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তার পরমায়ু বেশি দিন নয়। যে ক-দিন বাঁচবে সে ক-দিন কলাবতীর অন্বেষণে কাটাবে। অন্বেষণ কিন্তু মিলনের অন্বেষণ নয়। বকুলের সঙ্গে মিলন কোনোদিন হবে না। কলাবতীর অন্বেষণ হচ্ছে কলাবিদ্যার অন্বেষণ, যে বিদ্যা অতি সাধারণ লেখককে অসাধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনীর অন্বেষণও বটে, যে নারী তারার মতো সুদূর, অথচ তারার মতো তার প্রভাব পড়ে জীবনের উপরে।

এর কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। নিষ্ঠা রাখতে হবে কেবল কলাবিদ্যার প্রতি নয়, কলাবতীর প্রতিও। আর কাউকে বিয়ে করা চলবে না, আর কাউকে ভালোবাসা চলবে না। দ্বিচারিতা করলে অন্বেষণে ছেদ পড়বে। তারপর আর ক-টা দিনই বা সুজন বাঁচবে! কীই-বা দিয়ে যাবে সাহিত্যে! স্বল্প যার পরমায়ু সে কি অমন করে আয়ুক্ষয় করতে পারে! বাবা যদি বুঝতেন তা হলে কি তার মতো দেশকাতুরে লোক দেশান্তরী হত! তিনি অবুঝ বলেই না তাকে তার জীবনের পরিকল্পনা বদলাতে হল। শান্তশিষ্ট সুস্থির প্রকৃতির মানুষটি ধীরেসুস্থে কোঁচা দুলিয়ে কাছা ঝুলিয়ে ঢিলেঢালা জামা পরে থপ থপ করে কলকাতার রাস্তায় হাঁটত। আঁটসাঁট লাউঞ্জ সুট পরা ত্বরিতগতি করিৎকর্মা এ কোন পুরুষ তালে তালে পা তুলে পা ফেলে লণ্ডনের পথে-ঘাটে চলেছে!

স্বপ্নবিলাসী বলে ভাবালু বলে তার বন্ধুরা তাকে খোঁচা দিত। 'ওঃ সুজন! ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। একটা টেলিগ্রাম কেমন করে পাঠাতে হয় তা ও জানে না।' এখন তাকে যেই দেখে সেই তারিফ করে জোগাড়ে বলে চটপটে বলে। দেশে থাকতে মিশনারিদের বাংলা রচনা ঘষামাজা করতে হয়েছিল কয়েকবার। তাঁদের একজন লণ্ডনে তাকে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পরিমার্জনের জন্যে দেন। সে তো কোনোরকম পারিশ্রমিক নেবে না। পাদরিসাহেব তাই তাকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন সুপারিশ করে। বেতন এমন কিছু নয়, কিন্তু সুবাদ যথেষ্ট। সে বাংলার অধ্যাপক এই সুবাদে ব্যবসায়ী মহল থেকে অর্ডার পায় ইংরেজি বিজ্ঞাপন বাংলায় তর্জমার জন্যে। ওষুধের কৌটোয় পথ্যের শিশিতে সুজনের কীর্তি তার দেশবাসীর গোচর হয়।

দু-চার জায়গায় ঘোরাঘুরির পর সুজন রাসেল স্কোয়্যার অঞ্চলে গ্যারেট নেয়। রাত্রে শুতে আসে সেখানে। বাকি সময়টা বাইরে বাইরে কাটায়। বাইরেই খায়। খানাপিনায় তার বাছবিচার নেই। গোপালের মতো যা পায় তাই খায়। অথচ কী খুঁতখুঁতে ছিল দেশে থাকতে! সারাদিন খেটেখুটে রোজ সন্ধ্যা বেলা থিয়েটারে হাজির হওয়া তার চাই। যেদিন থিয়েটারে যায় না সে-দিন কনসার্টে যায়। যেদিন কনসার্টে যায় না সে-দিন যায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতায়। লণ্ডনে বারো মাস ত্রিশ দিন এতরকম আকর্ষণ যে দেখে ক্লান্তি আসে না। শুনে শ্রান্তি আসে না। নিত্যনূতনের নেশায় মশগুল থাকে সুজন।

কেবল রবিবারটা বাদে। সেদিন সে রাতকাপড়ের উপর ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে দেশের চিঠি কাগজ পড়ে আর দেশের লোকের জন্যে প্রবন্ধ লেখে। তার ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায় বুড়ি ল্যাণ্ডলেডি মিসেস কলোনি। বিকেলের দিকে সুজন তার সেরা পোশাক গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সামাজিকতা করতে। যার জন্যে সময় পায়নি সপ্তাহের অন্য কোনোদিন। কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালি পরিবারে তার বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাঁদের ওখানে গেলে একঝাঁক বাঙালি যুবক-যুবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মনে হয় বাংলায় ফিরে গেছি বিদেশি বেশবাসে। কথাবার্তা গল্পগুজব সব কিছু বাংলায়। বাংলা গান বাংলা সুর। বাংলা খাবার। বাঙালির রান্না।

মুখচোরা মানুষ। আলাপ করতে তার লজ্জাবতী লতার মতো সংকোচ। এমন যে সুজন বিদেশে তার হঠাৎ মুখ খুলে যায়। অপরিচিতকে—অপরিচিতাকেও—হাত বাড়িয়ে দিয়ে শুধায়, 'এই যে। কেমন আছেন?' সাহিত্যিক বলে তার নাম অনেকে জানত। যারা জানত না তারাও অনুমান করত তার চেহারা ও কথাবার্তা থেকে। থিয়েটার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর রাখত বলে সহজেই তার চার দিকে ভিড় জমত। যেসব থিয়েটার

পাবলিকের জন্যে নয়, যেখানে যেতে হলে মেথর হতে হয় বা মেম্বরের অতিথি হতে হয় সেখানেও তার গতিবিধি। কেবল অভিনয়ে নয়, মহড়ায়। সেসব গল্প শুনতে কার না আগ্রহ! কাজেই সুজনের আসাটা আরও অনেকের আসার কারণ ছিল। গৃহকর্ত্রীরা এটা জানতেন। কিন্তু রবিবার ভিন্ন আর কোনোদিন তার সময় হত না। সেদিন পালা করে সে বিভিন্ন পরিবারে নিমন্ত্রণরক্ষা করত।

যা হয়ে থাকে। তরুণীরা তাকে একটু বেশিরকম পছন্দ করতেন। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ যেমন সুলভ ছিল অন্তরঙ্গতা ছিল তেমনি দুর্লভ। দুর্লভ না বলে অসম্ভব বললেও চলে। তার জীবনের গল্প সে কাউকে বলত না। প্রশ্ন করলে পাশ কাটাত। নারীসংক্রান্ত কোনোরকম দুর্বলতা কেউ তার আচরণে লক্ষ করেনি। সে সকলের সঙ্গে সমানে মেশে, কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ করে মেশে না। যদি কেউ তার কাছে বিশেষ পক্ষপাত আশা করে তবে নিরাশ হতে বেশি দিন লাগে না। তার দিক থেকে সৌজন্যের অভাব নেই। সে যে সুজন। তার সৌজন্য ওষ্ঠগত নয়। সহৃদয়। কিন্তু যতই সহৃদয় হোক, ওটা সৌজন্যই। সৌজন্যের অধিক নয়। ভালোবাসা অন্য জিনিস। তার প্রথম কথা পক্ষপাত। একজনের প্রতি পক্ষপাত।

লণ্ডনের অফুরন্ত কর্মপ্রবাহে দিন কেমন করে সপ্তাহ হয়ে যায়, সপ্তাহ কেমন করে মাস, মাস কেমন করে বছর। সুজন ধ্যানের অবকাশ পায় না। তবু যখনই একটু অবসর পায় বকুলের ধ্যান করে। তার কলাবতীর। তার একমাত্র নারীর। যে নারী বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও ছিল, বিশ্বপ্রলয়ের পরেও থাকবে। যে নারীর স্থিতি দেহনিরপেক্ষ। যে নারী গৃহিণী হয়েও গৃহিণী নয়, জননী হয়েও জননী নয়। যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ জ্যোতি, তারায় তারায় দীপ্যমান। অন্ধকার যাকে আরও উজ্জ্বল করে ফোটায়। বিরহ যাকে আরও নিকট করে। বিরহের সাধনায় করতে হয় যার অন্বেষণ, মিলনের স্বপ্নে নয়।

সুজন মিলনের স্বপ্ন দেখে না। এ জন্মের মতো যা হবার হয়ে গেছে। ক-টা দিনেরই বা জীবন! দেখতে দেখতে সাঙ্গ হবে। বিরহেই কেটে যাবে দিন। বিরহেই ভরে উঠবে হৃদয়। উপচে পড়বে কবিতা। রচা হবে নব মেঘদূত। নতুন ডিভাইন কমেডি। মানবের মধুরতর গানগুলি মিলন থেকে আসেনি, এসেছে বিরহ থেকে। এই যে সুজন প্রেরণা পাচ্ছে লিখতে, সাত দিনে একদিন যদিও, এ কি মিলন থেকে না বিরহ থেকে? মিলন তাকে মূক করত মাধুর্যে, মূঢ় করত বিস্ময়ে। যার চার দিকে অন্ধকার নেই সেই সূর্যের দিকে তাকালে সে অন্ধ হয়ে যেত আনন্দে। এই সন্ধ্যাতারা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে না, সে অপরের দিকে তাকাতে পারছে, আর দশ জন মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারছে, সৌজন্যের পাত্রী পেয়ে সুজন হতে পারছে। এই ভালো, এই ভালো।

দেশে তার লেখার আদর বাড়ছিল। বিদেশে যদিও লেখক বলে কেউ চিনত না তবু গোটা দুই লিটল থিয়েটারের অভিনয়ে মহড়ার আড্ডায় হাজিরা দিতে দিতে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে সে একজন নাট্যসমালোচক হয়ে উঠেছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তার অভিমত জানতে চাইতেন। তার অভিমতকে যথেষ্ট ওজন দিতেন। জলহাওয়ার গুণে ওদিকে তার ওজনও বাড়ছিল বেশ। দেখে মনে হত লোকটা কেবল সমঝদার নয়, ওজনদারও বটে।

মনের অতলেও তার পরিবর্তন হচ্ছিল। এত গভীরে যে সে নিজে টের পাচ্ছিল কি না সন্দেহ। কলাবতীর প্রতি একনিষ্ঠতা, বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা তার মূলমন্ত্র কিন্তু একনিষ্ঠতা বলতে কাল যা বোঝাত আজও কি তাই বোঝায়? আজ যা বোঝায় কালও কি তাই বোঝাবে? সুজনের একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা বদলে যাচ্ছিল। এই যে এতগুলি মেয়ে এসেছে তার জীবনে এরা দু-দিন পরে এসেছে বলে কি এদের কারও সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ পাতানো যায় না? কেবল মেলামেশা পর্যন্ত দৌড়? সে গণ্ডী অতিক্রম করলে একনিষ্ঠতার মর্যাদা থাকে না?

সুজনের সঙ্গে যাদের পরিচয় তাদের মধ্যে তিন জনের সঙ্গে তার মেলামেশা ক্রমে মন জানাজানির পর্যায়ে পৌঁছোল। মন দেওয়া-নেওয়া নয় কিন্তু। তার বেলা সুজন অতি সজাগ। ঊর্মিলা তাকে সোজাসুজি সুজন বলে ডাকত। বরাবর ইংল্যাণ্ডে মানুষ হয়েছে। বাঙালির মেয়েদের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে জানে না।

সিলভিয়া তাকে আরও ছোটো করে জন বলে ডাকে। সেও বলে সিলভি। ইংরেজের মেয়ে, কিন্তু বাংলায় জন্ম। বেশ বাংলা বলে। অনেকটা বাঙালি মেয়ের মতো হাবভাব। এরা দু-জনে কুমারী। আর ম্যাদলিন বিবাহিতা। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে দেখা হত। ফরাসি মহিলা, বয়সে বড়ো। ভদ্রতা করে সুজন তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিত ফেরবার পথে। তাঁর স্বামী দরজা খুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে এক পেয়ালা কালো কফি না খেলে তিনি ছাড়তেন না। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ তিনি ইংরেজি বুলি বলবেন না, আর কেউ বললে বুঝবেন না। অগত্যা সুজনকে ফরাসি শিখতে হয়।

ঊর্মিলা, সিলভি, ম্যাদলিন এদের কাছে তার জীবনকাহিনি অজানা ছিল না। তার কাছে এদের যে অন্তরঙ্গতা সুজন অন্যের বেলা এড়াতে পেরেছে তা এদের বেলা পারেনি। এইটুকু বিশেষত্ব। এরা তার বন্ধু। যেমন বন্ধু কান্তি, তন্ময়, অনুত্তম। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধুসম্বন্ধ যেমন, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুসম্বন্ধ তেমনি। এটা নর-নারীর সম্বন্ধ নয়। সুতরাং একনিষ্ঠতার আদর্শে বাধে না। বকুল জানলে কিছু মনে করত না। করলে ভুল করত। সুজন বকুলকে চিঠিপত্র লেখে না, নয়তো নিজেই তাকে জানত। বকুল ভিন্ন আর কোনো মেয়ের সঙ্গে তার আর কোনোরকম সম্বন্ধ থাকবে না, থাকলে একনিষ্ঠতায় চিড় ধরবে, এটা স্বীকার করে নিতে তার আপত্তি ছিল। বরং তলিয়ে দেখলেই এইটেই তার কুমার জীবনকে সহনীয় করেছে। এক দিকে যেমন বকুলের প্রতি আনুগত্য তাকে অক্ষত রেখেছে আর এক দিকে তেমনি ঊর্মিলা, সিলভি, ম্যাদলিনের সঙ্গে সৌহার্দ্য তাকে অক্ষত থাকতে সাহায্য করেছে। নইলে তার নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বহ হত। তার অন্বেষণে অবসাদ আসত। ভালোবাসা এ নয়। কারণ এতে মন দেওয়া-নেওয়া নেই। সুজন একনিষ্ঠই রয়েছে।

তিন বছর পরে সে ডক্টরেট পেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির তুলনা করে সে একটি থিসিস লিখেছিল। সেটি প্রকাশ করতে আরও বছর খানেক লেগে গেল। এর পরে তার দেশে ফেরার কথা। দেশের জন্যে তার মন কেমন করছিল সেই প্রথম বছর থেকে। তার মতো দেশকাতুরে লোক যে এতদিন ধৈর্য ধরতে পেরেছে এই যথেষ্ট। ফিরে যাবার জন্যে প্যাসেজ কিনবে এমন সময় একখানা চিঠি এল। লিখেছেন একজন হবু শ্বশুর। চিঠির সঙ্গে একখানি ফোটো ছিল। হবুমতীর। তার সঙ্গে ছিল কয়েক ছত্র উপদেশামৃত। ওটুকু সুজনের পিতার। ব্রহ্মচর্যের পরের ধাপ গার্হস্থ্য। বিবাহ না করে গৃহস্থ হওয়া যায় না। বিবাহকাল সমুপস্থিত। এখন কেবল দেখতে হবে উপযুক্ত সহধর্মিণী কে? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি উত্তর দেব—হবুমতী। এমন কনে কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

কাজেই সুজনের দেশে ফেরা হল না। লণ্ডন ছাড়ল সে ঠিকই। কিন্তু কলকাতার জন্যে নয়। নাটকের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। চলল প্যারিসে। ইতিমধ্যে ফরাসি ভাষাটা তার উত্তমরূপে আয়ত্ত হয়েছিল। চাকরি জুটে গেল এক আমদানি-রপ্তানির কারবারে। ইংরেজি থেকে ফরাসিতে, ফরাসি থেকে ইংরেজিতে দলিলপত্র ভাষান্তর করতে হয়। সাধারণ অনুবাদকের চেয়ে আর একটু বেশি দায়িত্বজ্ঞান দরকার। দেশে থাকতে সুজন আইন পড়েছিল। সেটা কাজে লাগল। মাইনে মন্দ দেয় না। Place de la Republique অঞ্চলে হোটেলে থাকা পোষায়। ফরাসি প্রযোজকদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি জানতেন তাঁরা তার মুদ্রিত থিসিস উপহার পেয়ে তাকে ঢালাও অনুমতি দিলেন। মঞ্চের আড়ালে তার অবাধ প্রবেশ। তার মন্তব্য শুনতে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ।

লঙ্কায় গেলে নাকি রাবণ হয়। তা হলে লণ্ডনে গেলে হয় চটপটে জোগাড়ে ফিটফাট ছিমছাম। আর প্যারিসে গেলে? প্যারিসে গেলে হয় রুচিমান চতুর বাকপটু দিলখোলা। যাই বল ইংরেজরা এখনও পিউরিটান প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রঙ্গালয়েও না। ফরাসিদেরও বালাই নেই। খোলাখুলি আবহাওয়ায় সুজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভণ্ডামির মুখোশ আঁটতে হল না। বছরের পর বছর কাটে। দেশে ফেরার নাম করে না। দেশ থেকে অনুরোধ এলে লিখত, যেখানে দানাপানি সেখানে বীণাপাণি। এখানে যতদিন চাকরি আছে ততদিন শিল্পসৃষ্টিও আছে। দেশে গেলে তো বেকার হতে হবে। কিংবা দরবার করতে হবে যত সব হঠাৎ নবাবের হঠাৎ মোড়লের কাছে। শিল্পসৃষ্টি শিকেয় তোলা থাকবে। আসল কথা বিয়ে করতে তার একটুও

স্পৃহা ছিল না। বুড়ো বাপ বেঁচে আছেন শুধু ওইটুকুর জন্যে। কিন্তু কী করে তাঁকে বাধিত করা যায়? একজনকে বিয়ে করে, আর একজনের প্রতি অনুগত থাকবে, সার্কাসে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও এটা শক্ত। সুজনের বিচারে এটা দ্বিচারিতা, রাধার বিচারে যাই হোক।

এখনও কি সে বকুলের ধ্যান করে? বকুলের মুখখানি মনে পড়ে তার? তেমনি ভালোবাসে? হ্যাঁ, এখনও। বকুলকে আড়াল করেনি আর কারও মুখ। তবু তলে তলে পরিবর্তন চলছিল। একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা লণ্ডনে যেমন ছিল প্যারিসে তেমন ছিল না। মন জানাজানি থেকে মন দেওয়া-নেওয়ায় পৌঁছেছিল। দেহ ও মনের মাঝখানে স্পষ্ট একটা বেড়া আছে, সকলের চোখে পড়ে। যেখানে দেহের ব্যাপার সেখানে সুজন সব সময় সতর্ক। কিন্তু বন্ধুর ভালোবাসা ও প্রেমিকের ভালোবাসার মাঝখানে পরিষ্কার কোনো ভেদরেখা নেই। যতই সজাগ থাকো না কেন সীমানার ওপারে গিয়ে পড়া একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ। প্যারিসে এসে এই অভিজ্ঞতা হল। শুরু হয় বন্ধুতারূপে। বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু এমন এক সময় এল যখন সুজন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল যে বন্ধুতার রাজ্য পিছনে পড়ে আছে, পায়ের তলায় প্রেমের রাজ্যের মাটি। মেয়েটির নাম সোনিয়া। হোয়াইট রাশিয়ান। অনেক দুঃখ পাওয়া অনেক পোড় খাওয়া বিদগ্ধ কলাবিদ। বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়। লণ্ডনে সুজন তার রিসাইটালে যেত। তখন আলাপ হয়নি। পরে আলাপ হল প্যারিসে।

সোনিয়ার বিয়ে ভেঙে গেছে। সে আর বিয়ে করবে না। বিয়েকে তার ভয়। সুজনও বিয়ে করতে চায় না। বকুলের প্রতি দ্বিচারিতাকে তার ভয়। একনিষ্ঠতার আদর্শ এই এক জায়গায় অটল ছিল। কিন্তু সুজন যখন ধ্যান করতে বসে বকুলের রূপ ক্রমে সোনিয়ার রূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্ণ বিদগ্ধ অনিকেত অনাথ সোনিয়া। দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ তার নেই। ঘর নেই, দেশ নেই, ধন নেই, সঞ্চয় নেই। আছে ওই বেহালাটি। আর আছে প্রতিভা। যেখানে যখন ডাক পড়ে সেখানে তখন যায়। সুজনকে বলে যায়, আবার দেখা হবে। সুজন বসে থাকে পথ চেয়ে। বিরহ বোধ করে। এ বিরহ বকুলের জন্যে নয়। এ বিরহে মিলনবাসনা মেশানো। মিলন অবশ্য চোখে দেখা, কাছে থাকা, হাতে হাত ধরা, দৈবাৎ ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ানো। এও কি দ্বিচারিতা? সুজনের মন বলে, না। দ্বিচারিতা নয়। বরং তলিয়ে দেখলে এরই দ্বারা দ্বিচারিতা নিবারিত হচ্ছে। নয়তো তার কুমারজীবন অসহন হত। বকুল এর কী বুঝবে! তার তো এ সমস্যা নেই। তবু তাকে বুঝিয়ে বললে সে বুঝত। কিন্তু বোঝাবে কী করে? চিঠি লেখালেখি নেই। শুধু বড়োদিনের সময় কার্ড পাঠায়, কার্ড পায়। তাতে দু-এক ছত্র হাতের লেখা জুড়ে দেয় দু-জনেই।

দেহের সঙ্গে মনের সেই যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সেটাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল। কোথায় দাঁড়ি টানবে? কী করে থামবে! সুজন বুঝতে পারল এবার যা আসছে তা বিয়ে নয়, তবু বিয়ের থেকে অভিন্ন। তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা পালানো। তাকে প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। তার মানে সোনিয়াকে ত্যাগ। বেচারি সোনিয়া! তার জীবনটা ত্যাগে ত্যাগে জর্জর। যেই তাকে ভালোবেসেছে সেই তাকে ত্যাগ করেছে। সুজনও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাবতে সুজনের ব্যথা লাগে।

হ্যাঁ, আছে বটে আর একটা উপায়। বাসনা কামনাকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের রাশ টেনে ধরা, দেহের প্রতি নির্মম হওয়া। সোনিয়া যখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে সুজন তখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে না, সুজন ঠোঁট সরিয়ে নেবে। খেলার ছলে নয়, সত্যি সত্যি। ত্যাগ না করার একমাত্র শর্ত ভোগ না করা। ভোগ করতে গেলেই ত্যাগ করতে হবে। এ বড়ো নিষ্ঠুর ন্যায়শাস্ত্র। সোনিয়া সব কথা শুনে বলল, ‘বেশ, তাই হোক। তোমার শর্তে আমি রাজি। তুমি যেয়ো না।’ সুজন বেঁচে গেল। তাকে প্যারিস থেকে পালাতে হল না। সোনিয়াকে ত্যাগ করার গ্লানি বহন করতে হল না। কিন্তু নিত্য নিত্য সংগ্রাম করতে হল নিজের বাসনা-কামনার সঙ্গে। তার চেহারা বিশ্রী হয়ে গেল। মাথায় টাক পড়ল। ভুঁড়ি ফাঁপতে লাগল। আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে সে আঁতকে উঠল। ওদিকে সোনিয়ার তেমন কোনো রূপান্তর ঘটল না কিন্তু।

দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করে সুজনের জীবনের প্রত্যাশা দীর্ঘতর হয়েছিল। বিয়ে যদি তাকে কোনোদিন করতে হয় তবে তত দিনে তার আকার ও আকৃতি হোঁদলকুতকুতের মতো হয়ে থাকবে বলে তার ভয়। কলাবতীর অন্বেষণ তাকে সুন্দর না করে অসুন্দর করবে এই-বা কেমন কথা! চিরসৌন্দর্যের ধ্যান থেকে আসবে চরম কুরূপ! কোথায় তা হলে সে ভুল করেছে? সাধনার কোন পদক্ষেপে? প্রকৃতি এভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে কেন? সুজন ভাবে আর ভাবে। হঠাৎ তার মনে হয় একনিষ্ঠতাকে সে একটা ফেটিশ করে তুলেছে বলে তার এই দশা। যেখানে প্রেম সর্বদা সক্রিয় সেখানে একনিষ্ঠতা আপনাআপনি আসে। বকুলের প্রতি তার প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এখনও বিদ্যমান, কিন্তু বহতা নদীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। একনিষ্ঠতা এক্ষেত্রে নিজেকে বঞ্চিত করা। প্রকৃতি কেন ক্ষমা করবে?

এমন সময় দেশ থেকে চিঠি এল সুজনের বাবার শক্ত অসুখ। বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবেন না। ছেলেকে তিনি দেখতে চান। সোজা বাংলায়—যাবার আগে ছেলের বউ দেখে যেতে চান। এবার সুজন বেঁকে বসল না। বরং একপ্রকার স্বস্তি বোধ করল। বিয়ে যদি হয় তবে মরণাপন্ন পিতার অন্তিম ইচ্ছায় হোক। তার নিজের ইচ্ছায় নয়। তার নিজের ইচ্ছা যে কী তাই সে জানে না ও বোঝে না। পরমায়ু যদি প্রকৃতই দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতার খাতিরে সোনিয়ার প্রেম পাওয়া সত্ত্বেও অনবরত তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে হবে অবশিষ্ট জীবন। হ্রস্ব পরমায়ু ছিল ভালো। তার যখন কোনো লক্ষণ নেই তখন পরাজয় বরণ না করে উপায় কী! কিন্তু তার আগে একবার বকুলের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হয়। কলম্বো হয়ে দেশে ফিরবে সুজন। যদি দেখে বকুল সুখে আছে তা হলে সে তার বুড়ো বাপকে শেষ ক-টা দিন সুখী করবে। আর যদি লক্ষ করে বকুলের মনে সুখ নেই তবে কোন প্রাণে সে নিজের সুখ বা তার পিতার সুখ খুঁজবে! না, তেমন হৃদয়হীন সে নয়। কোনোদিন হবেও না। বকুল যদি অসুখী হয়ে থাকে তবে তার জন্যেই হয়েছে, তারই কথা ভেবে। অসুখীকে আরও অসুখী করবে কে? সুজন? প্রাণ গেলেও না। প্রাণ থাকতে তো নয়ই!

সোনিয়ার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে কলম্বোগামী জাহাজে চড়ে বসল সুজন। সে কাউকে বঞ্চনা করেনি। নিজেকেই বঞ্চিত করেছে। কেউ যেন তার উপর অভিমান পুষে না রাখে। সোনিয়া যেন না ভাবে সুজন তাকে ত্যাগ করেছে। সুখী হোক, সার্থক হোক সোনিয়া। এমন কেউ আসুক তার জীবনে যে তার সাথি হবে অনন্তকাল। বিদায়, প্রিয়ে! বিদায়, সোনিয়া!

কলম্বোয় মোহিত তাকে নিতে এসেছিল জাহাজ থেকে বাড়িতে। বকুল আসতে পারেনি কোলের ছেলে ফেলে। মোহিত তাকে পুরোনো বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরল। বিজয়ী প্রতিযোগীর মতো নয়। বকুল তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। শুকতারার মতো উজ্জ্বল তার চোখ। প্রজ্ঞাপারমিতার মতো ভাস্বর তার মুখ। মা হয়ে বকুল আরও সুন্দর হয়েছে। যেটুকু বাকি ছিল তার সৌন্দর্যের সেটুকু ভরে গেছে। ভরন্ত গড়ন। রাজরানির মতো চলন। এই আট-নয় বছরে বকুল বিকশিত হয়েছে শতদলের মতো। আর সুজন? সুজন হয়েছে ক্ষতবিক্ষত বঞ্চিত বিদগ্ধ।

মোহিত আর বকুল দু-জনের অনুরোধে সুজনকে থেকে যেতে হল সিংহলে দিনের পর দিন, পিতার জন্যে উদ্বেগ নিয়ে। তার ভালো লাগছিল থাকতে। বকুলকে তার জীবনের গল্প শোনাতে। তার ভবিষ্যতের কল্পনা জানাতে। কোনো কথা সে গোপন করল না, হাতে রাখল না। বকুলের জন্যে সে নিজের সুখ বিসর্জন দেবে যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে যে বকুল এ বিবাহে সুখী হয়নি। নয়তো একজন সুখী হবে, আরেক জন অসুখী হবে, একেই কি বলে একনিষ্ঠতা? সুজন আশা করেছিল বকুল তার কাছে মন খুলবে। কোনো কথা গোপন করবে না, লুকিয়ে রাখবে না। তা কি হয়! বকুলের স্বামী আছে, স্বামীর ঘরে বসে কেমন করে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা খুলে বলবে সে পরপুরুষকে!

বকুল বলল, 'আমি সুখী হয়েছি। এবার তুমি সুখী হলেই আমার আফশোস যায়। বিয়ে কোরো, সুজিদা। ভুলে যেয়ো আমাকে। ফরগেট মি, প্লিজ।'

রওশন তার বোরখা খুলে ফেলেছিল। অন্ধকার রাত। ঘোড়ার গাড়ি। একরাশ কালো চুল অনুত্তমের গায়ে এসে পড়ছিল। আহা! শিয়ালদা থেকে শ্যামবাজার যদি লক্ষ যোজন দূর হত, যদি সহস্র বর্ষের পথ হত।

দু-রাত দু-দিন তাদের চোখে পলক পড়েনি। কেবল কি পুলিশের ভয়ে, গোয়েন্দার ভয়ে? না পুনর্দর্শনের আশা নেই বলে? একজন আরেক জনের গায়ে ঢুলে পড়ছিল। কেবল কি ঘুমের ঘোরে? না বিচ্ছেদ আসন্ন বলে? কেউ কারুর নামটা পর্যন্ত জানে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সহযাত্রা শেষ হয়ে যাবে। শেষ যদি হয় তবে হোক না একটু দেরিতে। সেইজন্যে ওরা ট্যাক্সি নেয়নি।

বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রওশন বলল, 'কাল আসবেন?'

অনুত্তম চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে বলল, 'কখন?'

'দুপুরের দিকে। রওশন বললে কেউ চিনবে না। আমার নাম নয়নিকা।'

'নয়নিকা? কী মধুর নাম!'

'আপনার নাম যদি কেউ জানতে চায় তা হলে কী বলবেন?'

'অনুত্তম।'

'অনুত্তম! মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।'

'আমিও কি ভুলব নাকি? নয়নিকা আমার নয়নে থাকবে। ধ্যাননেত্রে।'

'আবার তা হলে দেখা হবে?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয় দেখা হবে।'

ঘোষ লেনের মোড়ে নয়নিকা নেমে গেল। অনুত্তম শুধু ঘোড়ার গাড়ির দরজাটা খুলে ধরল। হিন্দু পাড়ায় মৌলবির সাজ পরে নামতে তার সাহস ছিল না অত রাত্রে। বিশেষত নারী নিয়ে। ইচ্ছা থাকলেও নয়নিকা তেমন অনুরোধ করল না। বরং বোরখাটা ফেলে গেল গাড়িতে।

কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোতলায় অনুত্তমের পুরোনো আস্তানা। বন্ধুদের অনেকের জেল হয়ে গেছে। যে দু-এক জন ছিল তাকে আশ্রয় দিল। ওদিকে কিন্তু গাড়োয়ান গিয়ে পুলিশের কানে তুলল যে চট্টগ্রাম মেল থেকে শিয়ালদায় নেমেছেন এক মৌলবি সাহেব ও তাঁর বিবিসাহেবা। বিবি উতরে গেলেন শ্যামবাজারের হিন্দু পাড়ায়, মৌলবি তশরিফ নিয়েছেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোতলায়।

রাত তখনও পোহায়নি, অনুত্তম সুখস্বপ্ন দেখছে, এমন সময় হানা দিল পুলিশ। বেচারার পরণে তখনও মৌলবির পোশাক। বদলাবার অবকাশ পায়নি, কোনোমতে চারটি মুখে দিয়ে বিছানা নিয়েছে। হাতেনাতে ধরা পড়ে কবুল করতে বাধ্য হল যে সে মুসলমান নয়, হিন্দু। নইলে ওরা হয়তো মুসলমানির লক্ষণ মিলিয়ে দেখত।

তারপর কলেজ স্ট্রিট থেকে লালবাজার। লালবাজার থেকে হরিণবাড়ি। হরিণবাড়ি থেকে বহরমপুর। বহরমপুর থেকে রাজশাহী। অদৃষ্টপুরুষ তাকে নিয়ে পাশা খেলছিলেন। এক একটা দান পড়ে আর ঘুঁটি এগিয়ে চলে দু-ঘর চার ঘর। পেছিয়েও যায়। একটা বড়ো দান পড়ল, দশ দুই বারো। রাজশাহী থেকে দেউলি। সে দান উলটে গেল। দেউলি থেকে রাজশাহী। এরপরে রাজশাহী থেকে বকসা। বকসা থেকে আবার রাজশাহী। অবশেষে অন্তরিন।

অন্তরিন হয়ে তানোর, মান্দা, বদলগাছি, নন্দীগ্রাম, সিংড়া, লালপুর, চারঘাট এমনি সাত ঘাটের জল খেয়ে সে সত্যি সত্যি ছাড়া পেল। কিন্তু ছাড়া পেলেও ছাড়ন নেই। টিকটিকি সঙ্গ নেয় যখনই যেখানে যায়। তবে বাংলাদেশের বাইরে গেলে রেহাই। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ণধার। তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে অনুত্তমকে পাঠালেন বাংলার বাইরে কুটনৈতিক কাজে। ডিপ্লোম্যাট হয়ে লোকটার চেহারা ও চালচলন গেল বদলে।

সাত বছর ধরে সে দু-টি নারীর ধ্যান করেছে শয়নে স্বপনে জাগরণে। ভারতমাতা, যাঁর জপমন্ত্র বন্দে মাতরম। পদ্মাবতী, যার তপোমন্ত্র বন্দে প্রিয়াম। দু-জনের জন্যেই তার দুর্ভোগ। শুধু একজনের জন্যে নয়। তাই দু-জনের ধ্যানে তাঁর দুর্ভোগ মধুর। হ্যাঁ, আনন্দ আছে মায়ের জন্যে দুঃখ সয়ে, প্রিয়ার জন্যে দুঃখ পেয়ে। আরও তো কত রাজবন্দি সে দেখল। তাদের আনন্দ তার মতো ষোলো আনা নয়। ষোলো কলা নয়। তার আছে নয়নিকা, তাদের কে আছে?

'অনুত্তম? মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।' বলেছিল তার নয়নিকা। একটি মেয়ে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে। মনে রেখেছে নিশ্চয়। এইখানে তার জিত। তার সাথিদের উপরে জিত। তারা নিছক রাজবন্দি। সে রাজপুত্র। রাজকন্যা তাকে মনে রেখেছে। তার সাথিদের দিকে তাকায়, আর অনুকম্পায় ভরে ওঠে তার মন।

ছাড়া পেয়ে তার প্রথম কাজ হল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয় কাজ নয়নিকার অন্বেষণ। খোঁজ নিয়ে যা শুনল তার চেয়ে শক্তিশেল ছিল ভালো। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে। সে যে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে তা নয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গিয়ে এত লোককে বিপদগ্রস্ত করে যে পার্টির কর্তারা প্রাণের দায়ে তার বিয়ের ফতোয়া দেন। পার্টির আদেশ লঙ্ঘন করলে সাজা আছে। অগত্যা বিয়ে করতে হয়। এক বিলেতফেরতা ডেনটিস্ট তাকে বিনা পণে উদ্ধার করেন। তার গুরুজন তো বর্তে যান। পুলিশের দাপটে তাঁদের স্বস্তি ছিল না।

হায় কন্যা পদ্মাবতী! এই ছিল তোমার মনে! অনুত্তম বুকের ব্যথায় আকুলিবিকুলি করে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! হলে যাকে দেখব সে তো আমার পদ্মাবতী নয়! আমার মতো হতভাগ্য কে! যাদের আমি অনুকম্পা করেছি তারা একে একে বিয়ে করছে, কর্পোরেশনে কাজ পাচ্ছে, আমিই তাদের অনুকম্পার পাত্র। তোমাকেই বা দোষ দিই কী করে! পার্টির আদেশ। গুরুজনের নির্বন্ধ। ক-জন পারে অগ্রাহ্য করতে!

অনুত্তম ভেবে দেখল, সে নিজেও যে বিয়ে করতে চেয়েছিল তা নয়। দেশ যতদিন না স্বাধীনতা পেয়েছে বিয়ে করার স্বাধীনতা তার নেই। তা বলে কি নয়নিকা তত দিন অপেক্ষা করত? বাংলার কুমারী মেয়ে বাপ মা-র অমতে ক-দিন একলা থাকবে? কে তাকে পুষবে যদি তাঁরা না পারেন? তাঁরা যদি তত দিন বেঁচে না থাকেন? নয়নিকা যা করেছে ঠিকই করেছে। সে এখন পরস্ত্রী। তার দিকে তাকাবার অধিকার অনুত্তমের আর নেই। এমনকী প্রেরণার জন্যেও না।

এইখানেই সুজনের সঙ্গে তার তফাত মুম্বইতে সেদিন সুজনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। কান্তিকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়ে। দুই বন্ধুতে এ নিয়ে বোঝাপড়ার দরকার ছিল। হল ফেরবার পথে। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে জানলে অনুত্তম তার ধ্যান করত না সাত বছর, যা করেছে তা ভুল ধারণা থেকে করেছে। বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে জেনেও সুজন তার ধ্যান করেছে দশ বছর। দেশে থাকতে ও দেশের বাইরে। যা করেছে তা ঠিক ধারণা থেকে করেছে। দু-জনের বোঝাপড়া হল, কিন্তু বনিবনা হল না। সুজন কলকাতা চলে গেল, অনুত্তম থাকল ওয়ার্ধায়।

ওদিকে বল্লভভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, গান্ধীর সঙ্গেও হল না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ। তাঁদের অমতে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হলেন, কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা পেলেন না। ইস্তফা দিলেন। তারপরে যেসব কেলেঙ্কারি ঘটল তাতে অনুত্তমের মন উঠে গেল দু-পক্ষের উপর থেকে। সে যোগ দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলে। জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে। আর বাংলায় ফিরল না। যুদ্ধের প্রথম দিকে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে, কিন্তু তার পরে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিতে গড়িমসি করে। ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ ও অনুত্তম দু-জনেরই যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায়। দু-জনেই গ্রেপ্তার হন।

জেলে তো আরও অনেক বার থেকেছে, কিন্তু এবারকার মতো অসহ্য বোধ হয়নি। এবার নিছক রাজবন্দি। এমন কোনো নারী নেই যে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে, মনে রেখেছে। যে তার পদ্মাবতী। সে যার রাজপুত্র। হায় কন্যা পদ্মাবতী! কেমন করে তোমার ধ্যান করব!

ওদিকে কত বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। ধূমকেতুর পুচ্ছ লেগে ফ্রান্স পর্যন্ত টলে পড়েছে। ইংল্যাণ্ড ক-দিন টাল সামলাবে! এর পরে আসছে রাশিয়ার পালা! সোভিয়েটের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে নাতসি দানব। সোভিয়েট পালটা ঝাঁপ দেবে, না পিছু হটতে হটতে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে দানবকে তার গহ্বরে? আমেরিকা কী করবে? আর জাপান?

অনুত্তমের ভিতরে যে সৈনিক ছিল সে এক দন্ড স্থির থাকতে পারছিল না। সে চায় যুদ্ধে যোগ দিতে। যোদ্ধা হতে। অস্ত্র ধরতে। অহিংসায় তার আস্থা ছিল না। ইতিহাসে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চলছে অহিংস রণপদ্ধতির, এ বিশ্বাস তার অন্তর্হিত হয়েছিল। দুনিয়ার আর দশটা দেশের মতো হাতিয়ার হাতে যুদ্ধে নামতে হবে, মারতে হবে, মরতে হবে, এই হচ্ছে পুরুষার্থ। কিন্তু অধীনের মতো নয়। মিত্রের মতো। তা যদি না হয় তবে শত্রুর মতো।

সম্মানের সঙ্গে যা সে করতে পারে তা যুদ্ধে সহযোগিতা নয়, তা বিদ্রোহ, সশস্ত্র বিদ্রোহ। তা করতেই হবে। নইলে সে পুরুষ নয়। কেনই-বা কোনো মেয়ে তাকে মনে রাখবে! আজকের বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো বসে থাকতে তার প্রবল অনিচ্ছা। জীবনটা কি কারাগারে কারাগারেই কেটে যাবে? অসহ্য! অসহ্য! অসম্ভব! খাঁচায় বন্ধ বাঘ যেমন খাঁচাটাকে ভেঙে চুরমার করতে পারলে বাঁচে, ভীষণ আক্রোশে গাঁক গাঁক করে গজরায় আর দারুণ নৈরাশ্যে গুমরোয়, অনুত্তম তেমনি তার ইচ্ছাশক্তির ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় জেলখানার দেয়াল, খেপে গিয়ে অনর্থ বাঁধায়, কাতর হয়ে মরার মতো পড়ে থাকে। কত বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে বাইরে। সে কিনা সাক্ষীগোপাল!

জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনায় ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মিটমাটের জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে উড়ে এলেন ক্রিপস। তার আগে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের দলবলকেও। কিন্তু অনুত্তমদের নয়। সে আশা করেছিল ছাড়া পাবে। হতাশ হল। হতাশা থেকে জাগল মরীয়াভাব। ওয়াপস যান ক্রিপস। কে চায় আপস! আমরা চাই অ্যাকশন, আমরা চাই বিদ্রোহ। অনুত্তমের মনে হয়, এই হচ্ছে লগ্ন, বিদ্রোহের লগ্ন, বিপ্লবের লগ্ন। এমন লগ্ন ভ্রষ্ট হলে ভারত কোনোদিন স্বাধীন হবে না। এখনই, কিংবা কখনো নয়। বেঁচে থেকে হবে কী যদি এ জন্মে স্বাধীন ভারত দেখে যেতে না পারি!

মন পুড়ছিল। মনের আগুন লেগে দেহ পুড়ল। সিভিল সার্জন দেখে বললেন, সর্বনাশ! এ যে গ্যালপিং থাইসিস! একে হাসপাতালে সরানো উচিত। হাসপাতাল-গুলোতে তখন বর্মাফেরতের ভিড়। বেড খালি পেলে তো অনুত্তমকে সরাবে। অগত্যা খালাসের হুকুম হল। অনুত্তম যা চেয়েছিল তাই। সে তার এক ডাক্তার বন্ধুর আমন্ত্রণে শোন নদের ধারে তাঁর প্রতিবেশী হল। শোনের হাওয়ায়, বন্ধুর যত্নে, বিপ্লবের প্রেরণায় অনুত্তমের দেহের আগুন নিভল। কিন্তু মনের আগুন?

ক্রিপস ততদিনে ওয়াপস গেছেন। আপস হয়নি। গান্ধীজি কী একটা করতে চান, কিন্তু জাপানি আক্রমণের মুখে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে গেলে হিংসাপন্থীরা তার সুযোগ নেবে, তখন ইংরেজ বলবে এরা সকলে জাপানের পঞ্চম বাহিনী, বিশ্বময় বদনাম রটাবে, কুকুরকে বদনাম দিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে। এই আশঙ্কায় তাঁর সহকর্মীরা ম্রিয়মাণ। তিনি কিন্তু বেপরোয়া। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তা হলে কে জানে হয়তো বর্মায় যা ঘটেছে ভারতেও তাই ঘটবে! মালিক বদল। পোড়ামাটি। কুরুক্ষেত্র। এর চেয়ে কিছু একটা করা ভালো। তাতে এমন কী ঝুঁকি! ইচ্ছা করলে বড়োলাট তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে পারেন।

প্রথমে জহরলাল তাঁর সঙ্গে একমত হলেন সাতদিন একসঙ্গে থেকে। তারপরে আর সব নেতা। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করল। গান্ধীজি লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তার আগেই লিনলিথগো তাঁকে বন্দি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইকে। সংবাদ পেয়ে অনুত্তম মুহূর্তকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হল। তারপর বলল, 'নিষ্ক্রিয় আমরা থাকব না। জোর করে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবে এমন শক্তি কার আছে? চলো, একটা কিছু করি। নয়তো মরি।' তার ডাক্তার বন্ধু তার হাত চেপে ধরলেন, সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলল বাইরে।

কোন দিকে যাবে নিজেই জানত না। গেল যেদিকে দু-চোখ যায়। কে জানে কোনখান থেকে পেল অমানুষিক তেজ। পায়ে হেঁটে পার হল মাইলের পর মাইল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। নেই ব্যথাবোধ। দেখল হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ কাতারে কাতারে চলেছে। তারই মতো অবিকল। যেন বৃষ্টির জলের ঢল নেমেছে। ঢল দেখতে দেখতে স্রোত হল। স্রোত দেখতে দেখতে নদী হল। নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হল। সমুদ্র গর্জে উঠল, 'রেল লাইন তোড় দো। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

অনুত্তমকে কেউ সে অঞ্চলে চিনত না। কিন্তু বিপ্লবের দিন জনতা যেন রূপকথার রাজহস্তী। কী জানি কী দেখে চিনতে পারে, শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে পিঠের হাওদায় বসায়। যে-দেশে রাজা নেই সে-দেশে রাজা চিনতে পারে রাজহস্তী। যে-দেশে নেতা নেই সে-দেশে নেতা চিনতে পারে জনতা। কখন একসময় একপাল লোক এসে অনুত্তমকে কাঁধে তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, 'সজ্জনো, বঙ্গাল মুলক আজাদ বন গিয়া। বোস বাবুনে আপকো ভেজ দিয়া। ছোটা বাবুকি জে!' অনুত্তম তো বিস্ময়ে হতবাক। কাঁধ থেকে মাথায়, মাথা থেকে আশমানে তুলে ওরা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। জনতা দেখছে আর হাঁক ছাড়ছে, 'ছোটা বাবুকি জে!'

এই সব নয়। কেউ শোর করছে, 'ছোটা বাবুকা হুকুম। আগ লগাও' কেউ গোল করছে, 'ছোটা বাবুকি বাত। ডব্বা লুট লেনা।' অনুত্তম তো হতভম্ব। আবার তেমনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। যা ঘটবার তা ঘটে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখছে না। স্টেশন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দুটো একটা মানুষও যে না জ্বলছে তা নয়। নেভাতে যাও দেখি, অমনি ঠেলা খেয়ে জ্বলবে। নেতা বলে কেউ রেয়াৎ করবে না। মালগাড়ি ভেঙে বস্তা বস্তা চিনি বয়ে নিয়ে পিঁপড়ের সার চলেছে। ঠেকাতে যাও দেখি। অমনি বাড়ি খেয়ে মরবে। নেতা বলে কেউ কেয়ার করবে না।

খন্তা কোদাল শাবল গাঁইতি যার হাতে যা জুটেছে তাই দিয়ে লাইন ওপড়ানো হচ্ছে। স্লিপার পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছে। ছোটোখাটো পুল একদম সাফ। বড়ো বড়ো পুলে বড়ো বড়ো ফাঁক। তবে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে না। ড্রাইভার টের পেয়ে ইঞ্জিন থামিয়ে পিটটান দিচ্ছে। যাত্রীরা নেমে পড়ছে। জনতা তাদের খেতে দিচ্ছে মালগাড়ি থেকে সরানো আটা ময়দা ঘি দিয়ে তৈরি পুরি কচুরি। দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। কার কী জাত, কার কোন ধর্ম, কেউ জানতে চায় না, কেউ মানতে চায় না। সকলে সকলের স্বজন। দুশমন শুধু সেই যে বিবেকের প্রশ্ন তোলে, যে বাধা দেয়।

কয়েকটা দিন যেন নেশার ঘোরে কেটে গেল। সৈন্য চলাচল বন্ধ। পুলিশের পাত্তা নেই। নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম শাসন করছে। সরকারি কর্মচারী দেখলে তারা আনুগত্য আদায় করে। নয়তো বন্দি করে। অনুত্তম যেখানেই যায় সেখানেই সংবর্ধনা পায়। লোকে প্রশ্ন করে, ইংরেজ কি আছে না গেছে? আছে শুনলে জেরা করে, আছে যদি তো ফৌজ পাঠায় না কেন? পুলিশ পাঠায় না কেন? নেই শুনলে বলে, আর ভাবনা কীসের! আজাদি তো মিলে গেছে!

অনুত্তমের তখন একমাত্র ধ্যান বিপ্লবী নায়িকা। হায় কন্যা পদ্মাবতী! তুমি কোথায়? কবে তোমার দেখা পাব এখন যদি না পাই? আর তুমি কী চাও? গুলি চালনা? রক্তপাত? বারুদের গন্ধ? হাহাকার? গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা? গ্রামনেতাদের গাছে লটকানো? এসব না হলে কি তোমার আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ প্রকট হবে না? হায় কন্যা বীর্যশুল্কা! কে দেবে এই শুল্ক?

অনুত্তম যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল। ফৌজ এসে পড়ল। রেলপথ মোটরপথ না হয় নেই, কিন্তু আকাশপথ তো আছে। টেলিগ্রাফের তার না হয় নেই। কিন্তু বেতার তো আছে। ইংরেজের মিলিটারি অফিসারদের হুকুমে গ্রামকে গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল। মানুষ মরল জাঁতায় পড়ে ইদুরের মতো। লোকের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে দেখে অনুত্তমের উদ্বেগ এক-শো পাঁচ ডিগ্রি উঠল। তার মনে হল এ যাত্রা সে বাঁচবে না, যদি দেশের লোককে বাঁচাতে না পারে।

এমনি এক সন্ধিক্ষণে তার দর্শন পায়। তার পদ্মাবতীর। নীল চশমা চিনতে ভুল করে না।

কাশ্মীরি মেয়ে তারা। কানপুর থেকে এসেছে। তারার মতো জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। কিন্তু ধীরস্থির অচঞ্চল তার চাউনি। অনুত্তম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে শুনে তারা এল তাকে দেখতে। তার কপালে হাত রেখে শিয়রে বসে থাকল অনেকক্ষণ। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অত উদ্বেগ কীসের! যে খেলার যা নিয়ম। আমরা ওদের রাজত্ব ধ্বংস করতে গেছি। আর ওরা আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবে না? আমরা ওদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা তছনছ করেছি। ওরা আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টা তছনছ করবে না? তা সত্ত্বেও আমরা জিতব। ইতিহাস আমাদের পক্ষে।'

ভারতের কোথায় কী ঘটছে অনুত্তম সব কথা জানত না। তারা জানত। একে একে জানাল। সিপাহীবিদ্রোহের পরে এত বড়ো বিদ্রোহ আর হয়নি। সারা ভারতের উপর দিয়ে যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে। ইংরেজ এখনও ছিন্নমূল হয়নি তা সত্য। কিন্তু তার মাজা ভেঙে গেছে। আরেকবার এ-রকম একটা বিদ্রোহ ঘটবার আগেই সে সন্ধি করবে। এখন শুধু দেখতে হবে লোকে যাতে এলিয়ে না পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে। মহাত্মা যখন অনশন আরম্ভ করবেন তখন যেন আরেকবার ঝড় ডেকে যায়।

তারা যে কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোনখানে কাপড় ছাড়ে কিছুই ঠিক নেই। তার বেশ হরদম বদলায়। বাস হরদম বদলায়। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে অনবরত ঘোরে, মিলিটারির নজর এড়ায়, অভয় দেয় মেয়েদের, প্রেরণা দেয় পুরুষদের। আর যখনই একটু নিরিবিলি পায় মানচিত্র নিয়ে বসে। তাতে ছোটো ছোটো পতাকা আঁটা তার একটা কাজ। ফৌজ কোন কোন গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে, কোনখানে তাদের সংখ্যা কত, কোন দিন কোন দিকে তাদের গতি, গতিপথে ক-খানা গ্রাম উজাড় হল, ক-জন মানুষ সাবাড় হল, এসব তথ্য তার নখদর্পণে। তার নিজের একটা চর বিভাগ আছে। খবর পায় সে রোজ সময়মতো।

তারাকে দেখলে মনে ভরসা ফিরে আসে। মরণাপন্নও বেঁচে ওঠে। যার দিকে একটিবার সে তাকায় তার অবসাদ কেটে যায়। অনুত্তম শয্যা ছেড়ে কাজে লেগে গেল। যেকোনো দিন মিলিটারির গুলিতে তার মরণ। প্রাণ হাতে করে ঘোরাফেরা। তবু নিরুদবেগ। কত কাল পরে সে পুনরায় ধ্যান করতে পারল। ধ্যান করল পদ্মাবতীর। বীর্যবতী নারীর। যে নারীর ভয় নেই, ভাবনা নেই, উদ্বেগ নেই, যে নারী সবসময় প্রস্তুত, সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত, সব তথ্য যার আঙুলের ডগায়।

মাঝে মাঝে তাদের দু-জনের দুই পথ এক জায়গায় ছক কাটে। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা। অনুত্তমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারার চোখে দীপ্তি ফোটে। ওরা যেন একে অপরকে বলতে চায়, এই যে তুমি! ওঃ কতকাল পরে। আবার কবে।

ফেব্রুয়ারি মাস এল। মহাত্মার অনশন শুরু হল। এইবার আসছে আরেকটা সাইক্লোন। সারা ভারত জুড়ে এর তান্ডব। অনুত্তম কান পেতে শোনে, শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ। কিন্তু ওটা ওর কল্পনা। বিদ্রোহ করবার মতো সামর্থ্য এত বড়ো দেশটার কোনোখানেই একরত্তি ছিল না। একটি একটি করে দিন যায়, মহাত্মার জন্যে দুর্ভাবনা বাড়তেই থাকে, এক এক সময় মনে হয় তিনি এ যাত্রা বাঁচবেন না, অথচ ইংরেজ রাজত্ব বাঁচবে। তারার সন্ধানে ছুটে যায়, বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পায়। সেও তেমনি দিশাহারা। কই, ঝড় তো উঠল না! মহাত্মার অনশন কি ব্যর্থ গেল!

চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। পাগলামিতে পায় তাকে। মহাত্মা মারা যেতে বসেছেন। তবু কেউ কিছু করবে না। সব চুপচাপ নিঝুম। ডরে ভয়ে আড়ষ্ট। কিছু একটা করতে বললে ওরা চোরের মতো লুকোয়। গ্রামের মোড়লরা ইতিমধ্যে সরকারের অনুগত প্রজা হয়েছেন। গণপঞ্চায়েত বসে না। ডাকলে কেউ আসে না। ঘরে ঘরে গিয়ে তারা ওদের পায়ে ধরে সাধে। করো, করো একটা কিছু মহাত্মার প্রাণরক্ষার জন্যে। ওরা বলে, আমাদের সাধ্য থাকলে তো করব! কেন তিনি অনশন করছেন! না করলেই পারতেন। ইংরেজ প্রবল। সে কি কোনোদিন নড়বে!

বেচারি তারা অনুত্তমের কাছে ছুটে আসে। একটা সহানুভূতির জন্যে। আর কী বলবার আছে অনুত্তমের! অনশন তো ঝড়ের সংকেত হল না। যা মনে করেছিল তা নয়। এটার অন্য উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনি

পৃথিবীকে জানালেন যে তিনি হিংসার জন্যে দায়ী নন। হিংসা-প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থিতি। অনুত্তম স্বীকার করল, সত্যি আমরা তাঁর অহিংসার সুযোগ নিয়েছি। হিংসা থেকে এসেছে প্রতিহিংসা। তার থেকে জনগণের অক্ষমতা।

'এর চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো।' তারা বলল কর্তব্য স্থির করো। অনুত্তম বলল, 'চলো একসঙ্গে জেলে যাই।' ততদিনে ওরা বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

ইন্দ্রসভার নর্তক-নর্তকীদেরও নাচতে নাচতে তাল কেটে যায়। ইন্দ্র তাদের শাপ দিয়ে বলেন, 'যাও, মানুষ হয়ে জন্মাও।' তখন স্বর্গ হতে বিদায়।

কিন্তু কেন তাল কেটে যায়? কারণ তাদের হৃদয় আছে। ঠিক মানুষের মতো। হৃদয় যদি বশ না থাকে চরণ কী করে বশ মানবে! তখন গন্ধর্বলোক থেকে নরলোকে অবতরণ।

কান্তির জীবনেও এমন এক দিন এল যেদিন তার মনে হল তার নৃত্যের তাল কেটে যাবে। যাবে মীনাক্ষীরও। একঘর দর্শকের সুমুখে অপদস্থ হবে তারা দু-জনে। ধরা পড়বে সমঝদারদের চোখে। একালের ইন্দ্ররাজ তেমন কোনো শাপ দেবেন না, তবু শাপভ্রষ্ট হবে তারা অন্যভাবে। নাটবেদি থেকে অকালে অবসর নেবে। আর নৃত্য করবে না।

মীনাক্ষী যদি অন্যপূর্বা না হত তা হলেও কান্তি তাকে নিয়ে রাসমঞ্চ থেকে প্রস্থান করত না। কান্তির জীবনের পরিকল্পনায় নিত্য রাস। মীনাক্ষী যদি তার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে চায় তবে লক্ষ রাখতে হবে যাতে তাল কেটে না যায়। মীনাক্ষীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। সে মর্ত্যসুখী। শাপকেই সে বর মনে করে। সে অপ্সরা নয়, মানবী।

সংকটে পড়ল কান্তি। জনান্তিকে বলল, 'মীনু, যারা নাচবে তারা ভালোবাসবে না। এই তার অলিখিত শর্ত।'

মীনাক্ষী লজ্জিত হল। বলল, 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?'

'কী জানি! আমার তো আশঙ্কা হয় একদিন তাল কেটে যাবে। তখন নৃত্য থেকে অপসরণ। কী নিয়ে আমি থাকব তার পরে! বিয়ে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তা ছাড়া বিয়ে করতে চাইলেও দুস্তর বাধা।'

'কিন্তু তাল কেটে যাবেই-বা কেন? যদি-বা যায় তবে নৃত্য থেকে অপসরণ কেন? আর যেসব কথা বললে তার প্রশ্নই ওঠে না। ভালোবাসলেই বিয়ে করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আমি তো ভাবতেই পারিনে।'

কান্তির এত চিন্তা, কিন্তু মীনাক্ষীর একটুও নেই। তার জীবনে যেন বসন্ত এসেছে। দেখতে দেখতে তার তনুমন পল্লবিত মুকুলিত পুষ্পিত প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তাল কেটে যাবে বলে তার পরোয়া নেই। ধরা পড়ার ভয়ে হৃৎকম্প নেই। নাটবেদি থেকে অবসর নিলে তার পরে কী নিয়ে থাকবে এ বিষয়ে হুঁশ নেই। তার জীবনের কোনো পরিকল্পনাই নেই। ফুল ফুটলে ঝরে পড়ে। সেও ঝরে পড়বে যখন বসন্ত ফুরোবে। যখন ভালোবাসা মিটবে।

ওদিকে কান্তির ভিতরে অবিরাম বোঝাপড়া চলছিল। দিনের পর দিন যারা রাধাকৃষ্ণ সেজে নাচবে তাদের দু-জনের সম্বন্ধটা আসলে কীরকম হবে? শুধু মঞ্চের সম্বন্ধ! হৃদয়ের নয়? আত্মার নয়? তারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নিখুঁত আঙ্গিকে অভ্রান্ত পদক্ষেপে নাচবে, কিন্তু নাটবেদির বাইরে বাঁচবে না, ভালোবাসবে না? সেখানে তারা পর? তারা পরকীয়?

নিতান্ত অপরিচিতাকেও যে মাসি পিসি দিদি বলে ডাকে, নেহাত নিঃসম্পর্কীয়ার সঙ্গে যে নানা বিচিত্র সম্পর্ক পাতায়, সেই কান্তি যদি বলে যে মীনাক্ষী তার কেউ নয়, ওর সঙ্গে সে কোনোরকম সম্পর্ক পাতায়নি, তা হলে বন্ধুরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করবে। কেন? এই একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক পাতায়নি কেন? বন্ধুরা শুধোবে।

বন্ধুরা হয়তো বলবে, ভাই-বোন সম্পর্ক কী দোষ করল? ভাই-বোন! কান্তি হেসে উড়িয়ে দেবে। না। ভাই-বোন সম্পর্ক নয়। রাসনৃত্য ভাই-বোনের নয়।

তা হলে স্বামী-স্ত্রী? সর্বনাশ! মীনাক্ষীর যে জলজ্যান্ত স্বামী রয়েছে! না থাকলেও কান্তি ছাদনাতলায় যেত না। না। রাসলীলা স্বামী-স্ত্রীর নয়।

তা হলে সখা-সখী? কান্তি চিন্তা করবে। না। রাসরঙ্গ সখা-সখীর নয়। তাদের জন্যে হোলি। পার্থক্য আছে।

তা হলে আর কী বাকি থাকে?

ভাবতে ভাবতে কান্তাভাব মনে জাগে। কান্ত আর কান্তা।

কান্তি শিউরে উঠে। মানুষের মন মানুষ নিজেই জানে না। জানতে পেলে চমকায়। কান্তি বার বার মাথা নাড়ে। না, না, কান্তাভাব নয়। আমি যে শ্যামলকে কথা দিয়েছি। আমি কি তাকে ধোঁকা দিতে পারি।

সবচেয়ে ভালো কোনোরূপ সম্পর্ক না পাতানো। ইন্দ্রসভার নর্তক-নর্তকীর মতো। ওদের হৃদয়ের বালাই ছিল না। তাই ওদের তালভঙ্গ হত না। কিন্তু মাঝে মাঝে হত বই কী। তার থেকে বোঝা যায় ওরাও একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ছিল না। হৃদয়হীন ছিল না।

কান্তি ভেবে দেখল নৃত্য করে কে? অঙ্গ না হৃদয়? হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার জন্যে বা হৃদয়ের ভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে কেউ লেখে কবিতা, কেউ আঁকে ছবি, কেউ গায় গান। ঘটলই বা ছন্দপতন। সেটাকে এত ভয় কেন? মোটের উপর একটা কিছু সৃষ্টি হয়ে উঠছে। বিশ্বসৃষ্টির মতো।

তা হলে মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচলে ক্ষতি কী? ক্ষতি এই যে অন্যের অলক্ষ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হয়তো নিজের অলক্ষ্যে। কান্ত আর কান্তা। শ্যামল ক্ষমা করবে না। শ্যামল যদি ভদ্রতা করে সরে যায় তা হলে মীনাক্ষীকে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা জন্মাবে, নইলে মীনাক্ষী ক্ষমা করবে না। একজনের সঙ্গে নাচতে গেলে যদি অবশেষে তাকে বিয়ে করতে হয় তা হলে তার সঙ্গে নাচতে চাইবে কোন মূঢ়! এ কী সংকট, বলো দেখি!

কান্তি স্থির করল মীনাক্ষীর সঙ্গে আর নাচবে না। একই কারণে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচবে না। নৃত্য বলতে এখন থেকে একক নৃত্য। কিন্তু সে নিজে চাইলে কী হবে, লোকে চায় না তার একার নাচ। তারা চায় রাধাকৃষ্ণের যুগল নৃত্য। হরপার্বতীর যুগ্ম নৃত্য। নর-নারী উভয়ের সংযুক্ত পদক্ষেপ, সুসমঞ্জস পদক্ষেপ।

না, একক নৃত্য জমবে না। কান্তি ভেবে পায় না আর কী সমাধান আছে। আর কী সম্ভবপর! এরূপ স্থলে আগে যা করেছে এবারেও তাই করল। পলায়ন। দৌড়। এক দিন কাউকে কিছু না বলে একরকম একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। যেদিকে দু-চোখ যায়।

স্টুডিয়ো আর স্টেজ নিয়ে তন্ময় ছিল। জীবনের দিকে ফিরে তাকাবার ফাঁক পায়নি। যাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে তারা দর্শক। তারা যেন মানুষের একজোড়া চোখ, গোটা মানুষটা নয়। জীবনের বহমান স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে কান্তি সমগ্রতার স্বাদ পায়।

রসের সায়র। প্রতিদিন তাতে ডুব দিয়ে ওঠে আর নতুন হয়ে যায়। যাই দেখে তাই নতুন লাগে। যাকে দেখে সেই তার চোখে নতুন। পরম বিস্ময় নিয়ে কান্তি এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। হাতের কাছে যে কাজ জোটে সে কাজ করে। বাড়ি তৈরি হচ্ছে, রাজমিস্ত্রির সাগরেদ চাই। আচ্ছা, রাজি। কাঠ চেরাই হচ্ছে, করাতির সাথি আসেনি, মদত চাই। আচ্ছা, রাজি। জাহাজ মেরামত হচ্ছে, রং করছে একদল লোক, কান্তি তাদের ওখানে হাজির।

পথে-বিপথে রকমারি মেয়ের সঙ্গে দেখা। কেউ বা কোকেন চালান দেয়, কেউ চোরাই মাল পাচার করে। কেউ পান বেচে, কেউ জাহাজিদের সঙ্গে নিকা বসে। কেউ পরের ছেলে দেখিয়ে ভিখ মাগে। কেউ রং মেখে সং সেজে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের কার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতাবে কান্তি! মানুষের অভিধানে ক-টাই বা শব্দ আছে! মানুষ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিয়ের জন্যে কেউ ঝোলাঝুলি করে না। বিয়ের কথা কেউ মুখে আনে না। বিয়ে একটা সমস্যাই নয়। সমস্যা হচ্ছে আত্মিক সম্বন্ধ। আত্মিক সম্বন্ধ স্থির না হলে কায়িক সম্বন্ধ শুরু হতে পারে না। কিন্তু তার আগেই কান্তি উধাও হয়। কাউকেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না। কী জানি কী আছে তার ভিতরে নারীকে যা চুম্বকের মতো টানে। কিন্তু ফি বারেই সে আপনাকে ছাড়িয়ে নেয়। সঞ্চারিণীর বন্ধনী এড়ায়।

পূর্বেই তার প্রত্যয় জন্মেছিল একজনের হওয়া মানে আর সবাইকে হারানো। একদিন একজনের হলে আর সব দিন আর সব জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ক্রমে তার প্রত্যয় হল মুক্ত থাকতে হলে শুদ্ধ থাকতে হয়। কে কতটা মুক্ত সেটা নির্ভর করে কে কতটা শুদ্ধ তার উপর। তা বলে জীবনের ধূলিকাদা থেকে সন্তর্পণে সরে থাকার নাম শুদ্ধি নয়।

এতকাল যত্ন করে সে নৃত্য শিখেছিল। কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। রসের দীক্ষা তার হয়নি। এই বার ঘুরতে ঘুরতে তার রসের দীক্ষা হল। যার কাছে হল সে এক রঙ্গিণী নারী। ছইলা গোপিনী।

ছইলা তাকে শেখাল কেমন করে গাই দুইতে হয়, কেমন করে চিড়ে কোটে, মুড়ি ভাজে, কেমন করে ঘুঁটে দেয়, ঘর নিকোয়। সারাদিন একটা না একটা কাজে হাত জোড়া থাকে ছইলার। তার সঙ্গে বসে গল্প করতে হলে তার হাতের কাজে হাত লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম কান্তির লজ্জা করত। এসব যে মেয়েলি কাজ। কে কী মনে করবে! বলবে, বা রে পুরুষ! কিন্তু ধীরে ধীরে তার গায়ের চামড়া মোটা হল। কে কী বলে তার গায়ে বাজে না। সে মুচকি হাসে। আর কাজে মন দেয়। ছইলার কাজ হালকা করাই তার কাজ।

কয়েক মাস কাটলে পরে ছইলা বলল, ‘ঠাকুরপো, তুমি যে এত কিছু করলে, বলো দেখি আমার কাছ থেকে কী পেলে।’

কান্তি বলল, ‘সেকালের শিষ্যরা ঋষিদের গোরু বাছুর চরিয়ে যা পেত তাই। ব্রহ্মবিদ্যা। ঠিক ব্রহ্মবিদ্যা নয়, তার কাছাকাছি। আত্মবিদ্যা।’

জ্যোৎস্নারাত্রে পাশাপাশি বসেছিল তারা, নদীর জলে পা ডুবিয়ে। কে দেখল, না দেখল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

‘বউদি’, কান্তি বলল ইতস্তত করে, ‘তোমার সঙ্গে থেকে আমি কী শিখেছি, বলব?’

‘বলো।’

‘শিখেছি, আমি পুরুষ নই।’

‘ওমা, তবে তুমি কী?’

‘আমি না-পুরুষ।’

ছইলা হেসে আকুল। বলল, ‘আর আমি?’

‘তুমি? তুমি নারী নও।’

‘নারী নই? ঠিক জান?’

‘তুমি না-নারী।’

ছইলা হাসতে হাসতে দম আটকে মারা যাবে মনে হল। হাসির চোটে জল এল চোখে। মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘প্রথম ভাগ শেষ করেছ। এখন আর কিছু দিন থেকে যাও।’

এরপরের কয়েক মাস ওরা দুধ দই বেচতে হাটে-বাজারে পসরা মাথায় বাঁক কাঁধে ঘুরে বেড়াল। লজ্জায় কান্তির মাথা কাটা যায়। লোকের চোখে চোখে টরেটক্কা। ছইলার কী! সে তো সংসারের বাইর। তা ছাড়া সে মধ্যবয়সিনী। খেলবার বয়স নয়। খেলাবার বয়স।

‘আর কিছু পেলে, ঠাকুরপো!’ ছইলা শুধোয় তারায় ভরা আকাশের তলে।

‘পেয়েছি, বউদি।’ কান্তি বলে আত্মস্থ হয়ে। ‘আমি পুরুষ নই, কিন্তু আমার পুরুষভাব।’

‘আর আমি?’

‘তুমি নারী নও, কিন্তু তোমার নারীভাব।’

এবার ছইলা হাসল না। তার চোখে জল এল কি না আঁধারে দেখা গেল না। স্নিগ্ধস্বরে বলল, ‘আর কিছু দিন থেকে গেলে হয় না?’

‘কেন?’ এবার রহস্য করল কান্তি। ‘তৃতীয় ভাগ পড়তে হবে?’

ছইলা উত্তর দিল না। কান্তি যাবার জন্যে ছটফট করছিল। সে নাচিয়ে মানুষ। কত কাল নাচ ছেড়ে থাকতে পারে! তবু তাকে থাকতেই হল। কালিদাসকেও থাকতে হয়েছিল বিদ্যানগরের গয়লানির ঘরে রসের পাঠ

নিতে। কান্তির বিদ্যানগর উৎকলে।

ছইলার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে গেল কুটুমবাড়ি, নৌকায় করে গেল মেলায়। পরের ঘরে হল ঘরের লোক। গাছতলার আস্তানায় আপনজন। মানুষের বুকে কত যে মধু, তার স্বাদ নিল। দু-দিনের চেনা। মনে হয় জন্মজন্মান্তরের। পাঁজির হিসাবে দু-টিমাত্র দিন। হৃদয়ের হিসাবে চিরদিন। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না, বিদায় নিতে গেলে কেঁদে ভাসায়।

মধু, মধু, মধু। মানুষ মধু, পৃথিবী মধু, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

মাস কয়েক পরে ছইলা বলল, 'আর কিছু পেলে কি?'

কান্তি বলল, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ?'

'রস'।

ছইলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নীরবে শুনে যেতে থাকল, কান্তি বলে যেতে লাগল, 'বন্ধনের ভয়ে কখনো কারো সঙ্গে রসের সম্পর্ক পাতাইনি। রসের সম্পর্ক আপনা থেকে পাতা হচ্ছে দেখে দৌড় দিয়েছি। এখন আমার ভয় ভেঙে গেছে।'

'কী করে ভাঙল?'

'তোমার সঙ্গে থেকে। তুমি নারী নও। অথচ তোমার সত্তা নারীসত্তা। আমিও পুরুষ নই। অথচ আমার সত্তা পুরুষসত্তা। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ তোমার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক।'

কান্তির প্রয়োজন শেষ হয়েছিল, সে তার সমস্যার সমাধান পেয়েছিল। এবার সে ফিরে যাবে, ফিরে গিয়ে নাচের দল গড়বে, নাচবে, নাচাবে, ভয় পাবে না, ভয়ের কারণ হবে না। মীনাক্ষী যদি তার নৃত্যসহচরী হয় তবে ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে বিশুদ্ধ রসের। সে সম্পর্ক হৃদয়কে বাদ দিয়ে নয়, হৃদয়ই তো রসের মধুচক্র। কিন্তু নারীকে বাদ দিয়ে। পুরুষকে বাদ দিয়ে। অথচ নারীসত্তাকে রেখে, পুরুষসত্তাকে রেখে।

ছইলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কান্তি কলকাতা গেল। যা ভেবেছিল তাই। দলের অস্তিত্ব নেই। নতুন করে গড়তে হবে। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, আবার খুঁজে পেতে ধরে আনতে হবে। মীনাক্ষীর খোঁজ নিয়ে জানতে পেল সে ঘর-সংসার করছে, সুখে আছে। আর নাচবে না। তার স্বামীরও আর উৎসাহ নেই। সে পলিটিক্সে নেমেছে।

ইতিমধ্যে দিন বদলে গেছে। নয়া জমানার দর্শকরা কলকারখানার ছোঁয়াচ চায়, কিষান মজদুর কী করে না করে ওরা তা খেতেখামারে দেখবে না, নাটবেদীতে দেখবে। কান্তিও তো কিছুদিন রাজমিস্ত্রি, করাতি, রং মিস্ত্রি হয়েছে, গোরুর খুরে নাল বসিয়েছে, বাঁক কাঁধে করে হাটে গেছে। এসব অভিজ্ঞতা নৃত্যে রূপান্তরিত করা নিয়ে তার মনে ভাবনা জেগেছিল। কল্পনা তার উপর রং ফলাতে শুরু করেছিল। নতুন ধরনের নাচ দিয়ে সে দেশের লোকের মনোহরণ তা করবেই, দুঃখীদের দুঃখমোচনও করবে। তামাশা নয়। গান দিয়ে সেকালের গুণীরা আকাশ থেকে বর্ষা নামাতেন। অনাবৃষ্টির দিন গাইয়েরাই ছিলেন মানুষের শেষ আশা। একালের নাচিয়েরাই বোধ হয় মানুষের শেষ ভরসা।

কান্তির দল বরফের গোলার মতো দিন দিন বেড়ে চলল। করাত নৃত্য, বাঁক নৃত্য ইত্যাদি আনকোরা নাচ দর্শকদেরও টেনে আনল। একজন ক্যাপিটালিস্ট মুগ্ধ হয়ে ধনসম্পদ উৎসর্গ করলেন। তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনিই হলেন। অনুতাপে বিনম্র হয়ে ধনিক পরিবারের কন্যারাও মজুরনি কিষানি সাজতে এগিয়ে এলেন। নয়া জমানা। সেকালের যাত্রায় হাড়িডোমের উচ্চাভিলাষ ছিল রাজা মন্ত্রী সাজতে। একালের ফিলমে উঁচু ঘরানাদের সাধ অচ্ছুৎ-কন্যা সাজতে।

ভারতের পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে কান্তির দল অশ্বমেধ ঘোড়ার মতো ইউরোপের দিকে পা বাড়াল। তাদের জাহাজ যেদিন মুম্বাই ছাড়বে সেদিন হঠাৎ চার বন্ধুর পুনর্মিলন। অনুত্তম, কান্তি, তন্ময়, সুজন। রূপকথার চার কুমার।

সাফল্যের নেশায় কান্তির মাথা ঘুরে গেছিল। তা হলেও কোনোদিন সে ভুলে যায়নি যে সে কান্তিমতী রাজকন্যার অন্বেষণে বেরিয়েছে, যে রাজকন্যা তার হাতের কাছে, অথচ নাগালের বাইরে। অন্তরে অন্তরে তার ব্যথা জমছিল। বাইরে যদিও অন্তহীন ফুর্তি।

কেন ব্যথা? কারণ তার নৃত্যসহচরী হবার জন্যে আজকাল দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা। তাই সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সে সকলের সঙ্গে নাচে। গোপী সকলেই। রাধা কেউ নয়। রসের সম্পর্ক পাতিয়ে এক সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু আরেক সমস্যা নতুন করে দেখা দিল। সে তো কৃষ্ণের মতো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয় যে একই সময়ে দশটি গোপীর সঙ্গে রাসনৃত্য করতে পারবে। দশটির মধ্যে একটির সঙ্গেই সে তা পারে। কিন্তু তা হলে একজনকে প্রাধান্য দিতে হয়। মীনাক্ষীর স্থান দিতে হয়।

সাফল্যের দিনে অত বড়ো একটা ঝুঁকি নিতে তার সাহসে কুলোয় না। আছে একটি মেয়ে তার নজরে। খুবই অল্পবয়সী। কুমারী। কিন্তু রত্নাকে সে যদি রাধার সম্মান দেয় গোপীরা তাকে ক্ষমা করবে না। দলে ভাঙন ধরবে। তা না হয় হল। কিন্তু রত্না নিজেই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে সম্পর্কটাকে অক্ষয় করবার জন্যে। নাটবেদিতে তো বটেই, বিবাহবেদিতেও। শেষকালে ওই রত্নাকেই কেন্দ্র করে ঘুরবে তার জীবন, তার জীবিকা, তার শিল্প, তার দল। ওই রত্নাই হবে তার দলের একমাত্র সম্বল। মুথুলক্ষ্মী, খুরশিদ, ফিরোজা, ইন্দিরা, হানসা—এরা কি থাকবে!

বিয়ে যখন করবেই না তখন রত্নাকে রাধার ভূমিকা না দেওয়াই ভালো। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়াতেই হবে। নীড় রচনার স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যাক। রত্না শিখুক আকাশে উড়তে, আকাশেই বিশ্রাম করতে। তা যদি না পারে তবে অন্য কাউকে বিয়ে করুক। কান্তিকে নয়।

কিন্তু একথা ভাবতেও যে তার কষ্ট হচ্ছিল না তা নয়। রত্না এক দিন বড়ো হবে, তার বাপ মা তার বিয়ে দেবেন, তার মতো সুন্দর মেয়ের জন্যে পাত্রের অভাব হবে না। দূর হোক অপ্রীতিকর ভাবনা। আপাতত ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা যাক। দিগবিজয়ীর মতো।

মুম্বই-এর কয়েকটা ঘণ্টা বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে গল্প করে ফোটো তুলিয়ে কেটে গেল। ভাব বিনিময়ের জন্যে সময় ছিল না। উপাখ্যান বলার জন্যে তো নয়ই। জাহাজ ধরতে হবে। এক-শো রকমের খুঁটিনাটি। মনটা ভারী হয়ে রয়েছে সুমতির জন্যে। সেও চেয়েছিল সহযাত্রিণী হতে। তার তুলোর ব্যাপারী স্বামী বাদ সাধলেন। তবে মনটা খুশ আছে আরেকটা খোশ খবরে। প্যারিসের বিখ্যাত নর্তকী ইভেৎ তার দলে যোগ দিতে উৎসুক।

জাহাজ ছাড়বে, জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় সুজন বলল, ‘প্যারিসে হয়তো সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তাকে লিখব তোর কথা।’

কান্তি বলল, ‘বেশ, বেশ। যদিও জানিনে কে তিনি। আহা! শোনা হল না তোর কাহিনি! তন্ময়েরটা মোটামুটি শুনেছি। আর অনুত্তম, তোরটাও শোনা হল না। সুজন তবু হেডলাইনটা শুনিয়ে রেখেছে। সোনিয়ার নাম করে। তুই কিন্তু একটুখানি আভাস পর্যন্ত দিসনি।’

ওইখান দিয়ে চলাফেরা করছিল রত্না। কান্তি তার গলা জড়িয়ে ধরল এক হাতে। অমনি মনে হল দলের লোক ঠাওরাবে সে অপক্ষপাত নয়। তখন আরেক হাত বাড়িয়ে দিল ফিরোজার কাঁধে। নিজের অপক্ষপাতিতায় নিজেই তৃপ্ত হয়ে সে তার বন্ধুদের বলল, ‘পুনর্দর্শনায় চ।’

১৯৪৯ সালের বড়োদিন। তন্ময় এসেছে সপরিবারে কলকাতায়। উঠেছে পৈত্রিক বাসভবনে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। কান্তি এসেছে সদলবলে। অতিথি হয়েছে এক মহারাজার প্রাসাদে। মধ্যপ্রদেশের মহারাজা। অনুত্তম এসেছে নোয়াখালি থেকে, সহকর্মী সংগ্রহ করতে। সুজন তাকে ধরে নিয়ে গেছে অশ্বিনী দত্ত রোডে, নিজের বাড়িতে। বাড়িখানা ছোটো দোতলা। কিন্তু তার চার দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দাঙ্গা বাধলে আর যেখানেই বাধুক এ পাড়ায় না। নেহাত যদি বাধেই দেয়ালের হেঁয়ালি সমাধান করতে পারবে না।

'আগে নিরাপত্তা। তার পরে অন্য কথা। যে টাকায় তেতলা হত সে টাকায় মাজিনো ওয়াল হয়েছে বলে সীতার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া। বলে, এটা অবন ঠাকুরের অশোকবনের আইডিয়া।' সুজন বলছিল অনুত্তমকে।

'নোয়াখালিতে' বলছিল অনুত্তম, 'যে গাঁয়ে সবচেয়ে বিপদ সেই গাঁয়েই আমার কুঁড়ে ঘর। গুণ্ডারা আমাকে ঘিরে রয়েছে, তাই আমি সবচেয়ে নিরাপদ।'

সুজনের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। 'অ্যাঁ! বলিস কী! তা হলে তো, ভাই, তোকে ফিরে যেতে দেওয়া চলে না। বিয়ে হয়নি বলে কি তোর প্রাণের মূল্য নেই? তোর স্ত্রী থাকলে কি তোকে আদৌ যেতে দিতেন?'

'স্ত্রী থাকলে কী করতেন জানিনে, কিন্তু যার অন্বেষণে বাহির হয়েছি তিনি যে আমাকে বিপদের দিকেই টানছেন। যেন সেইখানেই মিলনের সংকেতস্থল।'

সেদিন ওরা দুই বন্ধু অপর দুই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছিল। আগে পৌঁছোল তন্ময়। তিনজনে কোলাকুলি করে নীরব রইল কিছুক্ষণ। তারপরে সুজন বলল, 'সীতা বাড়ি নেই। আফশোস জানিয়েছে। ওর বোনের সন্তান হবে বলে রাত জাগতে হবে।'

'আমার কিন্তু রাত করে ফিরতে মানা। রেবা একটুও রাত জাগতে পারে না।' মুরগিতে ঠোকরানো স্ত্রৈণ স্বামীর মতো সভয়ে বলল তন্ময়। তার মাথার চুল চোদ্দো আনা সাদা। কিন্তু শরীর আগের চেয়ে চিকণ। একটি বড়ো মাপের খোকা পুতুলের মতো চেহারা। গৃহিণীর হাতযশ সর্বাঙ্গে। স্বচ্ছন্দে আশি বছর বাঁচবে।

ওদিকে সুজনের মাথাজোড়া টাক। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু ঘরনির হেফাজতে তন্ময়ের যেমন চেকনাই হয়েছে সুজনের তেমন হয়নি। ওকে যেন তুলোয় মুড়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সাবধানে থাকলে সুজনও আশি বছর বেঁচে থাকতে পারে। দাঙ্গাবাজদের রুখতে যেমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলেছে অদৃশ্য ব্যাধিবীজদের রুখতে তেমনি তুমুল আয়োজন করেছে। তিন চার আলমারি ওষুধে বোঝাই।

অনুত্তম চুল ছেঁটেছে কদম ফুলের মতো। ছোটো ছোটো খোঁচা খোঁচা চুল। দাড়ি কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়। চাঁচলে বাপ মানে না বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বোধ হয় নোয়াখালির মোল্লাই ফ্যাশন। চোখে সেই বিখ্যাত নীল চশমা। শরীরটা মাংসবহুল নয়, পেশিবহুল। শিরাগুলো ঠেলে বেরোচ্ছে। শক্ত গাঁথুনি। যৌগিক ব্যায়াম করে। গায়ে কোর্তার বদলে চাদর জড়ানো, ধুতিও সংক্ষেপিত। হ্যাঁ, খদ্দরের। দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা প্রতি অঙ্গে। পরিচ্ছদে।

মহারাজার মোটরে করে এল কান্তি। ও গাড়ি কখনো এত ছোটো বাড়ির সামনে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এটা রাজপুরী না হোক দুর্গ তো বটে। ছোটোখাটো ফোর্ট উইলিয়াম। লাফ দিয়ে ফুর্তি করে ছাদে উঠল কান্তি। বলল, 'শীত কোথায় কলকাতায়! এইখানে বসা যাক কফির পেয়ালা নিয়ে। আর, সুজন, তুই আয়। অনুত্তম, তন্ময়, তোরাও বদ্ধ ঘরে বসে থাকিস নে, বুড়ো হয়ে যাবি।'

চির তরুণ। নানা রঙের রেশমি পোশাক। বাবরি চুল। ফুলের মালা। যেমনটি ছিল পঁচিশ বছর আগে তেমনটি আছে পোয়া শতাব্দী পরে। তবে মুখভাবে একপ্রকার কঠোরতা এসেছে। চরিত্রের কঠোরতা। তার তপোভঙ্গ করা মেনকার অসাধ্য।

‘পড়েছি এক মহারাজার পাল্লায়।’ রগড় করে রসিয়ে রসিয়ে বলল কান্তি। ‘খরচ বেঁচেছে। কিন্তু জান বাঁচে কি না সন্দেহ।’

‘তার মানে? কৌতূহলী হল তন্ময়।

‘দু-বেলা শুনতে হচ্ছে নতুন এক স্লোগান। এক স্বামী এক স্ত্রী। দেশটা দিন দিন হল কী! রাজাগুলোও ধুয়ো ধরেছে এক স্বামী এক স্ত্রী। সরদার বল্লভভাই এমন হাল করেছেন যে একটির বেশি পুষতে পারে না। পন্ডিত জহরলালই বা কম কীসে! ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট একটি রানিকেই দেবেন, আর সব রানিদের সাধারণ পাসপোর্ট। বিপ্লব হবে না? প্যালেস রেভলিউশন শুরু হয়ে গেছে। মহারাজা এর মধ্যেই তাঁর রক্ষিতাদের বিদায় করে দিয়েছেন। রানিদের একটিকে রেখে বাকি তিনটিকে স্বাধীন জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। একটিকে হয়তো আমার দলে যোগ দিতে বলবেন। সেইরকম তো শুনছি।’

‘দেখিস, ভাই। পদচালনা করতে গিয়ে পদস্খলন না হয়।’ অনুত্তম বলল গম্ভীর স্বরে। ‘মহারানি শুনে মহাভয় লাগছে।’

‘হা হা!’ কান্তি অনুত্তমের পিঠে চাপড়ে দিয়ে বলল, ‘তেমনি কাঠখোট্টা আছিস। রসকষ একফোঁটাও নেই। ওরে, আমার কাছে ময়রানিও যা মহারানিও তাই। মাজুরকা নেচে এলুম পোল্যাণ্ডের চাষানিদের সঙ্গে, পোলকা নেচে এলুম চেকোস্লোভাকিয়ার মজুরনিদের সঙ্গে। আমেরিকার ক্রোড়পতিদের দুহিতাদের সঙ্গে নেচে এলুম ফক্সট্রট আর ট্যাঙ্গো। ইংল্যাণ্ডের কাউন্টেস ও ব্যারনেসদের সঙ্গে নেচে এলুম সার রজার ডি কভারলি। কোনোখানেই পা ফসকায়নি। শেষে কিনা চৌকাঠের উপর আছাড় খেয়ে পড়ব!’

‘তবু’, মন্তব্য করল সুজন, ‘সাবধানের মার নেই।’

‘তা হলে’, কান্তি সুর নামিয়ে বলল, ‘খুলে বলি। কারো সঙ্গে আমি রসের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোনো সম্পর্ক পাতাইনে। কিন্তু রস বলতে আমি রতিরঙ্গ বুঝিনে। বুঝি লীলাকমলের নির্যাস। এর ফলে বার বার ফলস পজিশনে পড়তে হয়েছে। তেমন অবস্থায় পড়লে আমার নিয়ম হচ্ছে, দে দৌড়। দৌড়োতে দৌড়োতে আমি এত দূর এসেছি। আমার জীবনটাই একটা ম্যারাথন রেস।’

হো-হো করে হেসে উঠল তন্ময়। টিপে টিপে হাসল সুজন। অনুত্তম গম্ভীরভাবে বলল, ‘ম্যারাথন রেসে পতনও ঘটে।’

কান্তি বলল সকৌতুকে, ‘তা বলে চেহারাটাকে সজারুর মতো করে অর্ধেক সমাজের কাছে ঘোষণা করব না, ছুঁয়ো না আমাকে।’

হাসতে হাসতে তন্ময় গড়িয়ে পড়ল সুজনের গায়ে, সুজন মুখ ফেরাল।

তারপর কান্তি তাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখল নিজের জীবনের কাহিনি বলে। ঘড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হল কেউ যাতে টের না পায় রাত কত হয়েছে। ওদিকে রেবা হয়তো ছটফট করছে। তা একটু করলই-বা। এদিকে সুজনও তো ছটফট করছে সীতার জন্যে।

কান্তির কাহিনির অনেকখানি আমাদের জানা। সে অংশের পুনরাবৃত্তি করব না। যেটুকু অজানা সেটুকু এই।

কান্তিরা যখন ইউরোপে যায় তখন মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। তার কালো ছায়া সকলের জীবনে। তা বলে নাচবে না, নাচ দেখবে না, তেমন বেরসিক ইউরোপের লোক নয়। কান্তিরা পরম সমাদর লাভ করে। কিন্তু হিটলারের চালচলন দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন, আসল শিবতান্ডব শুরু হলে নকল শিবতান্ডব দেখবে কে! মাঝখান থেকে আটকা পড়বে তোমরা। সময় থাকতে আমেরিকায় সরে পড়ো। আটলান্টিক পেরিয়ে দেখে সেখানেও থমথমে ভাব। তবে অঢেল টাকা। কান্তিরা ঝম ঝম করে নাচে আর ঝন ঝন করে টাকা ঝরে। টাকার গাছে নাড়া দিয়ে ফল কুড়োতে ব্যস্ত। খেয়াল নেই যে জাপানিরা পার্ল হারবারে হানা দিয়েছে। যখন টনক নড়ে তখন দেখে দেরি হয়ে গেছে! দেশে ফেরবার জলপথ আকাশপথ বন্ধ। স্থলপথের তো কথাই ওঠে না।

সঞ্চয় ভেঙে ক-দিন চালাতে পারে! যে যেখানে পারে চাকরি নেয়। যেকোনো চাকরি। রত্না গেল মেয়েদের অক্সিলারি কোর-এ। কান্তি গেল অ্যাম্বুল্যান্সে। মুথুলক্ষ্মী ফিরোজা বাবনজি মিশিরজি এঁরা ছড়িয়ে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। বিচিত্র কার্যে। যুদ্ধশেষে একে একে ফিরে এল অনেকে। যারা ফিরল না তাদের মধ্যে রত্না। সে বিয়ে করে সেখানকার এক সিন্ধিকে। আবার দল গড়তে হল। গড়তে হল নতুন লোক নিয়ে। পুরোনোরা ধনের স্বাদ পেয়েছে, মোটা তনখা না পেলে আসবে না। এসে করবেই-বা কী! নাচতে তো ভুলে গেছে। নতুন যারা এল তাদের তালিম দিতে দিতে বছরের পর বছর গেল গড়িয়ে। এই সম্প্রতি কান্তি সদলবলে আসরে নেমেছে। কিন্তু অনভ্যাসের দরুন অনায়াস নয় পদক্ষেপ। মনের মতো সাথি নেই বলে লীলায়িত নয় ভঙ্গি। রত্না তার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট ছোটো ছিল। এরা তো তার মেয়ের বয়সি। এদের সঙ্গে নাচা যেন খোকাখুকুর নাচন। পশ্চিম থেকে কৌশল শিখে এসেছে প্রচুর। জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রভূত। কিন্তু রূপ দিতে গিয়ে দেখছে এক হাতে হয় না। মহারানি কি সত্যি যোগ দেবেন?

এরপর তন্ময়ের কাহিনি। তার প্রায় সবটাই আমরা জানি। বাকিটুকু এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। তন্ময়কে রাজ একবার টেলিফোন করে তার ক্লাবে। কী একটা খবর ছিল, সাক্ষাতে জানাবে। তন্ময় তার সঙ্গে দেখা করেনি, তাকে দেখা করতেও দেয়নি। কিছুদিন বাদে শুনতে পায় রাজ আবার বিয়ে করেছে। বিয়ে করে চলে গেছে তিব্বতে। যার সঙ্গে গেছে সে একজন ফরাসি বৌদ্ধ লামা। রক্তাম্বর সম্প্রদায়ের লামাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তিব্বতে বহুকাল কাটিয়ে ওরা এখন হিমালয়ের কোন এক উপত্যকায় অজ্ঞাতবাস করছে। এদিকে ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠেছে তন্ময়। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। স্ত্রীর জন্যে বাড়ি কিনছে লণ্ডনের উপকণ্ঠে।

তন্ময়ের পরে অনুত্তম। তার কাহিনির অধিকাংশ আমরা জানি। অবশিষ্ট লিখছি। অনুত্তম ও তারা একই দিনে ছাড়া পায়। কংগ্রেস আবার প্রাদেশিক সরকারের ভার নিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে দরদস্তুর চলছে। তারা বলে, সংগ্রাম করতে আর ভালো লাগছে না। দরকারও দেখছিনে। এসো, চুপচাপ একসঙ্গে থাকি। মানুষের কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই? দেশের ভার আর যেই নিক, অনু, ঘরের ভার তুমি আমি নিই। অনুত্তম বুঝতে পারে তারার মনে কী আছে। বিয়ে। ঘরসংসার। ছেলে-মেয়ে। বয়সও তো হল কম নয়। লবণ সত্যাগ্রহের সময় থেকে দেশের কাজে নেমেছে। বড়ো ঘরের মেয়ে। বাপ মা-র কথা শোনেনি। বিয়ে করেনি। অনুত্তমেরও কি সাধ যায় না সুখী হতে, শান্তি পেতে! তারার মতো সঙ্গিনী পাবে কোথায়! তার পরম সৌভাগ্য, তারা তাকে মনোনয়ন করেছে। সে স্বয়ংবর সভার বীর।

কিন্তু অনুত্তমের যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। দেশ স্বাধীনতা না পেলে সেও স্বাধীনতা পাবে না। বিয়ে করবে না ততদিন। তার পরে যাকে করবে সে নিভন্ত সলতে নয়, জ্বলন্ত শিখা। বেচারি তারা যে এখন থেকেই নিবু নিবু। সে তেজ নেই। সে দাহ নেই। এ কি সেই তারা! সেই পদ্মাবতী! মনে তো হয় না। অনুত্তম বলে, আমি ধন্য। কিন্তু নিরুপায়। তারা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তারাকে কানপুরে পৌঁছে দিয়ে অনুত্তম দিল্লিতে কয়েক মাস কাটায়। কলকাতার দাঙ্গা তাকে বিচলিত করে, কিন্তু বল্লভভাই তাকে অন্য কাজে লাগান। নোয়াখালির ডাক শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। গান্ধীজির সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে নোয়াখালিতেই তার স্থান। গান্ধীজি নেই, তবু কাসাবিয়াঙ্কার মতো সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগুনলাগা জাহাজের ডেক-এ। কোথায় তার পদ্মাবতী! কবে ফুটে উঠবে পদ্ম ফুলের মতো কন্যা আগুনের পালঙ্কে!

অনুত্তমের পর সুজন। সুজনের কাহিনির অল্পই আমাদের অজানা। সেটুকু বলি। বিদেশ থেকে ফিরে সুজন দেখে তার বাবা কোনোমতে নিঃশ্বাস ধারণ করে রয়েছেন বউমার কোলে মাথা রেখে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন এই আশায়। তাঁর যন্ত্রণার অবসান হবে সে যদি তাঁর কথামতো বিয়ে করে। নইলে তাঁর যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে। ছেলের মুখে 'না' শুনলে হয়তো তিনি তৎক্ষণাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাবেন। এমন বিপদেও কেউ পড়ে! সুজন চোখ বুজে বিয়ে করল। আর বাবা বউমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

বিয়ে মোটের উপর সুখের হয়েছে। সীতা সেকালের সীতার মতো পতিব্রতা। নিজের জন্যে কিছু চায় না। ঝি-চাকর রাখতে দেয়নি। নিজেই রাঁধে। সেইজন্যেই সুজনের হাতে টাকা জমতে পেরেছে। অধ্যাপনা করে, সিনারিও লেখে, অভিনয়ের মহড়ায় উপস্থিত থেকে নির্দেশ দেয়। এইসব করে সুজন একরকম গুছিয়ে নিয়েছে। একটি সন্তান হয়েছিল। বাঁচল না।

মধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বকুলের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা। সুজন প্রথমটা চিনতে পারেনি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাঠ কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে বকুল। কী একটা সাংঘাতিক অসুখ করেছিল তার। ছ-বছর ভুগতে হয়েছে। বহু দেশ বেড়িয়ে এখন একটু ভালো বোধ করছে। বকুল যদিও বলল না তবু সুজন বুঝতে পারল কী সে অসুখ। কে তার জন্যে দায়ী। বকুলের চাউনি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। সে চাউনি বঞ্চিতা নারীর। বকুল বিশ্বাস করেনি যে সুজন সত্যি সত্যি বিয়ে করবে আরেকজনকে। মুখে অনুমতি দিয়েছিল বটে। মন থেকে তো দেয়নি। জ্বলেপুড়ে মরছে।

চার জনের কাহিনি সাঙ্গ হলে চার দিক নিস্তব্ধ হল। রাত তখন অনেক। ঘড়ি আনিয়ে দেখা গেল বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। তন্ময় লাফ দিয়ে উঠল। সুজন তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা বছরের শেষ রাত্রি। একটু পরে আরম্ভ হবে নববর্ষ।'

'সিলভেস্টার!' কান্তি চমকে উঠে বলল, 'নাচতে ইচ্ছা করছে যে।'

তন্ময়েরও ইচ্ছা করছিল নাচতে। দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিল। ওদের বেহায়াপনা দেখে অনুত্তম বিষম অপ্রসন্ন হল। সুজন গেল সাপার আনতে। খেতে খেতে বারোটা বাজিয়ে দেওয়াই রেওয়াজ।

'যত সব বিদঘুটে কান্ড!' অনুত্তম ফেটে পড়ল যখন লক্ষ করল সুজন দুই হাতে দুই গ্লাস তরল পদার্থ নিয়ে উঠে আসছে।

ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। ততক্ষণে ওরা স্যাণ্ডউইচ পনির ও বিস্কুট খেতে বসেছে। অনুত্তমের জন্যে গরম দুধ। আর সকলের জন্যে দ্রাক্ষারস। চার জনেই চার জনকে বলল, 'নববর্ষ সুখের হোক।'

কান্তি বলল, 'আজ থেকে আবার আমাদের যাত্রারম্ভ। যে জীবন পিছনে পড়ে রইল তার দিকে ফিরে তাকাব না। যে জীবন সামনে তার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব!'

'তোর সঙ্গে যতক্ষণ আছি', তন্ময় বলল, 'ততক্ষণ মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ-একুশ বছর। তা তো নয়। একটু পরে যেই বাড়ি ফিরব অমনি মালুম হবে ষাট বাষট্টি বছর। জীবনের আর ক-টা বছর বাকি আছে যে নতুন করে যাত্রারম্ভ করব! কার অভিমুখে পদক্ষেপ? তাকে যে, ভাই, চিরকালের মতো হারিয়েছি। আমার রূপমতীকে।'

'আমিও আমার কলাবতীকে।' বলল সুজন। 'কেন বেঁচে থাকব, কীসের প্রত্যাশায় বেঁচে থাকব, সেইটেই বুঝতে পারছিনে। লিখতে বসলে লেখা আসে না। সাহিত্যের পাট চুকে গেছে। পয়সার জন্যে এ যা করছি এ তো ব্যবসাদারি। বয়সটা আমার আজ পঁচিশ বছর কমে গেছে, কিন্তু কাল বকুলের দিকে তাকালে হু-হু করে বেড়ে বাহাত্তর হবে। যাত্রারম্ভ আমার জন্যে নয়।'

'এই ক-বছরে আমার বুকে শেল বিঁধেছে।' বলল অনুত্তম। 'শেল বিঁধে রয়েছে। দেশ ভগ্ন। লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী নিহত, উন্মুলিত, ধর্ষিত, নষ্ট। মহাগুরু নিপাতের পাপে জাতীয় শরীর বিষাক্ত। বেঁচে আছি বলে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তবু বাঁচতে হবে। এখনও তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বাকি। আমার পদ্মাবতীর সঙ্গে। তা বলে যাত্রারম্ভ! না, ভাই। সে উৎসাহ নেই। বয়স আমার কমেনি। আজকের দিনেও।'

কান্তি ভেবে বলল, 'আমাদের উপর ভার পড়েছে আমরা আদি কাল থেকে চলে আসতে থাকা একটি অন্বেষণের ধারাকে বহমান রাখব। অন্বেষণ সার্থক হলে তো ফুরিয়েই গেল। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে ফুরিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্টি যেমন অসামান্য আমাদের অন্বেষণও তেমনি। অন্বেষণ চলতে থাকবে। আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর। নিরবধি কাল।'

'আমি কিন্তু এ ভার বইতে পারছিনে, ভাই।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তন্ময়। 'আমি সরে দাঁড়ালুম। অন্বেষণ চলতে থাক। আমি অচল। রাজ যেদিন চলে যায় সেই দিন থেকে অচল। সেদিন আমার উচিত ছিল তার অন্বেষণ করা, তার পশ্চাদ্ধাবন করা। সব সহ্য করে তার সঙ্গে লেগে থাকা। তা তো আমি পারলুম না। আমি এক হিসাবে অসমর্থ পুরুষ। নেহাত মিথ্যে বলেনি সে। দৈহিক অর্থই একমাত্র অর্থ নয়।'

'আমারও ভুল হয়েছিল বকুলের মুখের কথাকে মনের কথা ভেবে তার অন্বেষণ ছেড়ে দেওয়া, তার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করা।' সুজন বলল অনুশোচনার সঙ্গে। 'বিবাহের বাসনা প্রবল হয়েছিল, বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুযন্ত্রণা সইতে পারিনি। তখন তো বুঝতে পারিনি যে বকুলের জীবনের মূলে কুড়ুলের কোপ লেগেছে। বকুল এখন ছিন্নমূল। আমিও তাই। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা কি আমার কাজ! অনুত্তম, কান্তি, তোরা দু-জনে এগিয়ে যা। তোদের দু-জনের মধ্যেই সার্থক হব আমরা দু-জন। তন্ময় আর আমি।'

'আমার দৌড় কতটুকু!' অনুত্তম বলল ভাঙা গলায়। 'মহাত্মা বলে রেখেছিলেন তিনি ভ্রাতৃহত্যার জীবন্ত সাক্ষী হবেন না। আমিও বলে রেখেছি যে আর একটা সাম্প্রদায়িক নরমেধ ঘটলে আমি প্রাণ দেব। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব! আমাকেও বাদ দে। ওই কান্তিই আমাদের সকলের যৌবন। ওর সার্থকতাই আমাদের সার্থকতা।'

তখন ওরা কান্তিকে ঘিরে বসল। বলল, 'কান্তি, তুই আমাদের সকলের তারুণ্য। তোর সার্থকতায় আমাদের সার্থকতা। অন্বেষণের ধারা অব্যাহত থাকবে তোর মধ্যে, তোর অন্বেষণের মধ্যে। জীবনমোহনের যোগ্য উত্তরসাধক তুই, কান্তি। আমরা নই।'

কান্তি অভিভূত হল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ঘর নেই। আমি অনিকেত। আমার সংসার নেই। আমি অসংসারী। আমার সঞ্চয় নেই। আমি অসঞ্চয়ী। সম্বল বলতে আমার একটা সুটকেস ও একখানা কম্বল। কোথাও বাঁধা পড়ব না বলে বিয়ে করিনি ও করব না। বিবাহই একমাত্র বন্ধন নয়। তার চেয়ে বড়ো বন্ধন সুরত। সে বন্ধনও আমি পরিহার করেছি ও করব। কিন্তু নারীকে আমি পরিহার করিনি। করব না। তার রস আস্বাদন করেই আমি ক্ষান্ত। নারীর মধ্যে চিরন্তন হচ্ছে তার রস। তার রসকলি।'

'তাই কি!' অনুযোগ করল অনুত্তম। 'চিরন্তন হচ্ছে তার শক্তি। তার সিঁথির সিঁদুর।'

'চিরন্তন তার অন্তর্দীপ্তি। তার তুলসীতলার প্রদীপ।' নিবেদন করল সুজন।

'তার অঙ্গসুষমা। তার নীবিবন্ধ।' অভিমত দিল তন্ময়।

কান্তি হেসে বলল, 'এ সেই অন্ধের হাতি দেখার মতো হল। আমরা চার জনে চার জায়গায় হাত রেখেছি। চার জনের সত্য যদি এক জনের হয়, চার জন যদি হয় এক জন, তা হলে আমাদের সকলের কথা হবে এক কথা। পাই আর না পাই, হারাই আর না হারাই, আমরা কেউ ব্যর্থ হইনি। আমাদের চারটি কাহিনি মিলে একটি কাহিনি।'

'সে কাহিনি একই রাজকন্যার, যে কন্যা সব নারীর কল্পরূপ।' বলল সুজন।

'যে নারী চিরন্তনী।' বলল অনুত্তম।

'যে চিরন্তনী ক্ষণিকা।' বলল তন্ময়।

কান্তি তার বন্ধুদের হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। বলল, 'পিছন ফিরে তাকাব না। কিন্তু যদি তাকাই তা হলে যেন এককেকেই দেখতে পাই, একাধিককে নয়। যখনি তাকাই তখনি যেন দেখতে পাই সেই এককের অফুরান সৌন্দর্য।'

'অফুরন্ত প্রীতি।' ইতি সুজন।

'অসীম সাহস।' অথ অনুত্তম।

'অপার করুণা।' অতঃপর তন্ময়।

রাত গভীর হয়ে আসছিল। আর দেরি করা যায় না। সুজনের উনি যেকোনো সময় এসে পড়বেন। তন্ময়ের ইনি ক্ষমা করবেন না। অনুত্তমের চিটাগং মেল সকাল ছ-টায়। কান্তিকে মহারাজা প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ

করেছেন। মহারানির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

কান্তি বলল, 'সামনের দিকে তাকালেও সেই একককেই দেখতে পাব। তন্ময়ের ঘরে তিনিই এসেছেন। সুজনের ঘরেও তিনি। কোনো খেদ রাখব না। ধন্যবাদ জানাব পদে পদে, কথায় কথায়।'

'শত শত ধন্যবাদ।' জানাল অনুত্তম।

'শত সহস্র ধন্যবাদ।' জ্ঞাপন করল তন্ময়।

'সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।' শেষ করে দিল সুজন।

একা কান্তি যাত্রা করল চার জনের হয়ে। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখতে। যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে তন্ময় সুজন অনুত্তম আবিষ্কার করল যৌবন ফুরিয়ে যায়নি। যৌবনের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়নি। যেখানে অস্ত সেখানেই উদয়। যেখানে অন্ত সেইখানে আদি। যেমন বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ।

(১৯৫২-৫৩)